আমি যাঁদের দেখেছি

পরিমল গোস্বামী

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই

প্রথম প্রকাশ : এক হাজার

এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশক :

নির্মলকুমার চক্রবর্তী

১।১৯ গোপালচন্দ্র বসু লেন

কলকাতা-৫০

পরিবেশক :

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১

১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

প্রচ্ছদ :

নৃপেন্দ্র ভট্টাচায

আখ্যা-পত্র :

শ্যামদুলাল কুণ্ডু

মুদ্রাকর :

সমর মৈত্র

ইম্প্রেসিও

৮ কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলকাতা-৬

শ্রীপুলিনবিহারী সেন,

প্রীতিভাজনেষু।

এই পুস্তকে যাঁদের কথা লিখেছি, তাঁরা আমার চোখে কেমন, সেই কথাই বলতে চেষ্টা করেছি। এতে মোট একুশ জনের কথা আছে, যদিও আমার দেখা বিশেষ মানুষ আরো অনেকে আছেন, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তাঁদের কথাও বলব। এঁদের সবাইকে ভালবেসেছি বলেই লেখার প্রেরণা। এবং আমার ভাললাগাকে আমি জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে কোনো বাধা অনুভব করিনি। (এবং সম্ভবত পল্লীর মানুষ হওয়াতে পল্লীবাসীর বিস্ময়ও ফুটেছে আমার দেখায়।)

দেখা-ব্যক্তিদের বয়স অনুযায়ী রচনাগুলি পর পর সাজানো হল। এবং যে রচনা যে তারিখে প্রকাশিত, প্রয়োজন বোধে তাও রচনার শেষে দিয়েছি। মুদ্রণকালের সংযোজন, "প্রসঙ্গত" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

এই পুস্তক রচনার মূলে শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

আমার দুখণ্ড স্মৃতি (স্মৃতিচিত্রণ ও দ্বিতীয় স্মৃতি) পুস্তকে যাঁদের কথা আছে, তাঁদের কয়েক জনের বিষয়ে পৃথকভাবে আরো বিস্তারিত করে লেখা উচিত, এই মন্ত্র তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। অনুমান করি, পুলিন-বিহারী সেন পূর্বযুগের কুলীন ব্রাহ্মণদের মতো (কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনেও অন্য এক সেনের হাত!) একই সঙ্গে অগণিত দায় ঘাড়ে নিয়েছেন (তার মধ্যে আমিও আছি), তাই প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্য তাঁকে পালন করতে হয় পালাক্রমে। পালা আসতে দেরি হয়, তবু আসে। (তার পরেই আসে বিস্মরণের পালা!) যাই হোক আমার পালা একদিন তাঁর দায়-ভাগের তালিকা পরীক্ষা করতে গিয়ে নজরে এসেছিল, শুধু সেটুকু আনন্দে এ পুস্তক তাঁর নামেই উৎসর্গ করলাম। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও তাই লেখনী হয়তো মিতাক্ষরা হতে পারল না।)

সাপ্তাহিক বসুমতীর সহকারী সম্পাদক কবি দুর্গাদাস সরকার আমার রচনাগুলি ছাপার ব্যাপারে যে যত্ন নিয়েছিলেন, এবং আমার নির্দেশাদি নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যথাযথ পালন করেছিলেন, সেজন্য তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বক্তব্য, সম্পূর্ণ নির্ভুল ছেপে আমাদের মুদ্রণ ঐতিহ্যকে আমি নষ্ট হতে দিইনি, এজন্য আমি নিজে খুশি আছি।

১সি গোপালচন্দ্র বসু লেন
কলকাতা-৫০

পরিমল গোস্বামী

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী—পৃথক প্লেট

পাঠমধ্যস্থ চিত্রসূচী

পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

উপরোক্ত ১, ৪, ও ৬ সংখ্যক চিত্রের
ব্লক সাপ্তাহিক বসুমতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি বিষয়ের কয়েকটি তথ্য ও মোহিতলাল মজুমদারের একটি সনেট অমল মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক ৪র্থ খণ্ড মুদ্রণের পূর্বে অধ্যাপিকা উমা রায় আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত অধ্যায়ে মুদ্রিত মরুপত্নী সনেটটি ফণীন্দ্রনাথ রায়ের এবং 'বনবিহারী' সনেটটি বনফুলের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১-১৯৪১

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে "আমার ধর্ম" নামক অধুনা সুবিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠরত অবস্থায় প্রথম দেখি রবীন্দ্রনাথকে। তখন তাঁর চুল সম্পূর্ণ পাকে নি। দাড়ির দুপাশে কালোর অংশ বেশি, শাদার মিশ্রণও কম নয়। কিন্তু মাঝখানে শাদার অংশ বেশি। ঋজু দেহ, বলিষ্ঠ ভঙ্গি। এই তাঁকে আমার প্রথম চাক্ষুষ দেখা।

কিন্তু গত যুগের এক মাসিক ও সাপ্তাহিকের মালিক-লেখকের ভাষায় প্রশ্ন তোলা যায়, দেখা কাকে বলে?—তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের অবতারণার আগে তার সংজ্ঞা স্থির করে নিতেন।

আমিও তাই করব বলে ঠিক করেছি।

দেখা বলতে সাধারণত আমরা বুঝি বস্তু থেকে আলোর প্রতিফলন চোখের লেনসের ভিতর দিয়ে রেটিনায় গিয়ে আঘাত করার পর সেখান থেকে দৃষ্টিস্নায়ু বাহিত অবস্থায় মগজের দৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণ বিভাগে গিয়ে হাজির হলে চোখের সামনে যে রূপ দেখি. তাই। কিন্তু বিজ্ঞানের এই জটিল তথ্যটি জানা না থাকলেও আমরা দেখি. এবং জানা থাকলেও. দেখার সময় তা মনে পড়ে না। দুটি অবস্থাতেই আমরা শুধু দেখি। এবং এই দেখাকেই আমরা সাধারণভাবে বাস্তব দেখা বলি। তবু এটি আংশিক দেখা। কারণ মনেরও একটি চোখ আছে, এবং তা মনেই থাকে এবং আমরা সবাই সেই চোখ বয়ে বেড়াই মনের মধ্যে, সেই বিলট-ইন চোখ। এবং চোখের দেখা ও মনের দেখা এই দুই দেখা একত্র মিলালে তবে দেখা বেশি সার্থক হয় বলে আমার বিশ্বাস।

আমি মনের চোখে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি বাল্যকালে। সেই প্রথম দেখাকে আমি পরবর্তী দেখার ভূমিকা রূপে আমার জীবনে একটি বড স্থান দিয়েছি। আমার বাল্যকালে যখন কিছু কিছু পডতে শিখেছি, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নদী' নামক বইখানির দশবারো খানা আমার পিতা (রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত লেখক) বিহারীলাল গোস্বামীর নামে পাঠিয়ে দেন। বইয়ের প্যাকেট খোলা হচ্ছে সে দৃশ্যটি এখনও মনে আছে।

'নদী' সবটাই বাবা বার বার পড়ে আমাকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। এ কবিতাটা সম্পূর্ণ সচল একটি নদী হয়ে আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। তার আরও কারণ, আমাদের বাড়ি ছিল পদ্মা নদীর উপরে —পাবনা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে। সেই নদীতে প্রতিদিন স্নান করতাম, তারই জল পান করতাম। নানাভাবে জীবনে এই নদীর প্রভাব পড়েছিল ঃ এর বুকে নৌকায় উঠে পারাপার করা, জেলেদের সঙ্গে তাদের নৌকায় বসে ইলিস মাছ ধরা দেখা, বেড়াজালের সঙ্গে সঙ্গে বালুর তীর বেয়ে বহু দূর চলে যাওয়া, স্টীমার চলেছে দেখা, খরা জালে মাছ ধরার দৃশ্য, কাদাখোঁচা পাখীর জলের ধারে ধারে পায়ের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য, জেলেদের নৌকা মেরামত, গাবের কাঁচা রস কষ-হিসাবে নৌকার ভিতরে ও জলের দিকটায় লেপন, আলকাতরা লেপন, জাল মেরামত, বর্ষায় পদ্মার হিংস্র মূর্তি, এ সবের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ছিল। তাই নদী কবিতা আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। এরই ভিতর দিয়ে পদ্মার অদেখা আদি ও অন্তের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটল, আর এরই ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। 'নদী' পড়বার পর নদী দেখামাত্র আমার সমস্ত সত্তা নদীর সমস্ত সত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে যেত। নদীর বুকে সমস্ত প্রাণ আপ্লুত হয়ে যেত। মনে এক অদ্ভুত বিস্ময় জাগত এই ভেবে যে, নদীকে এমন সুন্দর করে কবি কি করে দেখলেন। বাল্যকালের সে অনুভূতি একটা অর্ধমূঢ় অনুভূতি, এবং সে যে কি, তা আজও প্রকাশ করে বলতে পারি না। আজ ভাবি রবীন্দ্রনাথকে এই যে আমার প্রথম দেখা, এ দেখা তো কোনোমতেই মিথ্যা হতে পারে না। অন্তত আমার কাছে তো নয়-ই।

কবি যেভাবে নদীকে দেখেছেন তার মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁকি ছিল না। আমি তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি রূপ নিজ চোখে দেখেছি, শুধু আদি উৎস ও অন্তে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার রূপ চাক্ষুষ করি নি। কিন্তু যেটুকু আমার অব্যবহিতভাবে দৃষ্টিগোচর, সে সব আমার মনে কাব্য হয়ে উঠল। অর্থাৎ এই সব অতি পরিচিত দৃশ্য, আর নদীকাব্যের কথাগুলি, দুইই আমার কাছে তখন এক।

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে
নদী ফুলিয়ে দুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল,

কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে ওঠে খল খল,
তরী করে ওঠে টলমল।
নদী অজগর সম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে!

এমন সত্য বর্ণনা চোখে না দেখলে জানতেই পারতাম না। তাই ১৯১৭-তে যখন 'আমার ধর্ম' বক্তৃতায় কবি আবৃত্তি করছিলেন—

আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি করিব নীরবে তরণ,
সেই মহাবরষার রাঙাজল
ওগো মরণ হে মোর মরণ ॥

তখন আবার বর্ষাকালের উন্মত্ত পদ্মার রাঙাজলের দৃশ্যটি চোখে ভেসে উঠেছিল। সে রাঙাজলের চেহারা, সে মহাবরষার চেহারা, আমার রক্ত স্রোতে বয়ে চলেছে। বিবর্তনের কোনো এক ধাপে মানুষের পূর্বপুরুষদের কোনো এক বিশেষ জলচর রূপ সমুদ্রের নোনা জলে বাস করত, তারপর জল থেকে উপরে উঠে আসার সময় সেই নুনের সমুদ্রকে সে অল্প পরিমাণে দেহের ভিতরে, রক্তের মধ্যে বহন করে এনেছে। আমার পদ্মাও তাই। সে পদ্মায় আমি এককালে বাস করেছি, তা থেকে উঠে এলেও তা আজও আমার মনে বহন করে চলেছি। রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন। এ তো কবির মনের সঙ্গেই বাস করা, তাঁর দেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। "হে পদ্মা আমার! তোমায় আমায় দেখা শত শতবার!"

রবীন্দ্রনাথকে দেখার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয় পাবনা শহরে। ইছামতী নদী এখানে যদিও সঙ্কীর্ণ তবু এর সঙ্গেও কবির যোগাযোগ অনুভব করেছি, যেমন করেছি এর আগে স্কুল জীবনে সাজ্জাদপুরের অন্তর্গত পোতাজিয়া হাই স্কুলে পড়তে। ১৯১৫-তে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে প্রথমে রাজসাহী ও পরে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভরতি হই। সেখানে ১৯১৬-তে যখন হস্টেলে বাস করতে আরম্ভ করি, তখন চয়নিকা প্রায় মুখস্থ এবং ছিন্নপত্র পড়াও শেষ হয়েছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত জীবন স্মৃতি পড়েছি, কিন্তু কোনো কিছুরই সম্পূর্ণ মূল্য তখন বোধের অনেক বাইরে ছিল। সবই সুন্দর লাগত, কাব্য মনকে উতলা করত, বার বার পড়তাম। জীবন স্মৃতির সেই আগের একটা সংস্করণ ছিল আমার, অ্যান্টিক কাগজে ছাপা,

ভিতরে আঁকা-ছবির হাফটোন প্রতি-লিপি ছিল।

পাবনা হস্টেলে প্রথম আবিষ্কার করি কয়েকজন সহপাঠী রবীন্দ্র-বিরোধী। আলোচনা করে বোঝা গেল আমাদের যেমন ভাল লাগার যুক্তি নেই, তাদেরও তেমনি কাব্য বিরোধী হওয়ার যুক্তি নেই। সহপাঠী অতুলানন্দ চক্রবর্তী ও আমি একদিকে, আর তারা একদিকে। মনে প্রবল একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। কারণ বিরোধিতার কথাটা আগে ভাবি নি। অন্তত ছাত্ররা যে বিরোধী থাকতে পারে এটি কল্পনার বাইরে ছিল। স্কুলে পড়বার সময় বাবা নিয়মিত 'সাহিত্য' মাসিক রাখতেন, কিছু এখনও আমার কাছে আছে। সমাজপতি মহাশয়ের ছন্দোজ্ঞান কি রকম ছিল তার নমুনা তাঁর সমালোচনাতে আছে। যেমন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩২১) প্রকাশিত গান "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমারে।"—সম্পর্কে লেখা হয়েছে "চরণে শ্লেষ আছে। এতগুলি চরণ সত্ত্বেও গানটি যে খোঁড়া হইয়াছে"...... ইত্যাদি। এই হল সমালোচনার নমুনা। প্রথমত গানের কথার ছন্দ থাকে গাওয়ার মধ্যে। দ্বিতীয়ত এ রচনা তবু কবিতারূপেও পড়া যায়। ছড়ার দেশের মানুষ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এই বিরূপতা নিতান্তই সংস্কারবশে। এ সব কথা বাবার কাছে শুনেছি তখন। তিনি নিজে ছন্দের শিল্পী ছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি আক্রমণাত্মক সমালোচনার তিনি জবাবও দিয়েছেন সমসাময়িক কাগজে।

কিন্তু আমার ধারণা ছিল, এ সব বিরোধ বড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই সতীর্থদের মধ্যে এর বিস্তার দেখে দুঃখ হয়েছিল খুবই। আমাদের স্কুলের সামান্য বিদ্যা নিয়ে উভয় পক্ষেই যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছিল তা দম্ভ ভিন্ন আর কি? আমাদের দিকের একমাত্র যুক্তি ছিল শুধু ভাল লাগার এবং বিরুদ্ধ পক্ষকে দমিয়ে দেবার ভাষা ছিল—'তোমরা কিছুই জান না।' এ লড়াই কল্পনা করতেও হাসি পায়। কিন্তু আমার দিক থেকে এ কথা অবশ্যই বলতে পারি যে, এ তর্কে আমার অস্ত্র যে দুর্বল ছিল তা খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম তখন। এবং এ থেকেই অস্ত্রবৃদ্ধির খুব ইচ্ছা হত।

এ জিনিসটি কি তা ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু ক্রমেই কবিকে চোখে দেখার ইচ্ছা বাড়ছিল মনে মনে। অথচ কি করে যে তা সম্ভব তাও বুঝতে পারছিলাম না। সত্যই যদি কবিকে দেখতে পাই তবে তখন আমার মনের

কি প্রতিক্রিয়া হবে তা ভাবতে পারি নি। তবু এইভাবেই তাঁকে মনের চোখে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। পরে আমি তাঁকে যেমন দেখেছি তার প্রস্তুতি অংশ এটি। এভাবে আগে থাকতে মনের দেখা আরম্ভ না হলে পরে তাঁকে চোখে দেখে এবং তাঁর পায়ের কাছে বসে যে সব কথা শুনেছি, যে শিক্ষাটুকু গ্রহণ করেছি, তা সার্থক হত না বলে মনে হয়।

১৯১৭ সালে সেই প্রথম তাঁর সামনে বসে তাঁর কথা শোনা। এ কথা আরম্ভেই বলেছি। তাঁর বলবার বিষয় ছিল 'আমার ধর্ম'। লিখিত বক্তৃতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শোনালেন। সেদিনকার কথা আমি আমার স্মৃতি চিত্রণ থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করছি—

"রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর কবিতা ও নাটক থেকে পর পর অনেক অংশ আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন।......সে কি তেজোদৃপ্ত আবৃত্তি!......আজও সে ধ্বনি কানে বিঁধে আছে। কি অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ দেখেছিলাম কবির সমস্ত সত্তায়। "অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু" অথবা "হবে হবে হবে জয়".....তারপর 'বর্ষশেষ' থেকে, তারপর 'মরণমিলন' থেকে। এইটি আবৃত্তির সময় সমস্ত ঘর যেন কেঁপে উঠল—"কহ মিলনের এ কি রীতি এই ওগো মরণ হে মোর মরণ" ধ্বনিতে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন আর আমার বয়স আঠারো উনিশ। সংখ্যায় বয়স যতই দেখাক, গ্রাম্য বিস্ময় প্রকাশের দিক থেকে আমার তখন কৈশোর বলা চলে। এ বিস্ময় প্রকাশে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই, কারণ এটা সত্য। যাঁরা কবিকে সর্বদা কাছে পেয়েছেন তাঁদের কাছে অবশ্যই তিনি এমন বিস্ময় ছিলেন না, কিন্তু আমার কাছে তিনি তখন স্বপ্ন না সত্য এই প্রশ্নরূপেই দেখা দিয়েছিলেন। এর চার বছর আগে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তারপর থেকে কত ফোটোগ্রাফ, কতস্থানে ছাপা হল। আমার সম্মুখে সেদিন যেন তারই একখানা ফোটোগ্রাফ জীবন্ত হয়ে উঠে নিজের কাব্য-জীবনের ব্যাখ্যা করছেন! অতুলানন্দ চক্রবর্তী ও আমি শুধু ভাল লাগার দাবি নিয়ে সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রদের সঙ্গে তর্ক করেছি। আর সেদিন দেখলাম রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বেদীতে দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বিপক্ষের সমালোচনার উত্তর দিচ্ছেন। তিনি তো অস্ত্র ভিক্ষা করছেন রণগুরুর কাছে, আমাদের কোনো অস্ত্রই ছিল না। কিন্তু তখন মনে হল যেন কিছু পেলাম। মাঝে মাঝে যেটুকু কানে এসেছে, তা জুড়ে একটা অর্থ মর্মে প্রবেশ করেছিল।

"অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু!" মনে হল আমিও তাঁর সঙ্গে দীক্ষা পেলাম। অর্থাৎ কবির পক্ষ সমর্থনে শুধু ভাল লাগার বদলে কিছু যুক্তি। কিন্তু অস্ত্র যখন পেলাম মনে হল, তখন দেখি তা প্রয়োগ করার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বিদ্যাসাগর হস্টেলে কেউ নেই। যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে আলাপ হয়েছে, তারাই দেখি তাঁর সপক্ষে!

তাঁর সেদিনকার কথার আভাসমাত্র নিয়ে, তাঁকে দেখার বিস্ময় নিয়ে, উত্তেজনাপূর্ণ মনে ফিরে এলাম। এর বহুদিন পরে সেসব কথার বীজ যখন মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হল, পল্লবিত হল, তখন তাঁর বক্তৃতাটা মনের মধ্যে সত্য রূপ গ্রহণ করল।

ঐ বছরেই তাঁর আর একটি বক্তৃতা শুনলাম রামমোহন লাইব্রেরিতে গান বিষয়ে। বক্তৃতার নাম ছিল 'সঙ্গীতের সঙ্গতি'। এবারে তাঁর অতি কাছে বসতে পেয়ে আরও মুশকিল হয়েছিল। নিশ্চয় তাঁর দেহ-বিচ্ছুরিত অদৃশ্য ইনফ্রা-রেড রশ্মির তাপ এসে লাগছিল গায়ে। তার ক্রিয়া, তাঁর উপস্থিতি, তাঁর সমস্ত পটভূমি, তাঁর কথা, সব যেন মনের ভিতর এলো-মেলো হয়ে ফুটছিল, সব বাষ্পের চেহারা নিচ্ছিল।

১৯৩৪ সনের একটি ঘটনা মনে পড়ল। এক সুরারসিক রাত সাড়ে-নটার শো-তে উত্তর কলকাতার এক সিনেমা-ঘরে 'টাবু' নামক তখনকার দিনের নামকরা ছবিটি দেখেছিলেন। পরদিন তাঁর এক বন্ধু ছবিটি কেমন দেখলেন জিজ্ঞাসা করাতে অনেক ভেবেচিন্তে স্মৃতির মধ্যে বহু অনুসন্ধান করে যেটুকু বলতে পারলেন সে হচ্ছে—"এক বুড়ো···আর সমুদ্র।" তার পর আরও চেষ্টা করলেন, কিন্তু আর কিছুই মনে পড়ল না।

এই কাহিনীটা মনে এলো, কারণ সেদিন 'সঙ্গীতের সঙ্গতি' শুনে আমার স্মৃতিতে যেটুকু জীবন্ত ছিল সেও ঐ রকম দু'টি কথা—একটি বুড়ো ···আর কিছু গান।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর বক্তৃতার কথা মাঝে মাঝে চিত্রিত করেছিলেন দু-এক লাইন করে গান গেয়ে। তার মধ্যে একটা হিন্দি গানেরও লাইন ছিল। আগেই বলেছি, অত্যন্ত কাছে বসাতে মন আনন্দে উত্তেজনায় বিচলিত হয়েছিল।

এর চার বছরের মধ্যে চলে যাই শান্তিনিকেতনে। তাঁর আরও কাছে আসবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আমাকে শেষ পর্যন্ত আমার পুরাতন পরিচিত প্রিয় লুপ লাইনে পুনরায় টেনে নিয়ে এলো।

অবশেষে বোলপুর—১৯২১ সালের জুলাই মাস।

রোমাঞ্চিত হৃদয়ে মুটের মাথায় বাক্সবিছানা চাপিয়ে হেঁটে চলেছি তীর্থ অভিমুখে।

এর পরের কিছু অংশ স্মৃতি থেকে উধাও হয়েছে। তবে এটুকু মনে আছে লাইব্রেরি ঘরের খড়ে ছাওয়া দোতলায় একটি তক্তপোষ পেয়েছিলাম। ঘরের সকল বাসিন্দার কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু নিকটতম সহ-বাসী অনিল চন্দ, সৈয়দ মুজতবা আলী এবং একটু দূরের হরিপদ রায়, অনাদি দস্তিদার, মণীভূষণ গুপ্ত, ফণী ঘোষ। আর কিছু মনে নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আর বেশি দূরে নেওয়া চলে না। তবে মনে হয় নতুন বিশ্বভারতী খোলার পর বিশ্বভারতীর ছাত্র সবাই ঐ ঘরে ছিলাম। কোনো কারণে ঐ ঘরটা নষ্ট হলে এবং ঐ সঙ্গে আমরাও, তা হলে সেখানে নতুন সমস্যার উদ্ভব হত সন্দেহ নেই।

এখানকার অনেক কথা মনে আনবার চেষ্টা করেছিলাম স্মৃতিচিত্রণ লেখবার সময়, কিন্তু দেখলাম বহু যোজক বা লিংক হারিয়ে গেছে।

আমি শান্তিনিকেতনে কেন গিয়েছিলাম, এ প্রশ্নের উত্তর মনের মধ্যে খুঁজেছি। এবং মনকে বিশ্লেষণ করেছি। মূল উদ্দেশ্য আগেই বলেছি, এই উদ্দেশ্য থেকেই একটা উপ-উদ্দেশ্য মনে মনে গড়ে নিয়েছিলাম, ওখানে কলা-ভবনের ছাত্ররূপে থাকব। ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক ছিল এককালে, সেটাকে ঝালিয়েও নেওয়া যাবে এই উপলক্ষে। প্রসঙ্গত বলি, সব লক্ষ্যই আমার স্বাস্থ্যের প্রতিকূলতার জন্য বারবার দূরে সরে গেছে, লক্ষ্যের কাছাকাছিও যাই নি কখনো। আরও একটি কথা স্মৃতি থেকে সরে গেছে। আমি কিভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখার স্থানকাল ঠিক করলাম, কিছুই আর মনে পড়ে না। কিন্তু এক অপরাহ্ণে তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনছি, এই ছবিটি মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এবং তাঁকে যে এত কাছে পেয়েও আবার একটা বিস্ময়ের দূরত্ব অনুভব করেছিলাম, সেকথা কখনো ভুলতে পারব না।

আমার পিতৃপরিচয়ের দরুন একটুখানি দাবি গড়ে নিয়েছিলাম মনে মনে। স্নেহ আকর্ষণের দাবি। কিন্তু তাঁর কাছে এসে বসামাত্র মনে হয়েছিল হিমালয়ের পায়ে বসে আছি, এখানে সব পরিচয়ই তুচ্ছ। এবং সেদিন সেই প্রথম আলাপে তাঁর এমন একটি স্নেহের পরিচয় পেয়েছিলাম, তা এমন মহৎ মানুষের কাছ থেকেই হয় তো সম্ভব। এ জিনিসটি প্রতি মুহূর্তে অনুভব

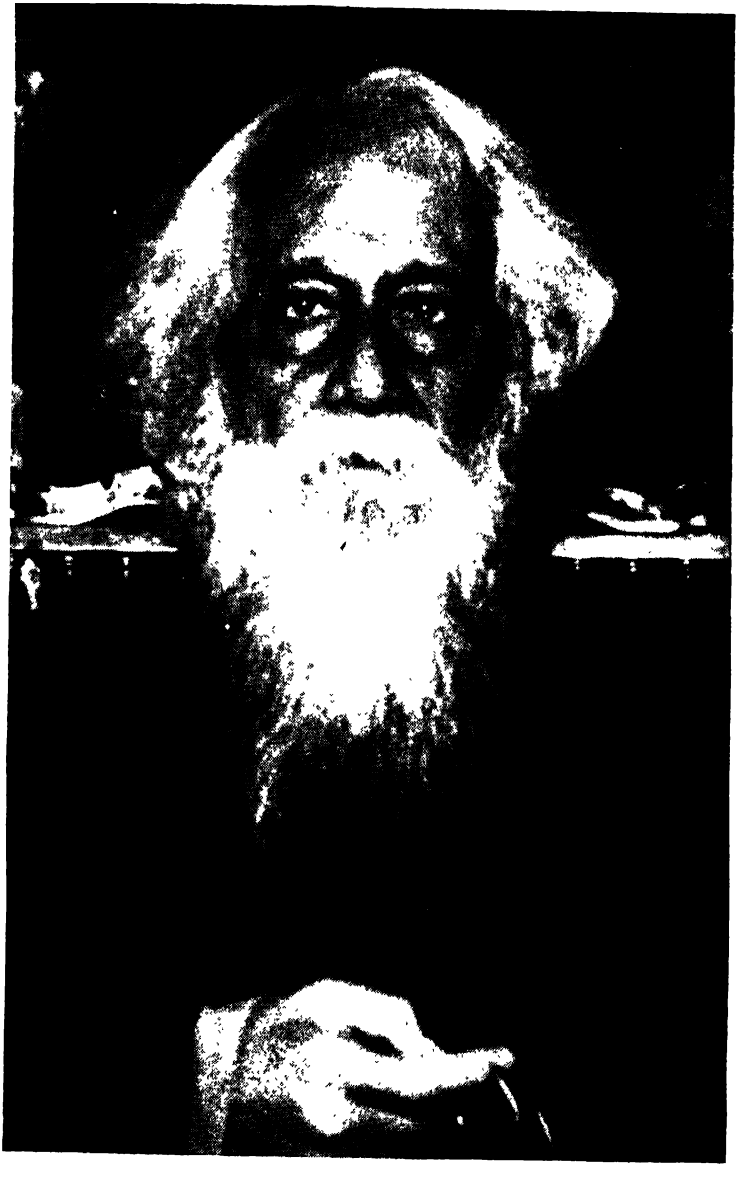
করছিলাম। বিস্ময় ছাড়া তখন আমাদের দু'জনের মধ্যে আমার দিক থেকে অন্য কোনো দূরত্ব ছিল না। বিস্ময়টা আমার ত্রুটি, কিন্তু তাকে কাটিয়ে ওঠা কি সহজ? তবু সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তা আমার মর্মে প্রবেশ করেছিল এবং আমি যে দু-একটি প্রশ্ন করেছিলাম তার মধ্যে সঙ্কোচ ছিল না। তাঁর প্রত্যেকটি কথায় একটি সহৃদয় শিক্ষাগুরুর উদারতার পরিচয় ছিল এবং তাঁর ভদ্রতা আর সৌজন্যের কথা আগে বহুবার শোনা না থাকলে এবং তা আকস্মিক হলে, হয় তো আরও একটা অতিরিক্ত বিস্ময়ের আঘাতে সে সময় অস্বস্তি বোধ করতাম।

এসব এমন বিস্তারিতভাবে বলেও সেদিনকার মনের অবস্থাটি ঠিক বোঝাতে পারছি না।

সেদিনের আলাপের বিষয় ছিল আর্ট। আলাপের বললে ঠিক বলা হবে না, সেটি কবির কাছে আমার প্রথম পাঠ গ্রহণ। কলাভবনে ভরতি হয়েছি এবং সঙ্গে উপাসনায় প্রকাশিত আমার আঁকা একখানি ছবিও আছে। সেটি লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। দেখাব কি না সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু নিয়ে ভালই করেছিলাম। ছবিখানা তাঁরই একখানি ফোটোগ্রাফ থেকে তৈরি। পার্শ্বচিত্র থেকে, শুধু মুখের একটুখানিতে আলো, সব অন্ধকার, এইভাবে বদল করে আঁকা, তার নিচে লেখা "সমস্ত তিমির ভেদ করি দেখিতে হইবে ঊর্ধ্বশির এক পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে অনন্ত ভুবনে।" ফোটোগ্রাফ অবলম্বনে ভাবচিত্র।

ছবিখানা সামনে ধরাতে সুবিধা হল এই যে, এইটি উপলক্ষ করেই তিনি আর্ট সম্পর্কে আমাকে অনেক কথা বললেন। আর্টের অর্থ কি, কাকে আর্ট বলব, এইসব কথা। তিনি প্রথমেই ছবিখানার উপর চোখ বুলিয়ে বলতে লাগলেন, তুমি যতই কবিতার লাইন নিচে বসাও, এখানি ফোটাগ্রাফ ভিন্ন আর কিছু না, অর্থাৎ আর্টের উদ্দেশ্য এতে সিদ্ধ হয় নি।

এর পর খুব সহজভাবে, এবং সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে, আমাকে প্রায় আধঘণ্টা ধরে যে সব কথা বলেছিলেন, তার অর্থ আম বুঝতে পারব কি না, অথবা আমি তার উপযুক্ত কি না, সে কথা তিনি মুহূর্তকালও ভেবেছেন বলে মনে হল না। তাঁর আর্টের ব্যাখ্যা, আর্ট সম্পর্কে আমাকে একটি সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষা দিল। আর্ট সম্পর্কে আমার ধারণা যেটুকু অস্পষ্ট ছিল, তার উপর নতুন আলো পড়ল। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম তাঁর প্রত্যেকটি কথা অনুসরণ করতে। তবু একথা ভেবে আজও চমক লাগে,



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গোরা অভিনয় দর্শকরূপে)

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৩৭

তিনি খ্যাতির বিড়ম্বনায় বিব্রত, এবং নিজের এবং নতুন বিশ্বভারতীর শত রকম সমস্যাভারে পীড়িত থেকেও একজন অখ্যাত অর্বাচীন নবাগত ছাত্রকে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে বোঝালেন কি করে। তাঁর যে কথা তিনি সভায় অনেকের সামনে বলে সবাইকে নতুন ভাবে চিন্তা করতে প্রেরণা দেন, সেই জাতীয় কথা তিনি অনেককে না শুনিয়ে একা আমাকে, এবং যে আমি একান্তে তাঁর এত কথা শোনবার যোগ্য নই, সেই আমাকে অকৃপণ ভাবে, শান্তভাবে, সস্নেহে, এতক্ষণ ধরে বললেন, তাতে আমি নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে বোধ করেছি।

কিন্তু আমার প্রথম কথা বলার সুযোগ যে আমার জীবনে এত বড় একটা মুল্যবান সঞ্চয় হয়ে থাকবে, তা ঠিক তখনই বুঝতে পারি নি। আমি আবার বলছি, সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকবার সুযোগ পেলে তাঁকে কি এমন করে পেতাম? আমার টুকরো একটুখানি দেখা, আর-এক টুকরো দেখার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে পুরো দেখা। অনেকগুলো খণ্ড দেখা ও পাওয়ার মিলনে সমগ্রের অনেকখানি বিস্তার।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে বললেন, "ছবিতে ভাবটাই যদি তোমার প্রধান কথা হয়, তা হলে বিশেষ মানুষের চেহারার অনুকরণ করা ঠিক হয় নি।"

আমি বলেছিলাম, "কিন্তু এ তো আপনাকে আঁকাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।"

"দুটো জিনিস একত্র করবার চেষ্টা করেছ। ভাব ফোটাতে গেলে চেহারার সঙ্গে মেলানোর দরকার নেই। চেহারাও কল্পনা করে আঁকা উচিত ছিল।"

"কিন্তু তাতে তো আপনাকে চেনা যেত না।"

"না গেলেও তা ছবি হত। কারণ কল্পনা বাস্তবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে গেলে কল্পনাকে ছোট করে ফেলা হয়। সেটা মাপা জিনিষ হয়। তা ভাব প্রকাশে বাধা দেয়। কোনো জিনিসের অনুকরণ আর্ট হয় না, বস্তুর সীমা ভেঙে বেরিয়ে যেতে হবে। ভাবকে মুক্তি দিতে হবে।"

এই শব্দগুলিই ঠিক ব্যবহার করেন নি, কিন্তু আমি যতটা সম্ভব তাঁর ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম।

এর পর তিনি কলাভবনে নন্দলাল বসুর কথা তুললেন। বললেন, খুব বড় শিল্পী, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলে বুঝতে পারবে। তাঁকে যে আমরা পেয়েছি, এটি আমি সৌভাগ্য মনে করি।

তারপর বললেন, এখানে তিনি যে পদ্ধতিতে আঁকেন তা আয়ত্ত করতে গেলে আর্টের অর্থ সত্যিই কিছু বোঝা দরকার। এই সম্পর্কে তিনি ক্লাইভ বেল রচিত আর্ট সম্পর্কিত একখানা বই পড়তে বললেন।

রবীন্দ্রনাথ ভদ্র, তিনি সুজন, তিনি কোনো মানুষকে তুচ্ছ মনে করেন না, সবার চিঠির উত্তর নিজহাতে দেন, এ সব কথা আগে শোনা ছিল এবং বি-এ পড়বার সময় একখানা চিঠি লিখে তৎক্ষণাৎ তার জবাবও পেয়েছিলাম তাঁর নিজ হাতের, কিন্তু সুজনতার প্রকাশ একজন বিশ্ববিখ্যাত মানুষের পক্ষে কতখানি সম্ভব, তার পুরো চেহারাটা নিজে দেখলাম। সত্যই খুব একটা অদ্ভুত ব্যাপার। মনের শত প্রকোষ্ঠের যে-কোনো একটাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে তন্মুহূর্তে আর একটা খুলে দেওয়া সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। এই ক্ষমতার জন্য তাঁকে একই সঙ্গে একই সময়ে সমস্ত ভাবনা ভাবতে হয় নি। পূর্ব মুহূর্তে একটা গুরুতর বেদনা পেয়েছেন, কিন্তু পর-মুহূর্তে সেটি বন্ধ করে দিয়ে কৌতুকে মাতছেন, আবার সেটিকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাজনীতি আন্দোলনের কোনো একটা ঘটনায় উত্তেজিত হচ্ছেন, আবার পর মুহূর্তে সেটাকে সরিয়ে রেখে কোনো আগন্তুকের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে আলাপ করছেন, এমন অদ্ভুত ক্ষমতা সাধারণভাবে কার থাকতে পারে? থাকতে পারে, মনে হয়, যিনি জীবনটাকেই একটা মস্তবড় অভিনয় বলে মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছেন, তাঁর।

ইংরেজীতে যাকে hang-over বলে, অর্থাৎ একটি অতৃপ্তিকর ঘটনার রেশ মনের মধ্যে বয়ে বেড়ানো, যা পরে সুখের মুহূর্তেও সুখ উপভোগে বাধা সৃষ্টি করে, তেমন ঘটে সাধারণ মানুষের বেলায়। কিন্তু যাঁর মনের বল বা গঠন অসাধারণ, যিনি মহারাজ দিলীপের মতো দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহ হবার সাধনা করেছেন, একটি বিশেষ জীবনদর্শনকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছেন, জীবনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন, তাঁর পক্ষেও এমন সম্ভব। আর সম্ভব সকল মনুষ্যত্বহীন নিষ্ঠুর অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। তিনি অভিনেতা ছিলেন বটে, এবং 'বিসর্জন' নাটকে বিভিন্ন সময়ে দুই বিপরীত চরিত্র অভিনয় করে খ্যাতিও পেয়েছেন, এবং তার বেশি আরো না হয় দু-চারটি অন্য চরিত্র অভিনয় করেছেন কিন্তু সে মঞ্চে, জীবনে নয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ি বড় অভিনেতা ছিলেন, এবং তিনি একই নাটকে একই সময়ে দুটি

বিপরীত চরিত্র অভিনয় করেছেন। পাকা অভিনেতারা এ রকম পারেন কিন্তু সে সবই রঙ্গমঞ্চে। জীবনেও যাঁরা নানা ভূমিকায় নামেন, তাঁদের কথা শুনলে প্রথমেই কোনো প্রতারকের কথা মনে আসে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ছোটখাটো অভিনয়ের যে দরকার হয় নি তা নয়। সবারই দরকার হয়। তিনি এক স্থানে খুব সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন তার। ১৮৯০ সনে সাজাদপুর থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে (ছিন্নপত্রে সংকলিত) আছে সেই বর্ণনা।

ভীষণ দুর্যোগ, এমন সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া তাঁর কর্তব্য। চিঠি লিখে পাঠালেন। কিন্তু তারপর যে ঘরে আশ্রয় দেবেন ভেবেছিলেন সেখানে তদারক করতে গিয়ে দেখেন শত রকমের বিশৃঙ্খলা। কিছু উদ্ধৃত করি—

"ডাক লোকজন নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন খাজাঞ্চি, জোগাড় কর কুলি, আন্ ঝাঁটা, আন্ জল, মই লাগা, দড়ি খোল, বাঁশ খোল, তাকিয়া লেপ-কাঁথা টেনে ফেল, ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে তোল, দেয়ালের পেরেকগুলো একে একে উপড়ে ফেল—ওরে, তোরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন, নে-না একটা একটা করে জিনিস নে-না—ওরে ভাঙলে রে সব ভাঙলে—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ, তিনটে সেজ ভেঙে চুরমার—খুঁটে খুঁটে তোল।'—ভাঙা চুপড়িগুলো এবং ছেঁড়া চটটা বহুদিন সঞ্চিত ধুলো-সমেত নিজের হাতে টেনে ফেলে দিলুম···সাহেব লিখলেন, 'আমি এখন যাচ্ছি। বড় বিপদে পড়েছি।' 'ওরে, এল রে এল, চটপট কর।' তার পরে—ঐ এসেছে সাহেব। তাড়াতাড়ি চুল দাড়ি সমস্ত ঝেড়ে ফেলে ভদ্রলোক হয়ে, যেন কোনো কাজ ছিল না, যেন সমস্ত দিন আরামে বসে ছিলুম, এই রকমভাবে হলের ঘরে বসে রইলুম। সাহেবের সঙ্গে ঈষৎ হেসে হাত নাড়ানাড়ি করে, অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে গল্প করতে লাগলুম—সাহেবের শোবার ঘরে কী হল এই চিন্তা ক্রমাগত মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল।"

এই হল তাঁর জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রের একটি অভিনয়। কিন্তু এ তো মাত্র একটি অবস্থা থেকে আর একটি অবস্থায় যাওয়া, এবং সেও পূর্ব দুশ্চিন্তার hang-over নিয়ে। আমাদের সবার জীবনেই অল্পবিস্তর এ রকম করতে হয় দায়ে পড়লে। কিন্তু খ্যাতি-বিড়ম্বিত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একই সঙ্গে শত রকম অভিনয় অসম্ভব। তা যদি হত, তা হলে আমার সঙ্গে

অন্তত এ রকম উদার ব্যবহার করতেন না, কেন না তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তিনি আমাকে অনায়াসে এড়াতে পারতেন, এবং তাতে আমারও আশা ভঙ্গের বা দুঃখের কারণ ঘটত না। কারণ আমি এভাবে তাঁকে পাব এমন আশাই করি নি। তাঁর এই ব্যবহারের ভিতর দিয়ে তাঁর মনের যে স্তরটি আমার কাছে উদ্ঘাটিত হল তা আমার কাছে একান্তভাবে সত্য। নানা জনে নানাভাবে তাঁকে দেখেছেন, এবং আমি তাঁর সম্পর্কে অনেকের লেখা পড়ে দেখেছি, তাঁরা কবির মনের যে যে স্তরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাতে তাঁরাও সবাই প্রীত হয়েছেন। বহু জাতীয় লোককে প্রীত করার এই ক্ষমতা, এবং শত মানুষের শত রকম দাবি মিটিয়েও তার বাইরে তা যতখানি প্রকাশিত, তা বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নেই।

আমার কাছে সে দিন নন্দলাল সম্পর্কে যে শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেছিলেন, এখন বুঝতে পারি তার মধ্যে আমার প্রতিও শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়েছে। তা না হলে অল্পবিদ্যার এক নবাগত ছাত্রের কাছে সাধারণভাবে কোনো শিক্ষক তো এমন ভাষায় কথা বলেন না। যাঁর অনেক বিদ্যা, তিনি, একজন তরুণ ছাত্র যে কিছুই জানে না, এটা ধরে নিয়েই তার সঙ্গে কথা বলেন। এতটা সময় আলাপ করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এ চরিত্রের মূলে গেলে স্পষ্টই দেখা যায় কোনো বিশেষ জিনিসের প্রতি তাঁর আকর্ষণের উগ্রতা ছিল না, অর্থাৎ এমন উগ্রতা ছিল না যাতে তিনি কোনো কিছুতে সম্পূর্ণ বাঁধা পড়তে পারেন। কোনো একটিকে চরম মনে করে তাইতে আত্মসমর্পণ করে থাকতে পারেন নি বেশিক্ষণ। অথচ কোনো জিনিসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কম ছিল এমন কথাও বলা যায় না। শিল্পীর নিস্পৃহতা বা detachment-এর কথা আমরা সব শিল্পী সম্পর্কেই বলে থাকি। কিন্তু সেই নিস্পৃহতা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত। শিল্পীর নিজের জীবনে তার অনুশীলন করা বা গ্রহণ করা কোনো শিল্পীর পক্ষেই অত্যাবশ্যক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনটাকেই শিল্পীর নিস্পৃহতা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়।

আমি সেই ১৯২১-এর রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি—৬০ বছরের রবীন্দ্রনাথের কথা। আজ আমার বয়স ৬০ পার হয়েছে, এবং সেই ২৩ বছর থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছি, ততই যেন তাঁকে আরো বেশি করে দেখতে পাচ্ছি।

প্রথম দেখা ও সেদিন তাঁর কাছ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম, তা বলি। এর পর ক'দিন তিনি বাইরে গাছের ছায়ায় ইংরেজী কাব্য ও সন্ধ্যায়

দিনেন্দ্রনাথের বাড়ির ছাতে জাপানী কাব্য পড়িয়েছিলেন, তার সংখ্যা আমার আর মনে পড়ে না, তবে সেই সব ক্লাসে আমি বসেছি। ইংরেজী শৈলীর কাব্য পড়িয়েছিলেন, এবং তার সমস্ত ব্যাখ্যা বাংলায় করেছিলেন গল্পের মতো ভঙ্গিতে। জাপানী দু'এক লাইনের কাব্য 'হাইকাই' (তিনি এই উচ্চারণই করেছিলেন) পড়িয়েছিলেন, তার এক দিনের ভাষ্য আমার একখানা খাতায় লেখা ছিল তা স্মৃতিচিত্রণে উদ্ধৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমার মোট শিক্ষা চার পাঁচ ঘণ্টার বেশি নয়। তিনি নিয়মিত ক্লাস নেন নি, আর আমার স্থান ছিল কলাভবনে। অর্থাৎ মোট চার পাঁচটি ক্লাসে সম্ভবত আমি পড়েছি তাঁর কাছে। কিন্তু কেন যে এর মাঝখানের অনেক যোজক মন থেকে মুছে গেছে, তা জানি না। একদিন শালবীথিতে কয়েকজন ছেলের সঙ্গে আমিও ছিলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে ছিলেন, শিক্ষক ধীরেন মুখোপাধ্যায় তাঁর কোডাক পোস্টকার্ড সাইজের ক্যামেরায় আমাদের ছবি তুলেছিলেন। সে ছবি প্রায় কাগজের উপর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, এখন তা আর চেনা যায় না। আমার স্মৃতি থেকেও শান্তিনিকেতনের অনেকগুলি মুহূর্ত এইভাবে মিলিয়ে গেছে, তার চিহ্ন আর খুঁজে পাই না। সেই ছবি দুখানায়, শাদা পাঞ্জাবী ও লাল লুঙি পরা কবির প্রায়-শাদা চুল দাড়ি সহ মস্তকটি আমাদের দৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে অনেক দূর ঊর্ধ্বে, তুষার শীর্ষ হিমালয়ের মতো। সেই মিলিয়ে-যাওয়া ছবির শূন্য কাগজের দিকে তাকিয়ে আজও মনে মনে ছবি গড়ি।

শান্তিনিকেতনের খোয়া-আস্তীর্ণ বীথিকায় খালি পায়ে হাঁটার কথা মনে পড়ে। পা কেটে যেত, তবু কি রোমাঞ্চ! দূরে কাছে কোনো না কোনো স্থানে কবিকে যখন তখন দেখা যায়, আলাপরত, আসন্ন নাট্যাভিনয় ও তার ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনারত, ব্যস্তসমস্ত, অবস্থায়। সমস্ত শান্তিনিকেতনের পরিধি জুড়ে তাঁর সান্নিধ্য, শুনেছি ভোর চারটের সময় খোলা মেঠো পথেও তাঁর দেখা মেলে। তিনি যে আছেন, শান্তিনিকেতন ব্যাপ্ত করে রয়েছেন তিনি, এই অনুভূতি, আর তাঁকে চোখে দেখা—এই দুই মিলিয়ে আমার দেখা, নতুন করে।

তখন বর্ষাকাল। আকাশ কখনো মেঘে ঢাকা, কখনো বৃষ্টি, কখনো ক্ষণস্থায়ী রোদ। কিন্তু সমস্ত পরিবেশ ব্যেপে একটি করুণ সুর "ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি—অশ্রুভরা পুরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।"

আমি তখন একা। প্রায় নিজের মনের মধ্যে বাস করি। তাই এই বেদনা আমি অনুভব করেছি সেখানে আমার আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে।

এ দেখার এইখানেই শেষ। এর পর মন অনেক সহজ হয়ে এসেছে। 'নদী' মুখস্থ করার পর থেকে পনেরো বছর ধরে রবীন্দ্রদর্শনের প্রথম পর্ব শেষ হল। কল্পনার সঙ্গে বাস্তব যখন এক বিন্দুতে এসে মিলল, তখন মনের এক দিকের তৃপ্তি সম্পূর্ণ লাভ হয়েছে। এর দুই বছর পরে ১৯২৩ সালে যখন কলকাতায় অল্প দিনের জন্য বাস করতে হয় তখন এক বিশেষ যোগাযোগে ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে থাকবার সুযোগ পাই। রথীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেন।

শান্তিনিকেতনেই আমার রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে 'Sentimental Journey'র অবসান, যদিও সেটি কোনো মতেই journey's end নয়। কারণ এতদিনে মনোজগতে যে রোমান্টিক অনুভূতিটি উগ্র হয়ে উঠেছিল—রবীন্দ্রনাথকে একান্ত দুর্লভ মনে করে, তার উগ্রতা কমে এসেছে, তাঁকে এখন আমি সহজভাবে নিয়েছি, কারণ তিনি অত্যন্ত সহজভাবে তাঁর সঙ্গে মেশবার সুযোগ দিয়েছেন। তাঁর কাছে এসে কথা বলতে আমার তখন আর কোনো দ্বিধা নেই, তাঁর সৌজন্য সম্পর্কে আমি তখন নিঃসন্দেহ। এটি তাঁর সম্পর্কে আমার মস্ত বড় একটি মনস্তাত্ত্বিক আরাম। তা না হলে দু মাসের চেষ্টায় আসন্ন এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি তাঁর বাড়িতে বসে কখনো সম্ভব হত না। অর্থাৎ তাঁর আসন্ন 'বিসর্জন' নাটকের প্রস্তুতি এবং হট্টগোলকে অগ্রাহ্য করতে পারতাম না। হয় তো পরীক্ষাটাই বিসর্জন দিতে হত।

এই সময় কোনো একদিন একটি বিশেষ কাজে পিতৃনির্দেশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দোতলায় গিয়ে দেখা করি। এবারেও পেলাম সেই একই আকর্ষণকারী, স্নেহশীল, সহজ মানুষটিকে। সাজাদপুর অঞ্চলের স্মৃতি জাগল তাঁর মনে। আমার বাবা সাজাদপুরের অন্তর্ভুক্ত পোতাজিয়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে, ঐ অঞ্চলের নদী সম্পর্কে, কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর আমার এম-এ পরীক্ষা সম্পর্কে কথা উঠল। কি কি বই আমাদের পড়তে হয় এ বিষয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে 'নীলদর্পণ' নাটকের নাম করতে তিনি যেন চমকে উঠলেন। বললেন, নীলদর্পণ! তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সে চেহারাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভ্রূকুঞ্চিত হতে দেখলাম। আবার

জিজ্ঞাসা করলেন, নীলদর্পণ তোমাদের পাঠ্য? তারপর অন্য প্রসঙ্গে গেলেন। কি তাঁর বলবার উদ্দেশ্য ছিল তা জানা গেল না। তিনি তখন বিশেষ থেকে নির্বিশেষে চলে গেছেন। বললেন, তোমাদের এম-এ পড়াও দেখছি স্কুলের পড়ার মতো। কোনো তফাৎ নেই। আমি অতিরিক্ত যোগ করলাম, নোট মুখস্থ করে এম-এ পাস করা যায়।

আমি এর আগে আমার মতো একজন সাধারণ ছাত্রের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে শ্রদ্ধা দেখেছিলাম, আজও তাই দেখলাম। এ বস্তু তাঁর চরিত্রের একটি অঙ্গ, এর মধ্যে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা নেই। নিজের মনের কথা, আদর্শের কথা, যে কথা বললে অন্যের মঙ্গল হবে, সে কথা বলবার সময় উদ্দিষ্টের তা শোনবার অধিকার আছে কিনা, সে কথা তাঁর মনে নিশ্চয় স্থান পেত না। বার বার তাঁর এই স্বভাবের পরিচয় পেয়েছি। এ জিনিস তাঁর মতো লোকের পক্ষে অসম্ভব মনে হয়েছে, আবার এটি ঠিক তাঁর মতো লোকের পক্ষেই সম্ভব এ কথাও মনে হয়েছে। মহৎ ব্যক্তি ছাড়া এ চরিত্র আর কোথায় দেখা যাবে?

দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির ৬ নম্বর বাড়িটি বিশ্ববিখ্যাত। এর সদর দরজার ভিতরে প্রবেশ করেই বাঁ দিকের ঘরটিতে ছিলাম। উপর থেকে কবির মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে গাওয়া গানের টুকরো ভেসে আসত কানে। কোনো পুরো গান নয়। সম্ভবত নতুন গান রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। নানা সুরের টুকরো এসে কানে প্রবেশ করত।

অগস্ট মাসে বিসর্জন অভিনয় হয়। আমি এ অভিনয় দেখব না বলে আপন মনের কাছে শপথবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু বিকালবেলায় যখন মোটরে কবি সমেত শেষ দল এম্পায়ার থিয়েটারের দিকে রওনা হচ্ছেন দেখতে পেলাম, তখন সব ভুলে গিয়ে কয়েক মিনিট পরেই ট্রামে রওনা হয়ে গেলাম, এবং টিকিট সহজেই পেলাম। সেদিন থিয়েটারেই তাঁকে সেবারের মতো শেষ দেখা। অভিনয় শেষে তিনি জয়সিংহ বেশেই মোটরে উঠলেন এবং বাড়ির দিকে রওনা হলেন, এটি বেশ মনে আছে। (এই ঘটনা উপলক্ষে পরে একটি গল্প লিখেছিলাম "রবীন্দ্র জন্মোৎসব" নামে, জয়সিংহের পোষাকে পথে বেরোনর দৃশ্যটি আমি কাজে লাগিয়েছিলাম।)

আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম, তার কয়েক মাস আগে আমার একমাত্র ক্যামেরাটি চুরি হয়ে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথের ছবি তখন তোলা হয় নি বলে মনে ক্ষোভ ছিল। কলকাতায় ১৯৩১ সালে একটি সুযোগ

এসেছিল, এক স্থান থেকে একটি মস্ত বড় ফিল্ড ক্যামেরা ধার করে নিয়ে এক নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (তৎকালীন উপাসনা সম্পাদক) ও কিরণকুমার রায় (উপাসনার সহকারী সম্পাদক) সহ। সেখানে কবি কালিদাস রায় এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কবি দেরি করে আসাতে ফোটোগ্রাফ তোলা সম্ভব না হলেও তাঁর চরিত্রের এবারেও একটি অনুদ্ঘাটিত দিককে সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম।

কবিকে সেখান কোনো বিশেষ উপলক্ষে ডাকা হয় নি, একটা ঘরোয়া নিমন্ত্রণ মাত্র। কিন্তু তাঁকে যেভাবে সেদিন অত্যাচার সহ্য করতে দেখেছি, তাতে বোধহয় উপস্থিত আর সবারও দুঃখ হয়েছিল। যে গান তাঁকে শোনানো হয়েছিল, তা তাঁর গান নয় এবং সুগীত নয়। যেসব বিষয় তাঁকে শোনানো হয়েছিল তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য, তাতে কারোই মন রঞ্জিত হবার কথা নয়। নিমন্ত্রণকারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য ছিল, তাই এটিকে তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার করাই উচিত ছিল, বাইরের কাউকে না ডাকলে ভাল হত। কিন্তু এই পরিবেশে বসেও তিনি যেভাবে সব সহ্য করে গেলেন এবং বেশ হাসিমুখে, তাতে তাঁর সহ্য করার ক্ষমতারও একটা দিক দেখলাম। সুজনতার চরম।

৬নং বাড়িতে থাকাকালীন (১৯২৩) কবির সম্পর্কিত একখানা মোটা হিসাবের খাতা ওল্টানোর সুযোগ হয়েছিল। তা নকল করে রাখলে একটা বড় ইতিহাস লেখা চলত তাঁর নানা ঘরোয়া রুচি সম্পর্কে। তিনি তখন প্রতিদিন দুপুরে খাবার সঙ্গে একটি করে রাজভোগ খেতেন, বাজারের হিসাবে লেখা দেখেছি। একদিন কালিম্পং কিংবা শিলং যাবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছাবার পর যাওয়া হল না, সেজন্য স্টেশন থেকে ফিরে আসার খরচ—। এ জাতীয় অস্থিরমতিত্ব তাঁর অনেক বিষয়ে ছিল, এবং অনেকে লিখেওছেন সেসব কথা, কিন্তু তবু অনেক পাকা খবর পাওয়া যেতে পারত তাঁর হিসাবের খাতায়। বেহিসাবী মানুষের চরিত্র ভাল করে জানতে হিসাবের খাতা মস্ত বড় একটি আকর।

এ সবই টুকরো দেখা, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া, আসল দেখার কাজ যেটুকু তা ভিতরে ভিতরেই চলছে, কখনো তা কিছু ঝাপসা, কখনো বা কিছু উজ্জ্বল। এর পর ১৯৩৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির ৬।৩ নম্বর বাড়িতে মে মাসের কোনো একদিন (২৩শে?) সন্ধ্যায় তাঁর তখনকার রচিত বহু

গদ্যছন্দে লেখা কবিতা পাঠ শুনলাম। তিনি ভূমিকায় বললেন, পদ্যছন্দের চেয়ে এ জাতীয় কাব্য রচনা কঠিন, কেন না পদ্যছন্দ নির্দিষ্ট মাত্রা ঝোঁক ইত্যাদিতে একটা বিশেষ নিয়মে চলে, ছন্দের ঝোঁক এসে গেলে তার মধ্যে যন্ত্রের নিয়ম এসে যায় আপনা থেকেই, কিন্তু গদ্যছন্দে ব্যালান্স রাখতে হবে, রিদ্‌ম-এর কান থেকে। এটা ঠিক যান্ত্রিক নয়, এর মধ্যেও সমস্ত আবেগ প্রকাশ হবে, কিন্তু ছন্দ না থাকাতে এর বাঁধনে দায়িত্ব থাকা চাই বেশি।

এই গদ্যছন্দ দেখতে সহজ কিন্তু রচনা সহজ নয়, এই কথাটার উপর জোর দিয়েছিলেন বেশি করে। তারপর তিনি পর পর অনেকগুলো কবিতা পড়ে শোনালেন। যাঁদের এই গদ্যকাব্যের উপর শ্রদ্ধা ছিল না এমন কেউ কেউ ছিলেন সেখানে, তাঁরা কবির নিজ কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে দীক্ষিত হয়ে ফিরে এলেন। তখনও আমার কানে সমস্তক্ষণ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—

"আজ আমার প্রণতি
গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত
দিনাবসানের বেদিতলে।।

আর সব ছাড়িয়ে উঠেছিল "পৃথিবী" নামক এই কবিতার আবৃত্তি। আজ এত টেপ-রেকর্ডারের ছড়াছড়ি। সেদিন তার অভাবে কত বড় জিনিস হারিয়ে গেল, আর হারিয়ে গেল 'জন্মদিন' নামক ১৯৩৮ সালে কালিম্পং থেকে ব্রডকাস্ট করা পুরো আবৃত্তিটি। তার অংশ বিশেষ শুনেছি রেকর্ডে, রেডিওতে।

এরপর আর দেখা হবার কোনো সুযোগ আসবে কি না তা অজ্ঞাত ছিল। এবং আমি ক্যামেরা-আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ছবি তুলতে পারি নি, মনে মনে এ বিষয়ে বেশ একটা দুঃখ ছিল। সুযোগ এসে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমি এ সময় প্রতি রবিবার ফিল্ম ও নাট্য সমালোচনা করি রেডিওতে। ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ তারিখে নরেশ মিত্র কর্তৃক নাট্যে রূপান্তরিত গোরা উপন্যাস নাট্যনিকেতনের মালিক যশোদা ঘোষের নিমন্ত্রণে প্রথম দেখি—রেডিওতে সমালোচনার জন্য। এর পর-দিনই অনুরোধ এলো—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৪ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার অভিনয় দেখতে আসছেন, ফোটোগ্রাফ তোলা যাবে সে দিন।

সেদিন অভিনয় আরম্ভের কিছু আগে কবির সঙ্গে দেখা করে বললাম, আমি স্টেজের উপর থেকে ফ্ল্যাশের আলোয় আপনার একখানা ফোটোগ্রাফ তুলব, আপনার অনুমতি চাই তিনি বললেন, তুমি তোল ফোটোগ্রাফ।

তিনি প্রথম সারিতে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর আসনটি একটু স্বতন্ত্র ছিল, দু' পাশে কিছু ফাঁকা ছিল। আমি স্টেজের উপর উঠে ক্যামেরা ফোকাস করতেই তিনি প্রস্তুত হয়ে বসলেন। তাঁর তখনকার সেই প্রশান্ত মূর্তিটি আমি ঠিক ধরতে পেরেছিলাম ক্যামেরায়, সেজন্য খুব তৃপ্ত ছিলাম।

এরপর আবার সুযোগ এলো চন্দননগর বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে। সে এক অভিযান। সে এক রোমাঞ্চ। সে পরিবেশ বর্ণনা করা অল্প কথায় হয় না। মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথকে সম্মিলনিতে যাঁরা বেষ্টন করে ছিলেন, তাঁদের তালিকা দীর্ঘ। সে তালিকা দুর্লভও বটে। এখনও তা চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের কাছে আছে।

এইখানে প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথ যে উদ্বোধনী ভাষণ দেন, আমার শোনা এই তাঁর শেষ বক্তৃতা। প্রবাসী যষ্টি বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে সেদিনের স্মৃতি কিছু প্রকাশিত হয়েছিল "২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭" শিরোনামায়। (এই বিরাট গ্রন্থটির কোথাও প্রকাশ তারিখ নেই, হিসাব করে দেখলাম, ১৯৬০ সাল।)—এই স্মারক গ্রন্থ থেকে আমার প্রবন্ধটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

> "বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে"—আষাঢ়ের বৃষ্টি ধারার সঙ্গে এই গানটি শুনতে শুনতে আজ হঠাৎ তেইশ বছর আগেকার একটি মৃদু বর্ষাদিনের স্মৃতি জেগে উঠল মনে। তেইশ বছর আগের সেটি বর্ষাকাল নয়। ফেব্রুয়ারি মাস—২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭। আগের দিনের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ ছিল। তারই রেশ চলছে পরের দিনও। ভাঙা মেঘ, কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি!...
>
> "ইতিহাস রচিত হয়েছে সেদিন চন্দননগরে। তার আগে সেখানে কখনো যাই নি এবং সেদিন গিয়েও চন্দননগরকে কোথাও দেখিনি। দেখেছি শুধু সহযাত্রী সতীর্থদের পরিচিত মুখ।...
>
> "চন্দননগর! কত দর্শনীয়-ভরা ফরাসী রাজত্ব। এ সব কিছুই দেখি নি সেখানকার। তারপর দেখলাম হুগলী নদীর ঘাট। যে ঘাটে রবীন্দ্রনাথের হাউস-বোট বাঁধা আছে। 'অধ্যাপক' গল্পের নায়ক চন্দননগরে যে ঘাটে তার শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এবং যে শকুন্তলার তপোবন-কুটিরটি গঙ্গার ধারেই ছিল, সেটি ঠিক কণ্বের কুটিরের মতো ছিল না।...

সে তো অনেক দিনের কথা। সে ঘাটও আমি দেখি নি, অনুসন্ধানও করি নি কোথায়। কোনো তপোবন দেখব বলে আশাও করি নি। কিন্তু যা দেখেছি তা আমার আশৈশব লালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপ।—গঙ্গার তীর থেকে সামান্য একটু দূরের সেই নৌকাখানা। তারই মধ্যে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ, তীর থেকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।"

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ১—১৫ অক্টোবর প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা বেতার জগৎ থেকে এইখানে আরও কিছু উদ্ধৃত কবি।—

"তারিখটি ১৯৩৭-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি রবিবার। তারিখটি নানা কারণে স্মরণীয়। স্থান চন্দননগর, উপলক্ষ, বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন। এমন মহৎ সম্মিলনও আমি আর দেখি নি জীবনে। বাংলার তৎকালীন সকল বিখ্যাত সাহিত্যিক শিল্পী ঐতিহাসিক পুরাতাত্ত্বিক দার্শনিক বিজ্ঞানী—সবার সম্মিলন। মহাতীর্থ। যদিও মহামনীষীদের তীর্থদর্শনের জন্যই নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম, তবু প্রবীণ পূজনীয়দের সে তীর্থে আমি নিজে যে ভূমিকা নিয়েছিলাম সেটি তীর্থের কাকের। তীর্থটা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। লক্ষ্যটা অন্যদিকে নিবদ্ধ। ভাবলাম, কয়েকদিনের বিচিত্র অধিবেশনের খবর তো কাগজেই পড়া যাবে...এই চিন্তায় বিবেক তৎক্ষণাৎ দ্বিধামুক্ত হল এবং অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে শ্রীঅমল হোমের সঙ্গে ষড়যন্ত্রটা পাকা করে ফেললাম।

"প্রথম দিনের উদ্বোধনী ভাষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। বেলা বারোটায় সভা আরম্ভ হয়েছিল। তাঁর অভিভাষণ শেষ হলে তিনি চলে গেলেন তাঁর সেদিনের ভাসমান বাড়িতে, অর্থাৎ তাঁর বোটখানার মধ্যে। কিছুক্ষণ পরেই অমল হোমের সঙ্গে সভা থেকে পালিয়ে ঐ বোটে গিয়ে উঠব এই ছিল আমাদের ষড়যন্ত্র।"

বিকেলের দিকে মেঘে আকাশ ঢাকা পড়েছিল, হাল্কা গুঁড়ো পাউডারের মতো বৃষ্টি ঝরে পড়ছিল মাঝে মাঝে। এবারে সিংহকে আপন গুহাকোটরে বন্দী করেছি, মনে এই রকম একটা উল্লাস। শীতের বেলা, আলো দ্রুত নিবে আসছিল, অতএব আগে গিয়ে উদ্দেশ্য নিবেদন করেই ক্যামেরা খুললাম।

তাঁর ভাষণ শুনে মন খুব প্রফুল্ল ছিল। তাঁর লিখিত ভাষা আর মুখের ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। অলিখিত ভাষণও যেন মুখস্থ করা। রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁরই ভাষা, অতএব সেই ভাষা স্বতই কণ্ঠ থেকে

আয়াসহীন, দ্বিধাহীন এবং রসসমৃদ্ধ হয়ে অবিরাম ধ্বনিত হলে শ্রোতার মনে স্বভাবতই একটা চমক লাগে, অন্যের ভাষণ অন্য যে ভাবেই শ্রুতিমধুর হোক, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা যিনি শোনেন নি, তাঁর পক্ষে এর রূপ কল্পনা করা কঠিন।

কিন্তু যতই মন তাঁর সান্নিধ্যে সহজ হয়েছে মনে করি না কেন, একটা বিস্ময়ের দূরত্ব যেন থেকেই যায়। সে খুব সামান্য হলেও থাকে। তাকে অতিক্রম করা সহজ নয়, অন্তত রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমি পারি নি। কাছে দূরে রা সব সময়েই, সেই অদেখা রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে আমার প্রথম মানস-ছবিখানি বাস্তব রবীন্দ্রনাথের উপর সামানাসামনি বসে সুপার-ইম্পোজ করতে থাকি। মাঝে মাঝে সরে যায়, আবার এসে দুটি এক হয়। মনের এ কি ব্যবহার আমি জানি না। তাই বোটের ভিতর গিয়ে কোন্ অনুভূতিটি প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা বিশ্লেষণ করা শক্ত। তবে তাঁর পোষাকের রং দেখে ১৯৩২ সালের একটি অনুভূতি পুনরায় মুহূর্তের জন্য মনে জেগেছিল। সেই সময়ে নিউ এম্পায়ারে অভিনীত নবীন ঋতুনাট্যের একটি গানে কবি বিদায়-বেদনার একটি সুর লাগিয়েছিলেন, যা বিশেষভাবে আমার মনে ছাপ রেখে-ছিল। অনেক বিদায়ী সুরের মধ্যে সেই একটি সুর, একটি ছবি—

"ঝরা পাতা গো আমি
তোমারি দলে।"

এই গানের মধ্যে এক জায়গায় আছে—

"তোমার মতো আমার উত্তরী
আগুন রঙে দিও রঙীন করি,
অস্ত রবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে।"

আজ এ ছবিটি জীবন্ত দেখলাম। সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছেন ঝরা পাতার রঙের মতোই আগুন-রঙা উত্তরীয়। অপরাহ্ণ সূর্য তখন বিদায়মুখী—যদিও মেঘে ঢাকা। তাঁর এই নিঃসঙ্গ মূর্তিটি দেখে সে সময় হঠাৎ মনে হয়েছিল এক কল্পজগতে প্রবেশ করলাম। কিন্তু অনুভূতিটি চকিতে এসে চকিতে মিলিয়ে গেল। কারণ আমি একা ছিলাম না। এবং কিছুক্ষণ আলাপের পরেই অনেকে এসে উপস্থিত হলেন। তখন অনিল চন্দ ছিলেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় একটুখানি পরেই চলে গিয়েছিলেন। আমাদের আলোচনা

খুব সহজ সুরে, এবং অত্যন্ত খোলাখুলি। কবি নিজেই আমাদের পরিবেশকে সহজ করে দিয়েছিলেন তাঁর গম্ভীর রসিকতার সাহায্যে। তাঁর নিজস্ব পরিবেশে ছিল একটি রেডিও, একটি বিনোকুলার, কাঁচের পাত্র ভরা টফি, এবং অনিল চন্দ।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর প্রবেশ ঘটল। কবি সম্ভবত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হয় তো অপেক্ষিত সময় পার করে তিনি এসেছেন। কিন্তু কবির ব্যবহারে তা বোঝবার উপায় নেই। তিনি আড়চোখে সুধাকান্তের প্রবেশ লক্ষ্য করেই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "সিনেমা দেখা শেষ হল?"

সুধাকান্ত এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি চমকে উঠে বললেন, "এখানে সিনেমা!"

কবি আরও গম্ভীরভাবে বললেন, "চন্দননগরে হয়তো হয়, ঠিক জানি নে।"

এতক্ষণে সুধাকান্ত আঘাত কাটিয়ে উঠেছেন এবং কবিকে তিনি ভালই জানেন বলে আর অপেক্ষা না করে আপন কাজে মনোযোগ নিবিষ্ট করলেন। সে কাজ যে কি, তা বলতে পারব না, তা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। অমল হোম বললেন, "এঁরা যা খাইয়েছেন তার তুলনা হয় না।" তিনিও হয় তো জানতেন, এই মুহূর্তে কবি কোন্ কথায় মুগ্ধ হবেন। খুব উত্তেজনার সঙ্গে কথাটা শোনালেন কবিকে। কণ্ঠে এমন আবেগ যে আদিম যুগ হলে সুরের সাহায্য ভিন্ন এ কথা বলা যেত না। কথায় কাজ হল। কবি তৎক্ষণাৎ অনিল চন্দকে বললেন, "অনিল, তুমি তো ওখানে বলে এলে আমি খাব না, শুনলে তো?" অনিলবাবু বললেন, "ও'রা সব এখানে পাঠিয়ে দেবেন।"

পরিবেশ এমন কথায় সহজ না হয়ে পারে? কাব্য নয়, শিল্প নয়, দর্শন নয়, শুধু সন্দেশ-চমচম কথা। (যথেষ্ট রসাত্মক হলেও যা কাব্য নয়, এবং আজ এই ১৯৬৫-র শেষে—এই রচনা লেখার কালে—যা দেখা, স্পর্শ করা, এবং খাওয়া আইনত নিষেধ।)

অমল হোমের কথায় কবি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন এবং ঠিক সেই সময় তাঁর দুই পরম নির্ভর সুধাকান্ত অথবা অনিলকুমার—এই দুয়ের কেউ উপস্থিত না থাকলে সে চাঞ্চল্য মুক্তি পেত কোথায়? সব সময় সব মুক্তি কি আলোয় ধূলায় আকাশে ঘাসে অথবা সর্বজনের মনের মধ্যে মেলে?

আর ঠিক এই চাঞ্চল্যের মুহূর্তে প্রকাণ্ড একখানা পরাতে থরে থরে সাজানো সন্দেশ এসে হাজির হল। কবি-মগজের স্বাদ-কেন্দ্রে এতক্ষণ যে আণবিক বা মোলিকিউলার চাঞ্চল্য ঘটেছিল তা থেমে গেল, সেই স্বাদকেন্দ্র থেকে গ্যাসটেটরি ও অলফ্যাকটরি স্নায়ু বেয়ে একটা আনন্দ স্রোত একবার বাইরে একবার ভিতরে ছুটতে লাগল। পুলক দৃষ্টি-স্নায়ু বেয়ে চোখের তারায় নাচতে লাগল।

তা দেখে আমরাও আশ্বস্ত হলাম। আমার এ দৃশ্য আগে দেখা ছিল না। কবিকে আরও সাধারণ রূপে দেখলাম। সাধারণ মানুষ, এবং এ সত্যও অবশ্যই জানা ছিল যে, কবিকে যেখানে ভুল করে খুঁজি সেখানে কবি অনুপস্থিত। ভুল করে খুঁজি, কবি মানুষটাকে বাদ দিয়ে শুধুই তাঁর কাব্যের মধ্যে। এখানে কবির সঙ্গে আমার মতভেদ। সন্দেশের প্রতি লোভ কবিধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে আমি বিশ্বাস করি। ইংরেজীতে একটি অতি অর্থহীন কথা প্রচলিত আছে—Man cannot live by bread alone. এ কথা কি একটা আবিষ্কার?—আর তাই বা কেন? মানুষ শুধু রুটি খেয়ে কি বাঁচতে পারে না? বাঁচতে ঠিকই পারে, কিন্তু শুধু-রুটি তার ভাল লাগে না। মাখনও দরকার হয়। শুধু অন্ন ভাল লাগে না। নুনও চাই, ব্যঞ্জনও চাই। ঐ ইংরেজী কথাটির এটাই একমাত্র অর্থ। এবং এ অর্থ কখনও ঠিক নয় যে, মানুষের উদরটাই সব নয়, তার মনও আছে। এটা কি একটা বিজ্ঞের কথা? দুটো সব সময়ে একত্র থাকে। কাজেই পৃথক ভাবার কথাই ওঠে না। শুধু-মানুষ বাঁচতে পারে না, তার এক জোড়া হৃৎপিণ্ড চাই, বা ফুসফুস চাই, বা পাকস্থলী চাই—এসব শিশুজনোচিত উক্তি। এ সব বাদ দিয়ে কেউ মানুষকে ভাবে না, অন্নের বেলাতেও তাই।

অতএব কবির যে অংশকে স্তুতিনিন্দার জ্বরে কাঁপায়, তার মধ্যে কবিকে আমি বেশি পাই। এবং কাব্য যেমন, কবিকেও ঠিক তেমনি দেখি। কিন্তু একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

বক্তৃতার কথা উঠেছিল। কবি বললেন, "বড় বড় বক্তৃতা কেউ শোনে না। আর সাহিত্য বিষয়ে কিছু বললে সেখানে লোকও বেশি আসে না।" এবং প্রায় একই সঙ্গে বললেন, "এর সঙ্গে সিনেমা দেখালেই তো পারে। ধর, সঙ্গে যদি আলিবাবা দেখানো হত!"

লক্ষ্য করলাম, কবি এই অল্প সময়ের মধ্যে দুবার সিনেমার কথা পাড়লেন। এর আগে সুধাকান্তকে বলেছেন। সিনেমার কথা মনের সামনে বার বার

আসছে কেন? তখনও তো সিনেমার প্রসার এখনকার মতো এমন বিস্তৃত হয় নি, অবশ্য আমাদের বাংলা সিনেমার জন্য বড় একটা দলের উন্মাদনা তখনই প্রকট হয়ে উঠেছিল, এবং তা কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। মনে হয় কবি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু সাহিত্য সভা করলে ভবিষ্যতে লোক জোটানো দায় হবে, তার সঙ্গে সিনেমাও চাই, অন্তত সিনেমার শিল্পীরা কেউ থাকলেও চলবে। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তা হলে তাঁর সেদিনকার অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা ভবিষ্যৎ আজ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

গোরা নাটকরূপে অভিনীত হতে আমি আগেই দেখেছিলাম, কবির সঙ্গে ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখেও দেখেছিলাম অতএব আমি গোরার প্রসঙ্গ তুললাম, এবং কিছুক্ষণ সে বিষয়ে আলাপ চলল। সে সময়ে ওখানে অমল হোম আর নীহাররঞ্জন রায় ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম, "একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি এই যে, যার যা কিছু বিদ্যা, তা এখন হয় সিনেমায় না হয় থিয়েটারে বিক্রি হচ্ছে। যেমন একটা গোটা ব্যায়াম সমিতি গোরা নাটকে এসে তাদের ব্যায়াম দেখাচ্ছে। এটি নাটকের রস কিছু ক্ষুণ্ণ করে মনে হয়।"

এ কথা শোনামাত্র রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "নাটকে হঠযোগের কথা থাকলে তাও দেখতে পেতে!"

এমনভাবে কথাটি বললেন, যার মধ্যে কৌতুক ফুটলেও এ জাতীয় ব্যাপার যে তাঁর ভাল লাগে নি এটা স্পষ্টই বোঝা গেল। এরপর এক কথা থেকে আর এক কথা। শেষে জাতীয় সঙ্গীতের কথা। এবং সে সব এমন কথা যা আজও উচ্চারণ করলে সাহিত্য জগতের শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা আছে, এবং এতদিনেও রবীন্দ্রনাথের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ যদি উদ্ধারপ্রাপ্ত না হয়ে থাকেন, তবে তা হবেন। অতএব সেকথার ধ্বনিকে আর প্রতিধ্বনিত করা সম্ভব হল না। এবং এ ছাড়াও একজন গায়ক সম্পর্কেও অনেক সব ঘরোয়া আলোচনা হয়েছিল, যা আজ আর প্রকাশ করা চলে না।

আরও একটি কথা উঠল, চিঠিতে নিমন্ত্রণ জানানো বিষয়ে। কথাটি কোন্ প্রসঙ্গে উঠেছিল মনে পড়ে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বেশ উত্তেজিত ভাবে বললেন, "চিঠিতে নিমন্ত্রণ জানালে তার সঙ্গে ত্রুটি মার্জনা করবেন লেখা হয় কেন? ত্রুটি হল কোথায় যে মার্জনা চাওয়া? নিমন্ত্রণ পাঠানো তো একটা সৌজন্য। সৌজন্য কি ত্রুটি?'

বিষয়টি আগে চিন্তা করিনি, তাই খুব ভাল লাগল কথাটা, এবং আমি অন্তত 'ক্রুটি মার্জনা করবেন' একথা কোনো নিমন্ত্রণ চিঠিতে আর লিখিনি। বরং পরে আমি এই প্রথার বিরুদ্ধে লিখেছি।

এর পর বনফুলের আবির্ভাব ঘটল। সে তার সদ্য প্রকাশিত বৈতরণীর তীরে নামক বইখানা প্রণামান্তে কবির হাতে দিতেই হাসতে হাসতে বললেন, "বৈতরণীর তীরে! আমাকে! নামটা ভয়ঙ্কর, হে।"—অর্থাৎ সেইখানেই কি তাঁকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে? তারপর দু-এক পাতা ওলটালেন, তারপর বললেন, "বনফুলের সঙ্গে পরিমলের মতের মিল আছে, না?"—সম্ভবত নামের অর্থের প্রতি ইঙ্গিত এটি, অথচ ব্যক্তিগত জীবনেও কথাটি মিথ্যা হয় নি। এর অন্য কি ইঙ্গিত বোঝা গেল না।

সেদিন নৌকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র প্রকাশক আরো দু-একটি ছোট-খাটো ঘটনার উল্লেখ করি—

একজন অটোগ্রাফের খাতা পাঠাচ্ছিলেন তীর থেকে। দূর থেকে খাতা দেখেই তিনি বললেন, "অটোগ্রাফ চায় বোধ হয়।" অমল হোম বললেন, না সেরকম তো মনে হয় না। তিনি খাতাখানা খুলেই দেখলেন একখানা কাগজে লেখা—Will you give your autograph?—খাতায় স্বাক্ষর করে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, "এ জিনিসটা আসতে দেখলে দূর থেকেই বুঝতে পারি।"

এর পর নৌকায় উঠে এলেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার এবং আরও দু-একজন। নলিনীকান্ত প্রণাম করতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর নাম স্মরণ করতে লাগলেন—"নলিনাক্ষ—নলিন—"

নলিনীকান্ত সরকার বললেন, "আমি সেকালের বিজলীর নলিনীকান্ত সরকার।" কবি তৎক্ষণাৎ বললেন, "নলিনীকে ভোলবার সময় তো এলো।"—এবারেও দুজনের নামের অর্থের প্রতি ইঙ্গিত, অর্থাৎ সূর্যের সঙ্গে সরসিজের সম্পর্ক। আমাকে বললেন, "আমার বোটের একখানা ছবি নিও, এ আমার বহু দিনের বোট।"

এ ঘটনাগুলো বোধ হয় তিন-চার মিনিটের মধ্যে ঘটেছে—আমার বর্ণনায় দেরি হল স্বভাবতই। এরপর এলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস। হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এর আগে এসেছেন।

সুনীতিকুমার আসতে ভাষা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হল। নৌকার মধ্যে বসল ভাষাতত্ত্বের সভা—বাইরের সাহিত্যসভার পরেই।

বানান একটা নিয়মে বাঁধা দরকার, এবং তৎসম শব্দ যেমন চলছে চলুক, কিন্তু তদ্ভব শব্দের ধ্বনিগত বানানের অরাজকতা থামানো দরকার এই হল কবির মত। তিনি সে কথা বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন। বললেন, "হল" শব্দের মাঝখানে ইলেক দিয়ে হ'ল লিখতে পারব না, বরং হোল লিখব উচ্চারণ অনুযায়ী।

আমি বললাম, "বানান বা শব্দের ব্যবহার নিয়ে যখন যে রীতিকে গাল দেওয়া যায়, কিছুদিন বাদে দেখি সেটাই স্থায়ী হয়ে পড়েছে! যেমন সংস্কৃতি অর্থে আপনি কৃষ্টি শব্দটার বিরোধী, কিন্তু ঐ শব্দটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে ওটা আরো বেশি-বেশি চলছে।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "কিন্তু আমার কৃষ্টি আছে এটা স্বীকার করছে তো?"

তিনি "ভেতর" "ওপর" লেখেন না, "ভিতর" "উপর"—লেখেন এবং বলেন। অন্যেরা যাই লিখুন তাঁর হাতে ভেতর ওপর আসবে না। আরো বললেন, "ম্লান" শব্দটা তিনি তাঁর বাড়ির প্রচলিত উচ্চারণে পড়েন। ধ্বনিগত বানানে লিখলে দাঁড়াবে ম্লানো। অন্য কারো লেখা এক কবিতায় ম্লান-এর সঙ্গে আন্-এর মিল দেখে তাঁর মনে হয়েছিল রাইমিং-এ ভুল হয়েছে।

তারপর ছোড়া ও ছোঁড়া। চারুবাবু বললেন,"ছোঁড়া—বালক, এবং ছোড়া—নিক্ষেপ করা। এ বিষয়ে আমাদের সবারই কিন্তু মতভেদ হল। কবি বললেন, "দুটোতেই আমি চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করি।" তারপর সুনীতি-বাবুকে বললেন, "তুমি তো এ বিষয়ে বাদশা, তুমি বাংলা শব্দের একখানা অভিধান লেখ, তাতে শব্দের অর্থ থাকার কোনো দরকার নেই, শুধু বানানের জন্য তার ব্যবহার হবে। একা করবে, কমিটি করলে কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।"

এরপর কবির নির্দেশ মান্য করে তাঁর বোটের ফোটোগ্রাফ তুলতে ডাঙায় উঠে এলাম। আলো তখন প্রায় নিবে গেছে।

এর পরেও অনেকে এসেছিলেন, তখন আমি অনুপস্থিত। সমস্ত দিন বিশ্রামহীন সুজনতা, বিচিত্র মানুষের ভিড় সহ্য করা, এবং সব সময় কৌতুকের আবরণে মণ্ডিত করে মনের কথা বলা, এবং কোনো রকম বিরক্তিবোধের

চিহ্ন প্রকাশ না করার যে ক্ষমতা সেই একটি দিন ধরে সবাই দেখেছেন, তা এক দিনেই শেষ নয়।

এর দিন সাতেকের মধ্যেই আমি কয়েকখানা ফোটোগ্রাফ আগফা কম্পানি থেকে তৈরি করিয়ে বিকেলের দিকে দেখা করলাম। তিনি তখন ৬৷৩ নম্বর বাড়ির দোতলার একটি ঘরে বসে ছিলেন, পাশে একজন মহিলা ছিলেন। আমি ছ'খানা ফোটোগ্রাফ তাঁর হাতে দিতেই তিনি তার উপর চোখ বুলিয়েই বললেন, ‘‘পরিমল, তুমি ফোটোগ্রাফি ধরেছ কবে থেকে?”— বললাম “ক্যামেরা অনেক দিন ধরেই আছে।” আরও বললাম ‘‘আমাকে তিনখানা ছবিতে স্বাক্ষর করে দিন।” তিনি আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করার আগেই ছয়খানা ছবিতেই স্বাক্ষর করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, “এর মধ্যে মাউণ্ট করা তিনখানা আপনার জন্য এনেছি।” কবি আমার দিকে চেয়ে বললেন, “বল কি! এমন দাক্ষিণ্য তো আমাকে কেউ করে না। ছবি তোলে, দেয় না। তুমি আরো কয়েকখানি ছবি আমাকে দিও।”

আমি তিনখানা তাঁকে ফেরৎ দিতেই উপস্থিত মহিলাটি তা থেকে একখানা নিলেন।

আমার চোখের দেখা এইখানেই শেষ।

১৯৩৭ সনে এসে শেষ হল—১৯১৭ সনে হয়েছিল যার আরম্ভ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখা। আমি নানাভাবে যেমন তাঁকে দেখেছি, প্রধানত তাই আর সবাইকে দেখাতে চেষ্টা করলাম। এবং ১৯১৭ সনের আগে প্রথমে তাঁকে যেমন মনের চোখে দেখেছিলাম, ১৯৩৭-এর পরেও তেমনি তাঁকে দেখছি সেই মনেরই চোখে। এখন দৃষ্টিতে সে স্বপ্নময়তা নেই, কিন্তু আমার মনের দৃষ্টি কবি-মনের আরও গভীরে ব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর অনেক বেদনা, অনেক আনন্দ, বিস্ময়—তাঁর গানে ফুটেছে বেশি। সেই গানের ভিতর দিয়ে তিনি যেমন বিশ্বপৃথিবীকে দেখে তাকে বেশি চিনতে পারতেন, আমিও তেমনি তাঁর গানের ভিতর দিয়ে দেখে তাঁকে এখন বেশি চিনতে পারি।

তিনি আমাদের নতুন ভাষা দিয়েছেন, নতুন আশা দিয়েছেন, চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত বিস্তার করেছেন, কাব্যে গানে নতুন সুর, নতুন সমৃদ্ধি দিয়েছেন, সাহিত্যচিন্তা বিস্তৃত করেছেন, প্রথম ছোট গল্পের অকল্পিতপূর্ব স্বাদ দিয়েছেন, দেশের বিস্মৃত সম্পদকে উদ্ধার করার পথ

দেখিয়েছেন, দেশকে আত্মবোধে জাগ্রত করেছেন, সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে একক কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন, পরিচিত পুরাতনের শ্রেয়র সঙ্গে অজানা নতুনের হাত মিলিয়েছেন, মানুষের হৃদয়ের শত স্তরের কোমলতম রহস্য-সৌন্দর্য কাব্যে গানে উদ্ঘাটিত করেছেন, মানবতার জয়ে তাঁর সঙ্গীতকে মুখরিত করেছেন, দেশে দেশে ভারতের বাণী প্রচার করেছেন, বঞ্চিতের দুঃখবেদনার ভাষা দিয়েছেন। এমন মানুষকে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি একথা স্বীকার করাতেও পুণ্য। সেই মানুষকে কিভাবে বর্ণনা করব? আমার আংশিক পরিচয়, কত ছোট পরিচয়। আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ আমি আর কাকে দেখাতে পারি?

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৭-১৯৫৯

ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় এমন একটি প্রবাদ আমাদের দেশে বহুকাল প্রচলিত আছে, কিন্তু ঐ সময়ে কার গীত গাওয়া উচিত তার কোনো নির্দেশ নেই। অতএব আমি যদি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে আগে রাজশেখর বসুর গীত গাই, তা হলে আশা করি আমার ত্রুটি ধরবেন না কেউ।

গোড়া থেকেই বলি। আমি গত প্রায় দশ বছর ধরে স্কুল বা কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে রাজশেখর বসুর নাম, তারা কেউ শুনেছে কি না, জিজ্ঞাসা করে আসছি। এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, অতএব মোটামুটি একটা হিসাবে আসা যেতে পারে।

প্রশ্নের ফলে জানা গেছে এদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন রাজশেখর বসুর নাম শুনেছে, কিন্তু তিনি কি করেছেন, তা কেউ বলতে পারে নি। পরশু-রামের নাম কেউ শোনে নি রামায়ণের ছাড়া। গড্ডলিকা, কজ্জলী কি জিনিস তা কেউ জানে না।

চলন্তিকার নাম শুনেছে শতকরা পাঁচজন। এবং চলন্তিকা যে বাংলা অভিধান তা জানে শতকরা দু'জন। জানে, কিন্তু চোখে দেখে নি। তবু কেউ কেউ যে চলন্তিকার নাম শুনেছে, এটি আমার কাছে খুব আশাপ্রদ মনে হয়েছে। আশাপ্রদ এই কারণে যে, রাজশেখর বসুর যা কিছু সাহিত্যকৃতি, তা ছাত্রসমাজের কাছে মোটামুটি অজ্ঞাত থাকলেও চলন্তিকার নাম তাদের একটা অংশের কাছে পরিচিত, যদিও, তা যে রাজশেখর বসুর লেখা তা কেউ জানে না।

অভিজ্ঞতাটা অবশ্য আমার সীমানার মধ্যে, তার বাইরের হিসাব অন্য রকম হওয়া সম্ভব।

অভিধানের ব্যবহার আমাদের দেশে ব্যাপক নয়। চলন্তিকা এবং তার রচয়িতা সম্পর্কেই যদি এই পরিমাণ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হলে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তাঁর বৃহৎ কীর্তি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত বাংলা অভিধান—বঙ্গীয় শব্দকোষ—তার নাম যে বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে অপ্রচারিত থেকে যাবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক। এবং অভিধানে যত

অর্থই থাক, এ দেশে অভিধানের কোনো অর্থ নেই। এখানে বানান সব ব্যক্তিগত, এবং মনে হয় পাড়ায় পাড়ায় স্বতন্ত্র। বানান প্রত্যেক বইতে, খবরের কাগজে, পৃথক। এবং বহুস্থলে শব্দের অপপ্রয়োগ। অভিধান-অভ্যস্ত দেশ হলে এমন হত না। এক একটি খবরের কাগজেও আবার বিভিন্ন পাতায় বিভিন্ন বানান, এমন কি যিনি সংবাদ লেখেন এবং যিনি সেই সংবাদের শিরোনামা লেখেন তাঁদের ছ'জনের বানানও পৃথক।

অতএব বঙ্গভাষার সর্ববৃহৎ অভিধান প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে রচনা লেখারই বা কি দাম আছে তাই ভাবি। বঙ্গীয় শব্দকোষ অজ্ঞাত, তার রচয়িতা অজ্ঞাত। ছোটখাটো অভিধান হলে এতটা অপরিচয়ের অবহেলা হয় তো হত না। বঙ্গীয় শব্দকোষের বিরাটত্বও সম্ভবত এ জন্য দায়ী। এই শব্দকোষের সঙ্গে শব্দের পিচ বা গ্রামের তুলনা করা চলে বোধ হয়। ধ্বনি অর্থে শব্দের কথা বলছি। বায়ুকম্পনে শব্দের উৎপত্তি। প্রতি সেকেণ্ডে একটা নির্দিষ্ট কম্পন মাত্রা পর্যন্ত উচ্চ পিচ্-এর বা উচ্চ গ্রামের শব্দ আমাদের শ্রুতির সীমানায় থাকে. কম্পনসংখ্যা তার চেয়ে বেশি হলে তা শ্রবণ সীমানার বাইরে চলে যায়। আবার নিচের দিকে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যার কম হলে তাও আর শোনা যায় না। ছ'দিকের কম্পন মাত্রা বা ফ্রিকোয়েন্সি সেকেণ্ডে মোটামুটি একদিকে ৩০, অন্যদিকে ৩০ হাজার। এর সঙ্গে তুলনায় চলন্তিকা ৩০-এর কাছাকাছি আছে, কিন্তু বঙ্গীয় শব্দকোষ ৩০ হাজার অতিক্রম করে গেছে।

কুড়ি বছরের নীরব সাধনা, এবং আরও আশ্চর্য—একক সাধনার ফলে, বঙ্গীয় শব্দকোষ। এ শুধু কর্মনিষ্ঠা নয়, দুঃসাহসও বটে। এই দুইয়ের সমাবেশ এ যুগে অন্য কোনো বাঙালীতে দেখা গেছে কি না আমার জানা নেই। অর্থ, প্রতিপত্তি, মান, বা বৈষয়িক কোনো সুবিধার দিকে না চেয়ে শুধু একমনে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান রচনা করে গেছেন। তাঁর কথা ভাবলে তাঁকেও তাঁর অভিধানের মতোই বড় মনে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিধান রচনার আদেশ শিরোধার্য করে হরিচরণ যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে এত দীর্ঘকাল ধরে একই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন, সে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা শান্তিনিকেতনের সীমানার মধ্যেও খুব বেশি পাওয়া যাবে না। এমন গুরুভক্তি শুধু পৌরাণিক কাহিনীতে মেলে।

এই সাধনারত শিক্ষককে আমি দেখেছি শান্তিনিকেতনের পরিবেশে। তাঁর নীরব কর্মরত শীর্ণ মূর্তিখানি আমার মনে আজও শ্রদ্ধার আসনে

প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। আমি যখন দেখেছি তখন তাঁর বয়স ৫৪ বছরের কাছাকাছি। অভিধান রচনার পথে তখন তিনি অনেকদূর এগিয়ে গেছেন।

তাঁর কথা মনে হলেই কেন জানি না ঋণ শোধের উপনন্দের কথা মনে পড়ে। সন্ন্যাসীকে উপনন্দ বলছে—

"ছোট বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্য এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলাম। পুরোহিত আমাকে বোধহয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বললেন, এস বাবা, আমার ঘরে এস। সেইদিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন……আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান,……তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে, তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রং দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন।"……

"সন্ন্যাসী বললেন, "সুরসেনের বীণা শুনতে পেলাম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শুনে নিলুম এর সুর কোনোদিন ভুলব না। বাবা, লেখো, লেখো।"

হরিচরণের জন্ম সন ইংরেজী ১৮৬৭, তারিখ ২৩শে জুন। ১৯৬৭-র ২৩শে জুন তাঁর জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। এই উপলক্ষে এক নির্লোভ, বিনয়ী খ্যাতি-উদাসীন আভিধানিককে স্মরণ করার মধ্যেও হয় তো কিছু দুঃসাহস আছে। তবু বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে অন্তত এ কথাটা এই উপলক্ষে প্রচার হবে যে, দরিদ্র কিন্তু অবাঙালীসুলভ ধৈর্য এবং একনিষ্ঠতাগুণসম্পন্ন এক বাঙালী, পাঠক-বাঙালী ও লেখক-বাঙালীর সুবিধার জন্য দীর্ঘ কুড়ি বছর একার চেষ্টায় বৃহত্তম অভিধান সঙ্কলন করে গেছেন। আরও প্রচার হবে যে, পতিসরে সামান্য জমিদারির কাজে নিযুক্ত এই ব্যক্তিটিকে রবীন্দ্রনাথ আলাপ-মাত্র চিনতে পেরে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন এবং তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করেন। এবং তিনিই তাঁকে নির্দেশ দেন পূর্ণাঙ্গ বাংলা শব্দকোষ রচনা করতে।

এই 'উপনন্দ' কুড়ি বৎসর ধরে খাতা লিখে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক আশ্চর্য যোগাযোগ। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসেন তখন বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। রবীন্দ্রনাথের বহু কৃচ্ছ্র সে সময়ে। তাই হরিচরণ তাঁর অধ্যাপনার অবসরে শব্দকোষের কাজ করতে করতে সাত-আট বছর পার হবার পর যখন অর্থাভাবে আর এগোতে পারেন না, তখন তাঁকে কাজ বন্ধ করে কলকাতার কোনো কলেজে কাজ নিতে হয়েছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সব কথা নিবেদন করলেন। সব শুনে রবীন্দ্রনাথ দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে হরিচরণের অভিধান রচনার জন্য ভিক্ষার হাত প্রসারিত করলেন। মাসে পঞ্চাশ টাকার ব্যবস্থা হল। গুণী লোকের জন্য এ কার্য রবীন্দ্রনাথ আগেও করেছেন। সবাই জানেন অর্থাভাবহেতু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের কাজ যাতে পণ্ড না হয় সেজন্য তিনি ত্রিপুরারাজের কাছে ভিক্ষা চাইতে কুণ্ঠিত হন নি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হরিচরণের জীবন এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল মনে হয়। হরিচরণ যখন স্কুলের ছাত্র সেই সময় তিনি তাঁকে অর্থ সাহায্য করেছেন। তারপর কলেজে পড়তে গিয়ে যখন অর্থাভাবে পড়া বন্ধ হবার উপক্রম তখন রবীন্দ্রনাথের একখানি সার্টিফিকেট তাঁর কিভাবে কাজে লেগেছিল তার বর্ণনা ও অন্যান্য কথা পাওয়া যাবে হরিচরণ প্রণীত "রবীন্দ্রনাথের কথা" (সান্যাল অ্যাণ্ড কো) নামক গ্রন্থের "আত্মপরিচয়" নামক প্রবন্ধে। ঐ গ্রন্থেরই "ব্রহ্মচর্যা" নামক প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনে আসা ও অভিধান রচনার কথা আরও সংক্ষেপে পুনর্বর্ণিত হয়েছে।

হরিচরণ যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় কোনো কারণে তাঁর মাসিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, অতএব পড়া ছাড়তে হল। তখন যে-কোনো চাকরি পেলেই তিনি ধন্য হতে পারেন এমনি অবস্থা। তাঁর বড়দা (পিসতুতো ভাই) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদারিতে খাজাঞ্চির কাজ করেন। তাঁরই আবেদনে রবীন্দ্রনাথ হরিচরণকে পতিসরের জমিদারিতে এক কর্মচারীর পদ দেন। ১৯০২ সন সেটি। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে গেলে তিনি হরিচরণকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি দিনে কি কাজ কর? হরিচরণ তখন মুদ্রণের জন্য সংস্কৃতের একটি প্রেস কপি তৈরি করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেটি দেখতে চাইলেন। দেখে তখন কিছুই বললেন না।

তারপর শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে হরিচরণকে ডেকে পাঠালেন এবং

সংস্কৃত অধ্যাপনার কজে নিযুক্ত করলেন। সেটি ১৯০২ সন, তখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র সংখ্যা চোদ্দ-পনেরো। ১৯০৪ কিংবা ৫ সন থেকে তাঁর শব্দকোষের কাজ আরম্ভ—রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে।

১৯২৪ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ এই আবেদন পত্রখানি প্রচার করেন—

> "শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত বিশ বছর ধরিয়া বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর অভিধান বাংলায় নাই। এই পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে আমরা প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছি। এই বৃহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রকাশ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বাংলাদেশের পাঠক-সাধারণ এই কার্য্যে আনুকূল্য করিয়া বাংলাসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন একান্তমনে ইহাই কামনা করি।"

এ কাজে বাইরের সাহাযা পাওয়া যায় নি। বহু অসুবিধা সত্ত্বেও হরিচরণবাবু নিজের চেষ্টায় খণ্ড খণ্ড ভাবে বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। পরে সম্পূর্ণ হলে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সাহিত্য পরিষৎ এ অভিধান ছাপতে সাহস পায় নি।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নিষ্ঠাবান কর্মী বাংলা দেশে সত্যই দুর্লভ। এতদিনব্যাপী এমন জটিল এবং মানসিক পরিশ্রমের কাজ সম্পূর্ণ একা শেষ করবার মতো মনের জোর বিস্ময়কর। মূলে সংস্কৃত ভাষাকে ভালবাসতেন বলে এ কাজে তাঁর আত্মবিশ্বাস এসে থাকবে। আর-একদিকে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতার দায়িত্ব। তিনি নানা আকর থেকে শব্দ সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন সাহস করে। এ কাজে শুধু শব্দ সংগ্রহই তো এক বিরাট পরিশ্রমের কাজ। তারপর তার মূলগত অর্থ, পরিবর্তিত অর্থ, ব্যাবহারিক অর্থ ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি সংগ্রহ আরও বেশি পরিশ্রমের কাজ। আর শুধু তাই নয়, এ সম্বন্ধে পৃথক বোধ বা চেতনাও থাকা চাই, নইলে শুধু সংগ্রহের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ অভিধান গড়ে তোলা যায় না। অভিধানবোধ বা অভিধান-চেতনার অভাবে অনেক অভিধানই সম্পূর্ণ নিভরযোগ্য হয়ে ওঠে নি। আমার নিজের কাছে তার দৃষ্টান্ত আছে তাই জোরের সঙ্গে এ কথা বলতে পারছি।

কিন্তু এ সব কৃতিত্ব স্বীকার করেও হরিচরণবাবু সম্পর্কে এই কথাটাই মনের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে যে তাঁর মানসিক গঠন সাধারণ বাঙলী থেকে কিছু



শব্দকোষ রচনা-রত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সৌজন্যে

স্বতন্ত্র। এ সম্পর্কে আমার মনে একটি ধারণা বহু পূর্ব থেকে জন্মেছে। এর জন্য দায়ী আমার ইণ্টারমীডিয়েট ক্লাসের সংস্কৃত শিক্ষক ভাষা-উন্মাদ হেমচন্দ্র রায় (পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, ১৯১৫-১৬)। তিনি ক্লাসে 'পাণিনিসারঃ' নামক একখানি ব্যাকরণ পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে খুব জোরের সঙ্গে বলতেন, দু'একজন পণ্ডিত ভিন্ন বাংলা দেশে কেউ পাণিনি জানেন না। কারণ এ ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে অন্তত দশ বছরের কঠিন পরিশ্রম চাই ; কোনো বাঙালীর দ্বারা তা সাধ্য নয়। যাঁরা আয়ত্ত করেছেন তাঁরা সবাই ভিন্ন ধাতুতে গড়া। হেমচন্দ্র রায় দশ বছরের পরিশ্রম-কৃতিত্বও বাঙালী পণ্ডিতদের সম্পর্কে স্বীকার করতে রাজি হন নি, অথচ হরিচরণের বিশ বছরের পরিশ্রম দশ বছরকে আরো দশ বছর ছাড়িয়ে গিয়েছে। এবং তার পরেও সংশোধন ও মুদ্রণে আরো কুড়ি বছর! এসব কথা ভাবতে গিয়েই তাঁকে সাধারণ বাঙালী গবেষকদের চেয়ে অনেক বড় এবং স্বতন্ত্র মনে হয়েছে। তাঁর কৃতিই তার একমাত্র সাক্ষী।

হরিচরণের চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তাঁর নম্রতা। এর আভাস দিয়েছি আগে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে বৃত্তি প্রাপ্তির উল্লেখ করেছি, কিন্তু হরিচরণের মনে তার প্রতিক্রিয়া এবং কৃতজ্ঞতা যে কি পরিমাণ জেগে উঠেছিল, তাঁর চিত্তকে কি পরিমাণ উদ্বেল করে তুলেছিল, সে সংবাদ তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—

> "আমি দেখা করিতে আসিয়া তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] নিকটে বৃত্তির ব্যবস্থার কথা শুনিলাম। আমি সর্বপ্রকারেই নগণ্য, আমার জন্যই কবি ভিক্ষুবেশে অর্থসংগ্রহ অর্থপ্রার্থনা করিয়াছেন, এই চিন্তা করিতে করিতে আমি তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্তব্যকর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-নিবেদনের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বাষ্পকলুষকণ্ঠে ভাষা ফুটিল না—কেবল নির্বাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম—দরবিগলিত অশ্রুধারা কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিল, নত হইয়া কবির পদরজ মস্তকে ধারণ করিলাম......।"

আত্মপরিচয়ের শেষে হরিচরণ বলছেন,—

> "আমার বিশেষ দুঃখের বিষয় যে, যাঁহার প্রদত্ত বৃত্তি পাথেয়রূপে মাসে মাসে আমাকে নব নব উৎসাহ দিয়া আমার কঠোর সুদীর্ঘ কর্ম-পথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য দিয়াছিল, সেই দানবীর মহাত্মা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র পরলোকগত, তাঁহার অভীষ্ট অভিধান মুদ্রিত আকারে তাঁহাকে

সমর্পণ করিবার সৌভাগ্যের দিন আমার জীবনে আসিল না।...... দ্বিতীয়তঃ যাঁহার সহিত পরিচয়ে আমি নানা প্রকারে জ্ঞান লাভ করিয়াছি —যাঁহার বিদ্যোৎসাহিতায় উৎসাহিত হইয়া এই অভিধান সঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম—যাঁহার সংসর্গগুণে আমার মানসিক মালিন্য অপনীত ও নবজন্মলাভ হইয়াছে, সেই পূজ্যপাদ পিতৃবৎ ভক্তিভাজন কবিগুরুর করকমলে মুদ্রিত অভিধান সম্পূর্ণ আকারে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়।"

এসব স্মৃতিরকথার প্রত্যেকটি ছত্রে হরিচরণের এমন একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ বিনয়পূর্ণ নম্র ভাব ফুটে উঠেছে যার ভিতর দিয়ে মানুষটিকে স্পষ্ট চেনা যায়। নিজের কৃতিত্বের উপর প্রধান জোর না দিয়ে তিনি তাঁর সুহৃদ্‌দের প্রতিই বেশি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

আমার ব্যক্তিগত অতি সামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি যুগান্তর 'সাময়িকী' বিভাগে তাঁর কয়েকটি রচনা ছেপেছিলাম। সে রচনার দু-একটি দৈনিক পত্রের পাঠক-সাধারণের পক্ষে সমান আদরণীয় না হওয়া সত্ত্বেও ছেপেছিলাম। কয়েকটি প্রবন্ধ ঋগ্বেদমূলক, সায়ন ভাষ্যমূলক, ও বৃহদারণ্যমূলক আমার কাছে জমা ছিল। শান্তিনিকেতন থেকে ২৯।৮।৫৬ তারিখে হরিচরণ এ বিষয়ে আমার কাছে লিখছেন,

> "নমস্কারপূর্বক সবিনয় নিবেদন, গোস্বামী মহাশয়,......পূর্ব পত্রে আমার লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়ে আপনার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলাম .....উত্তর পাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আশা করি আপনি...ভাল আছেন। আপনার শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম হইয়াছে বোধ হয়। সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রার্থনীয়।
>
> ইতি বিনীত শ্রীহরিচরণ শর্মা।"

এ চিঠির বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলবার নেই। আমার বক্তব্য এ চিঠির সম্বোধন ও নিজের নাম স্বাক্ষরের পূর্বে "বিনীত" শব্দের ব্যবহার। এও সাধারণ সৌজন্যমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু আমি আমার চিঠিতে তিনি যে আমার শ্রদ্ধেয় এবং প্রণম্য এ কথা জানিয়েছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরহঙ্কার নম্রতা তাঁর ঘোচে নি।—এই তাঁর পরিচয়।

২২-৬-৬৭

———

প্রমথ চৌধুরী

১৮৬৮-১৯৪৬

আমি তখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় আমার এক বন্ধুর কাছে আমি সবুজপত্র প্রথম দেখি। এক বছরের বাঁধানো সবুজপত্র, কোন্ বছরের এখন আর মনে পড়ে না। সম্ভবত প্রথম বছরের।

সবুজ রঙের মলাটে তালপাতার ছবি, পত্রিকায় একটিও বিজ্ঞাপন নেই, পরিষ্কার ছাপা, আগাগোড়া একটা অভিনবত্বের ছাপ। আমি ১৯১৮ সনের কথা বলছি, তখন যে সব কাগজ আমার কাছে পরিচিত ছিল, তা থেকে এ কাগজ স্বতন্ত্র। আরও পুরানো যুগের মাসিকপত্র, নতুন যুগের বড় বড় মাসিকের চাপে মন থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, তখন মন জুড়ে আছে।

আমি স্কুলজীবন থেকেই নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পড়তে ভালবাসতাম। গল্পে উপন্যাসে ঝোঁক ছিল না। প্রবন্ধ—বিশেষ করে সহজ ভাষায় লেখা দর্শন বিজ্ঞান বা সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধের দিকে আমার আকর্ষণ ছিল সহজ, তাই সবুজপত্রের মধ্যে আমার মনকে তৃপ্ত করার মতো অনেক কিছুই পেলাম। আমার বয়স তখন উনিশ কুড়ি।

সম্পাদক, প্রমথ চৌধুরী। তাঁর সম্পর্কে এইটুকু মাত্র জানা ছিল যে, তিনি পাবনা জেলার হরিপুরের জমিদার বংশের। এবং তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। তাঁর স্ত্রী ইন্দিরা দেবী, এবং সেই ইন্দিরা দেবীকেই ছিন্নপত্রের অধিকাংশ পত্র লেখা। এই সময় কলকাতায় আশুতোষ চৌধুরীকে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম নানা স্থানে সভাপতিরূপে। এঁরা, ভাইয়েরা, সবাই এ চৌধুরী, কে চৌধুরী, পি চৌধুরী, জে চৌধুরী—নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। পি চৌধুরীকে তখনও দেখি নি, কিন্তু দেখার ইচ্ছা ছিল খুবই প্রবল।

এই ইচ্ছা আরো হয়েছিল তাঁর 'ফরমায়েসি গল্প' নামক গল্পটি পড়ে। যে কোনো গল্প আমি পড়তে পারতাম না। এক বন্ধুর অনুরোধে পড়েছিলাম এটি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, এক নতুন বিস্ময়। প্লট যে এমন চমকপ্রদ হয় তা আগে জানা ছিল না। এ গল্প এখনও সমান ভাল লাগে,

এবং যারা পড়ে নি, তাদের পড়তে বলি। বর্তমানের মাল্‌টি-স্টেজ রকেটের তুলনা মনে আসে।

কৃত্রিম উপগ্রহ যে রকেট-বাহনে চড়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছয়, সেই রকেট একটি অখণ্ড বস্তু নয়। তার একাধিক ভাগ আছে, এবং প্রত্যেকটি ভাগ পৃথক। প্রথম অন্তর্দাহের ধাক্কায় রকেট নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছলে দ্বিতীয় অংশে প্রজ্বলন ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তার ধাক্কায় প্রথম অংশটি খুলে বেরিয়ে যায়। তখন নতুন শক্তিতে আরও কিছুদূর গেলে আবার ঐ ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এইভাবে এক একটি ধাক্কায় এক এক অংশ বিচ্ছিন্ন হয় এবং রকেট নতুন শক্তি লাভ করে। সর্বশেষ বিচ্ছিন্ন হয় শেষ অংশটি, এবং তখন কৃত্রিম উপগ্রহটি এই সব খণ্ড-রকেটের উপগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজ কক্ষ পথে চলতে থাকে।

ফরমায়েসি গল্পটিও ঠিক তাই। এর কাহিনী প্রকৃত মালটি-স্টেজ রকেটে চড়ে এগিয়েছে। পথে বহু ধাক্কায় নতুন শক্তি লাভ করতে করতে যাওয়া। প্রতি পর্যায়ে এক একটি অপ্রত্যাশিত এবং চমকে-দেওয়া ধাক্কা। এ গল্প পড়ে তখন আমি বেশ উত্তেজিত। এখনও এর মনোহারিত্বকে আর কেউ ছাড়িয়েছেন বলে জানি না।

প্রমথ চৌধুরীকে প্রথম দেখলাম ইউনিভারসিটি ইনসটিট্যুটের একটি সভায় সভাপতিরূপে। দিলীপকুমার রায় গান সম্পর্কে কিছু বক্তৃতা দেবেন ও তার সঙ্গে গান গেয়ে তার ব্যাখ্যা করবেন। ইনসটিট্যুটে লোকারণ্য। প্রমথ চৌধুরী পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতি সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এখন ইনসটিট্যুটে তস্য পুত্রের সঙ্গীত সভাতে এসেছেন সভাপতিত্ব করতে। একটি শোনা ছিল, অন্যটি চোখে দেখলাম।

উপস্থিত শ্রোতাদের দাবি—দিলীপকুমারের কোনো কথা শুনতে তারা রাজি নয়, শুধু গান। গানের পর গান গাইবেন, আর কিছু না। কিন্তু যত দূর মনে পড়ে, শুধু গান গাওয়ার জন্য সভা আহূত হয়নি। যাই হোক শ্রোতৃকুল যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তখন প্রমথ চৌধুরী এক অভিনব উপায়ে সবাইকে থামিয়ে দিলেন। সবাই 'গান! গান!' করে চেঁচাচ্ছে, এমন সময় সেই দীর্ঘনাসা, ঋজু এবং ক্ষীণদেহ, প্রশস্ত-ললাট প্রমথ চৌধুরী একা দাঁড়িয়ে উঠে ডাইসের সামনের দিকে দু-এক পা এগিয়ে এসে জনতার একধার থেকে আর এক ধারে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। শ্রোতারা তাঁকে এ অবস্থায় হঠাৎ দেখে চুপ করে গেল, ভাবল কি বলে শুনিই না।

একটা কিছু মজা হবে নিশ্চয়। তারা প্রমথ চৌধুরী কেমন মানুষ, কি তাঁর পরিচয়, অনেকেই জানে না, শুধু একটা দৃশ্য বদলের বৈচিত্র্যে উৎকর্ণ হল সবাই।

প্রমথ চৌধুরী বলতে আরম্ভ করলেন, দেখুন আমার একটা বক্তব্য আছে। আমার বিশ্বাস, আপনাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা বিবাহিত। অতএব ভাল লাগে না, এমন অনেক কিছু সহ্য করার অভ্যাস তাঁদের আছে। এই সভাতেও বাড়ির কথা মনে করে যদি ভাল না লাগা জিনিস একটুক্ষণ সহ্য করেন—

প্রথম বাক্যটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সবাই এমন হাসতে আরম্ভ করল যে, শেষটুকু আর শোনা হল না, শোনার দরকারও হল না, কারণ এর পর আর কথা নেই, সবাই চুপ। যতক্ষণ প্রোগ্রাম চলল ততক্ষণ চুপ। যিনি কথাগুলি বললেন, তিনি বলবার সময় অথবা আগে বা পরে একটুও হাসেন নি, এবং তাঁর গাম্ভীর্যই কথাগুলিকে আরও জোরালো করে তুলেছিল।

তখনকার দিনের শ্রোতাদের মধ্যে অধৈর্য এবং রসবোধ এক সঙ্গে দুই-ই বেশ প্রকট দেখা গেল। সভায় কথারও যে একটা দাম আছে এবং এ জাতীয় গানের প্রোগ্রামের সঙ্গে কথা মিলিয়ে তবে তার সার্থকতা, এ বোধ তখন অধিকাংশের ছিল না। ভাবছিলাম, রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয় বক্তৃতায় শ্রোতাদের মধ্যে 'গান! গান!' দাবি উঠলে কি ভয়ঙ্করই না হত ব্যাপারটা। কিন্তু পথ-চলতিশ্রোতা মজা দেখার জন্য সেদিন সেখানে কেউ উপস্থিত ছিল না। কথা বা কোনো উপস্থিত ব্যাখ্যাটাকে যারা ফাঁকি মনে করে, তারা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের বক্তৃতা এড়িয়ে চলত। প্রমথ চৌধুরী সেদিন যে অধীর অবুঝ শ্রোতাদের থামিয়েছিলেন, তা কোনো যুক্তির সাহায্যে নয়, কৌতুকের সাহায্যে। কিংবা এটি কৌতুকের আবরণে অতি মারাত্মক যুক্তি। দুঃখের বিষয় তারিখটি আমি কোনো মতেই মনে আনতে পারছি না, নিশ্চয় কেউ না কেউ বলতে পারবেন। তারিখ মনে নেই, কিন্তু সেই কৌতুকটি আমার এমন মনে ধরেছিল যে, তা আজও ভুলতে পারি নি। তাঁর সঙ্গে এর অনেক দিন পরে যখন একটা সম্পর্ক স্থাপিত হল (১৯৩৯) তখন এক সময় এ কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁর ওষ্ঠাধর কৌতুকে কিছু কেঁপেছিল, মনে আছে।

ইনস্টিটিউটের পর আর কোথায় তাঁকে দেখেছি কিছু মনে পড়ে না। স্টার থিয়েটারে যখন গৃহপ্রবেশ অভিনীত হয় (১৯২৫? ২৬?) সে সময় আমি একাধিক বার সে নাটক দেখেছি। সেই উপলক্ষে একদিন হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেদিন আরও অনেকের সঙ্গে এসেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। এর পর ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যেদিন বিচিত্রা গৃহে তাঁর গল্প কাব্য পড়ে শোনাচ্ছিলেন, সেদিন তাঁকেও সে সভায় শ্রোতারূপে দেখেছি।

এ জাতীয় দেখা শুধু শ্রদ্ধাভাজন গুণীজনকে দেখার পুণ্য বলে মনে হয়েছে। তা ভিন্ন এ রকম দূরকালের ব্যবধানে একটু একটু দেখার অন্য মূল্যও আছে। এতে আনন্দ যেন আরো বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আমি লক্ষ্য করেছি, যাঁদের প্রতি আমার আকর্ষণ বা কৌতূহল বহু পূর্ব থেকে আমার মনকে অধিকার করেছে, ঘটনাচক্রে একদিন হঠাৎ দেখতে পাই তাঁদের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছি। আমার জীবনে এমন অনেক ঘটেছে, সবারই সম্ভবত ঘটে। দেখার আগে নানা কারণে মনের মধ্যে একটা গূঢ় আকর্ষণ জাগে, দুর্লভ মনে হয়, অথচ শেষ পর্যন্ত কি করে যে তাঁদের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে এটি একটি রহস্য। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু এবং আরো অনেকের সম্পর্কেই আমার এইভাবে সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য ঘটেছে।

প্রমথ চৌধুরীর লেখার সঙ্গে, তাঁর মেজাজের সঙ্গে, আগে পরিচয় ঘটল, তাঁর লেখায় অভিনবত্বের স্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হলাম, তিনি ছিলেন আমার কাছে দূরের মানুষ। অথচ একেবারে মুখোমুখি এসে পড়লাম।

হিমালয় হাউস, ১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, অলকা নামক মাসিক পত্রের অফিস। এ কাগজের পরিচালক সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সরকার। এই মাসিকের প্রথম বর্ষের দশম সংখ্যার (আষাঢ়) মলাটে ও শেষ পৃষ্ঠায় যুগ্ম-সম্পাদকরূপে প্রমথ চৌধুরী ও আমার নাম ছাপা হয়। আগের নয়টি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন সজনীকান্ত দাস। এই প্রসঙ্গে একটি যোগাযোগ স্মরণ করি। শনিবারের চিঠির কথাটা আগে বলি। এর তৃতীয় বর্ষ থেকে সম্পাদক হন সজনীকান্ত দাস, তার আগে অনেক ইতিহাস আছে। ১৯৩২ (বাংলা ১৩৩৯) অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। তার পরের সংখ্যা থেকে সম্পাদক আমি। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর স্থান আমি অধিকার করি সাড়ে তিন বছর।

তারপর ১৯৩৮ সালে (কোন্ মাস থেকে মনে নেই) সজনীকান্ত দাস সচিত্র ভারতের সম্পাদনা ছাড়েন, এবং তাঁর স্থলে আমি সম্পাদক রূপে যোগ দিই। তারপর অলকায় ঐ একই ঘটনা। এই নিয়ে তিনবার। অলকার পরিচালনায় বিখ্যাত মহারাজ-সম্পাদক জগদিন্দ্রনাথ রায়ের পৌত্র শ্রীজয়ন্তনাথও ছিলেন। কিন্তু তবু কলকাতার অন্ধকারের সঙ্গে কাগজের ভবিষ্যৎও অন্ধকার হয়ে এলো।

অলকাকে উপলক্ষ করে প্রমথ চৌধুরীকে কাছে পেলাম, এইটুকু আমার জীবনের একটি বড় পাওনা। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করলেন, "এক ক্ল্যান তো ?"—অর্থাৎ আমিও তাঁর মতো বারেন্দ্র কি না। পরে শুনেছি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যরা এই রকম ক্ল্যান-প্রিয়। এবং উভয় বর্ণের লোকেরাই তীক্ষ্ণনাসা এবং সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন। এদিক থেকে বিচার করলে প্রমথ চৌধুরী খাঁটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আর আমি উপবারেন্দ্র। কিন্তু তাঁর ঐ প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় নি এর মূলে সত্যই বারেন্দ্রপ্রীতি আছে কি না। তবে এ বোধ যে তাঁর আছে তার প্রমাণ তাঁর রাজশাহিতে প্রদত্ত অভিভাষণে আছে। সেটি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "বারেন্দ্র সমাজের সহিত আমার নাড়ির যোগ আছে।" —বরেন্দ্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে এটি মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ১৯৪৬ সনে ছাপা তাঁর আত্মকথার ভূমিকায় তিনি বলছেন—"এক এক সময় ভাবি যে আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ছেলে, কোন্ পদ্মা পারে আমার দেশ, আর এই চুয়াত্তর বৎসর বয়সে কোথায় উত্তর-রাঢ়ে অর্ধেক মরুভূমির দেশে [শান্তি-নিকেতনে] এসে আশ্রয় নিয়েছি।"

কিন্তু এ চেতনা তাঁর উগ্র হোক না হোক, তাঁর ঐ প্রশ্নেই যেন আমাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠল। তা ছাড়া আমরা উভয়েই পাবনা জেলার মানুষ।

পাবনা জেলার পল্লীতে থাকতে বাল্যকালে বারেন্দ্র এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে রেশারেশি দলাদলি এবং শেষ পর্যন্ত মেশামেশি দেখেছি। কিন্তু তাতে একমাত্র মজা অনুভব করা ছাড়া আর কোনো সাম্প্রদায়িক চেতনা বা গোষ্ঠীচেতনা মনে জাগে নি। দীর্ঘকাল পরে প্রমথ চৌধুরীর প্রশ্ন শুনে মনের সুপ্ত বারেন্দ্রত্বকে উস্কে দিলাম খানিকটা, যদি এতেও আত্মীয়তার স্বাদটা পাওয়া যায়। কিন্তু এটা নিতান্তই বাইরের। তাঁর কথায় যে সহৃদয়তার স্বাদ পেলাম, সেইখানে আসল আত্মীয়তার চেতনা। বয়স, শিক্ষা, বিদ্যা,

অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠা—এর সব দিক থেকেই তিনি এত বড় ছিলেন যে সেই মুহূর্তে অন্তত পৃথিবী সমেত সূর্যের নয়টি গ্রহ এবং তাদের সাতাশটি উপগ্রহ, এবং আরো অন্তত গোটাদশেক নক্ষত্রের প্রভাবে এই শুভ যোগাযোগটি ঘটেছিল। কারণ তাঁর সঙ্গে একমাত্র সহৃদয়তার আত্মীয়তা ছাড়া অন্য কোনো আত্মীয়তার যোগসূত্র সম্ভব ছিল না। এবং তিনি যে-অভিজাত মেজাজের মানুষ এবং যে-অভিজাত সাহিত্যের জনক, তাতে তিনি যে স্বভাবতই দাম্ভিকতাশূন্য সহজ মানুষ হবেন, এটাই প্রত্যাশিত ছিল, এবং তাতে আমি হতাশ হই নি।

"উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।"

এই জ্ঞানগর্ভ নির্দেশিকাটি দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য সহজে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে আমার বরাবর। এটা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে, আমি এরই সাহায্যে উত্তম মধ্যম মাপি।

পর পর দুজনকেই দেখলাম, দুই বিখ্যাত অভিজাতকে। দুটি ক্ষেত্রেই দেখলাম উত্তম নিশ্চিন্ত মনে সহজভাবে সহানুভূতির সঙ্গে অধমের সঙ্গে মিশেছেন, কোথাও কোনো কৃত্রিমতার বাধা অনুভব করতে হয়নি। অভিজাত ভেবে দু-একটি ক্ষেত্রে ভুলও করেছি এবং মিশতে গিয়ে সে ভুল ভাঙতে দেরি হয় নি।

প্রমথ চৌধুরী আমার সঙ্গে যাকে বলে একাসনে বসা, তাই বসেছেন, আমাকে তাঁর পাশে বসতে নির্দেশ দিয়ে। কখনো তাঁর সামনাসামনি বসেছি তাঁর ১নং পাম প্লেসের বাড়িতে।

সবুজপত্রের সম্পাদনা কিভাবে করেছেন তার কিছু কিছু আমাকে বলেছেন। সেখানে সপ্তাহে একবার যেতাম তাঁর নির্দেশ নিতে। সেই সময়ে নানা কথা হত। বলেছিলেন সে যুগ চলে গেছে, সে উৎসাহের এবং পরিশ্রম করবার বয়স পার হয়ে গেছে। তখন সে কি উদ্দীপনা। অনেক ভাল লেখক তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে নতুন লেখকদের অনেককে তৈরি করে নিতে হয়েছে। বললেন, যাদের বক্তব্য আছে অথচ গুছিয়ে বলবার ভাষা নেই, সে সব লেখকের লেখা যত্ন করে সংশোধন করতেন, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেকেই নতুন করে লিখে দিতে হত। কারণ সবটা একটা বিশেষ স্তরের হওয়া খুবই দরকার মনে করা হয়েছে। বললেন, ম্যাগাজিন



প্রমথ চৌধুরী

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৩১

বলতে যা বোঝায় তা তো ছিল না, নানা সওদায় বোঝাই জাহাজ গড়ার ইচ্ছা ছিল না মোটেই।

চলতি ভাষা, মানে, মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার ভেদ ঘুচিয়ে দেবার দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে তাঁর, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুরো সমর্থন করেছেন। তিনি উৎসাহ এবং এমন সহযোগিতা না দিলে তাঁর একার ক্ষমতায় বেশিদূর এগোন যেত না।

এক সঙ্গে বা এক দিনে অনেক কথা বলতেন না। মাঝে মাঝে থেমে বলতেন। আমি তাঁর অনেকগুলো টুকরো কথা এক সঙ্গে গেঁথে দিলাম। অনেক কথাই তিনি নিজে থেকে বলেছেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করি নি।

নতুন লেখকদের উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং প্রমথ চৌধুরীর যত্ন, এ দুটি জিনিসই দুজনের চরিত্রকে আমার কাছে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশিত করেছে। অর্থাৎ পুনরায় সেই আভিজাত্যের খাঁটি চেহারা। আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্যই এই যে, সহজে নিচে নামে কিন্তু কখনো হীন হয় না।

কৃত্রিম আভিজাত্য আপস্টার্টের আভিজাত্য, ফরাসী ভাষায় যাদের বলে parvenu, তাদের। হঠাৎ টাকা পাওয়ার কৃত্রিম গর্ব। বনিয়াদি আভিজাত্য সহজ সরল এবং সহৃদয়।

জমিদার বংশের প্রমথ চৌধুরী, তদুপরি বিলিতি শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাঁরা সবাই Reformed Hindus, তা ভিন্ন তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ির জামাতা, এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন। বাংলাদেশে এর চেয়ে বড় আভিজাত্য কল্পনা করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও প্রমথ চৌধুরী একটা ঐতিহাসিক কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। সবুজপত্রের সম্পাদক রূপে তিনি যেমন নতুন লেখক গড়েছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিষ্ঠাবান লেখককে চলতি ভাষার ধর্মে স্থায়ীভাবে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন। এটি একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মজার ঘটনাও বটে। মজার ঘটনা আরো এক দিক থেকে, কারণ এটা সবারই জানা যে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী কবির প্রধান স্নেহের অংশীদার হয়েছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ করে যে সব চিঠি প্রথমে ছিন্নপত্র (এবং পরে ছিন্নপত্রাবলী)-রূপে প্রকাশ হয়েছে, সে সব চিঠি চলতি ভাষায় লেখা। তার আগে এমন সুন্দর চলতি ভাষায় কোনো লেখকের

কোনো রচনা ছাপার অক্ষরে বেরোয় নি। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমীয় ভাষার প্রবর্তক ছিলেন, তা ঐখানেই শেষ। আর কেউ সাহিত্য রচনায় (কথোপকথনের ভাষা ভিন্ন) এ ভাষা ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথও না। ছিন্ন পত্রের ভাষা ছাপা হওয়ার উদ্দেশ্যে লেখা নয়, পরে ছাপা হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে চলতি ভাষায় তিনি ইন্দিরা দেবীকে (অন্যদের কথা এখানে তুলছি না) চিঠি লিখলেন, এবং যে ভাষা নিজের সাহিত্য রচনায় ব্যবহার করলেন না; সেই চলতি ভাষায় লেখা চিঠির উদ্দিষ্টা ইন্দিরা দেবীকে প্রমথ চৌধুরী বিয়ে করে সেই রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে দীক্ষিত করলেন যে, সবুজপত্রের যুগের পরে তিনি সাধু ভাষা ব্যবহার প্রায় ছেড়েই দিলেন। জামাইয়ের হাতে এমনভাবে শ্বশুরের দীক্ষা গ্রহণ বাংলা সাহিত্যের বা ভাষার ইতিহাসে প্রথম এবং অদ্বিতীয়। এটি একজাতীয় প্রকৃতির পরিহাসও বটে—মানব প্রকৃতির।

এই জাতীয় আর এক পরিহাস জুটেছিল প্রথম চৌধুরীর নিজের অদৃষ্টে। সেটি তিনি বলেছেন তাঁর আত্মকথায়। আমি উদ্ধৃত করছি—

> "বোধ হয় ১৮৮৪ খৃঃ সরস্বতী পূজোর দিন, হঠাৎ গরম পড়ায় আমি হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন থেকে হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণের মাঠে এসে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমার বন্ধু নারায়ণ প্রসাদ শীল সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন যে, অ্যালবার্ট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি একটি বক্তৃতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর একটি বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। আর বললেন, 'চল না রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা অ্যালবার্ট হলে যাই।' আমি তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম না, কারণ আমি শ্রান্ত বোধ করছিলুম। নারায়ণ বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখে আসি চল। শুনেছি মেয়েটি না কি অতি সুন্দরী।' আমি উত্তর করলুম, 'পরের বাড়ীর খুকি দেখবার লোভ আমার নেই।' ফলে অ্যালবার্ট হলে না গিয়ে নারায়ণ আর আমি সেই গাছতলাতেই শুয়ে থাকলুম। পরে সেই মেয়েটিকেই আমি বিবাহ করি।"

এ ছবিটি প্রসঙ্গত মনে এলো ভাগ্যের পরিহাস স্মরণ করতে গিয়ে। কিন্তু বাংলা ভাষার রূপ ও রীতির ইতিহাস রচনায় প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকাটি অবশ্য স্মরণীয়। তিনি চলতি ভাষার প্রসারে একই সঙ্গে কর্তৃ ও করণ কারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, এটি কম কথা নয়। এবং তাঁর উদ্যোগ এবং

রবীন্দ্রনাথের সহযোগ—এই উভয়ের ক্রিয়া আজ অনেক দূরে ব্যাপ্ত। এবং এখনকার প্রায় সকল লেখকই তাঁদের সাহিত্যকর্মে চলতি ভাষা গ্রহণ করেছেন, এমন কি বাংলা খবরের কাগজও (যথা যুগান্তর, ১৯৬৫ থেকে) আগাগোড়া চলিত ভাষায় চলছে, এমন ঘটনা গত যুগে কল্পনারও অতীত ছিল।

প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমার যখন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘটল তখন তাঁর মুখোমুখি বসে এ বিস্ময় অনুভব করেছি। আরও লজ্জিত হয়েছি এ কথা ভেবে যে, তিনি আমাকে সব সময় সম্মানের চোখে দেখেছেন, স্নেহের চোখে দেখেছেন, অযোগ্যতা স্মরণ করে ছোট করে দেখেনি। আর সে জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার এই দূর উপলক্ষেও আমি আনন্দ অনুভব করছি।

সবুজপত্র প্রথম প্রকাশ হয়েছে ১৯১৪ সনে যখন আমি ম্যাটিকুলেশন ক্লাসে পড়ি, আর আজ তাঁর কথা তৃতীয়বার (প্রথমে স্মৃতিচিত্রণে দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় স্মৃতিতে) স্মরণ করছি ১৯৬৬ সনের গোড়ায়, সবুজপত্রের আবির্ভাবের ৫২ বছর পরে এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের ২৭ বছর পরে। দূর কালের বিস্মরণ নয়, আরও মধুর এবং সশ্রদ্ধ স্মরণ।

প্রথম যেদিন তাঁর বাড়িতে যাই, সেদিন তিনি 'বিবি'কে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইন্দিরা দেবীকে তিনি বিবি সম্বোধন করতেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া—যেন আমি একজন আত্মীয়। প্রমথ চৌধুরীই পরিচয়ের অঙ্গ হিসাবে তাঁকে বললেন, পরিমল শান্তিনিকেতনে ছিল। এর বাবা রবীন্দ্রনাথের পরিচিত ছিলেন।

এই দুটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি যেন আমার দিকেই টেনে বললেন। যেন পরিচিত লোককেই বাড়িতে ডেকে এনেছি, এই রকম ভাব।

আমি ইন্দিরা দেবীকে প্রণাম করলাম, তিনি বললেন, বস। আমি সেই প্রথম দেখলাম তাঁকে, সেই বিখ্যাত মহিলাকে। ছিন্নপত্রের কথা স্মরণ করে রোমাঞ্চিত হলাম। ইন্দিরা দেবী অল্প দু-একটি কথা বলেছিলেন, আমার মনে নেই। মনে হল, স্বভাবতই তিনি কম কথা বলেন। (কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক !) পরেও তাঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে, এবং প্রত্যেকবারেই কাজের কথা। একদিন তাঁর ও প্রমথ চৌধুরীর ফোটোগ্রাফ তোলবার সময়, তাঁদের বাড়িতে একটি শিশু ছিল তাকেও নিয়ে এসেছিলেন ক্যামেরার সামনে। শিশুটির পরিচয় এখন সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছি, কিন্তু তার নেগেটিভখানা এখনও দেখছি, আছে। (এই সময়ে প্রথম চৌধুরীর যে কয়েক-খানি ছবি তুলেছিলাম, তার একখানি

বিশ্বভারতী পত্রিকায়, ও পরে প্রথম চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহে, (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৫৪) ছাপা হয়েছে অন্য নামে! ইন্দিরা দেবীর ছবিখানা ছিন্নপত্রাবলীতে মুদ্রিত তাঁর কৈশোরের ফোটোগ্রাফ-খানার সঙ্গে পাশাপাশি মিলিয়ে দেখছিলাম, দুখানাই প্রায় একই দিকে মুখ ফেরানো, কিন্তু কোথাও এতটুকু মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সের ছবির সঙ্গে যেমন তাঁর শেষ বয়সের ছবির কোনো মিল পাওয়া যায় না, এও তেমনি। ভাবুকদের পক্ষে জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করবার এটি একটি সুযোগ এবং উৎকৃষ্ট উপলক্ষ।

একদিন প্রথম চৌধুরীর সঙ্গে পাম প্লেস থেকে ফীটনে চলতে চলতে তিনি হঠাৎ চেস্টারটন সম্পর্কে কথা তুললেন। এর আগে একদিন 'পান্' ও 'প্যারাডক্স' সম্পর্কে কথা হয়েছিল। তিনি একদিন বুদ্ধিমত্ত লেখা সম্পর্কে বলেছিলেন, লেখায় বুদ্ধির ছাপ পড়লে সে লেখা সাধারণ পাঠক পড়তে চায় না। আমি বলেছিলাম, যে জন্য সবুজপত্রের পাঠক কম ছিল। তিনি বলেছিলেন, সবচেয়ে মুশকিল হয় যখন পাঠক ভুল বোঝে। বলেছিলেন, না বুঝে চুপ করে যাওয়া ভাল, কিন্তু ভুল বুঝে তেড়ে আসা বিপজ্জনক। আমি বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন, ঐ ভুল বোঝার জন্যই। কিন্তু আপনার লেখায় তো ভুল বোঝার অবসর কম, এমন সরল এবং সহজ লেখা। তিনি বলেছিলেন, তবু তাঁকেও অনেকে আক্রমণ করেছে, দুর্বোধ্য বলে নয়, তাঁর কথা চট করে বুঝতে পেরেছে বলে। "অর্থাৎ", আমি বললাম "আপনার নতুন মতবাদের জন্য? কিন্তু সেটাও তো একরকম ভুল বোঝা? আর আপনিই তো একবার বলেছিলেন, মানুষের বোঝবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে কিন্তু তার না বোঝবার ক্ষমতা অসীম।"

শুনে বোধ হয় খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন ফীটনের মধ্যে চেস্টারটন সম্পর্কে যেটুকু কথা হয়েছিল তা আমি এইখানে স্মৃতিচিত্রণ থেকে উদ্ধৃত করছি।

> "প্রমথ চৌধুরী বলতে লাগলেন চেস্টারটন পড়তে গিয়ে দেখি পড়াও শেষ হল, পড়ার আনন্দও শেষ হল। কিছুই মনে রইল না। প্যারাডক্সের আতিশয্যে পড়া এগোতে চায় না। লক্ষ্যে পৌঁছতে দেরি হয়। অবশ্য তাঁর সব লেখা এ রকম নয়।"

আমার চেস্টারটন অল্প পড়া ছিল, The Napoleon of Notting Hill,

Tremendous Trifles, The Everlasting Man, What I saw in America, The Man who was Thursday ও Father Brown পর্যায়ের গোটাকত গল্প।

কয়েকটিতে প্যারাডক্স এবং উইটের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, তাঁর অনেক রচনাতেই রসিকতা আর উল্টোপাল্টা কথা, সব এক সঙ্গে ঠাসা। কিন্তু 'দি ম্যান হু ওঅজ থার্সডে'র মতো অদ্ভুত প্লটের বই আমি আগে আর পড়ি নি।

যাই হোক, প্রথম চৌধুরীর কথায় আমাকে চুপ করে যেতে হয়েছিল, কারণ তিনি ঠিক কোন্ বই পড়ে বিরক্ত হয়েছেন তা আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল। কারণ আমার নিজের যে কখানা চেস্টারটন আছে, তার বাইরে কিছু পড়ি নি, এবং যেগুলোর নাম করেছি তার মধ্যে যে কখানা তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাভঙ্গিতে লেখা প্রবন্ধের বই, সেগুলো একটানা বেশিক্ষণ পড়া যায় না। তবে বুদ্ধি করে সেদিন নিজেকে তাঁর কাছে এক্সপোজ করি নি। এ নিয়ে আর কিছু চিন্তাও করি নি। আমার যে চেস্টারটনের বই বেশি নেই তার কারণ যেগুলোর নাম করেছি সেগুলো ছাড়া সেকেণ্ড হ্যাণ্ড দোকানে অন্যগুলো সংগ্রহ করতে পারি নি। সবই চার আনা থেকে ছয় আনার মধ্যে কেনা, সেযুগে।

আগেই বলেছি গল্প উপন্যাস পড়ার দিকে আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল না, তাই চার-ইয়ারি কথা পড়েছি অনেক পরে, এবং পড়ে বুঝতে পেরেছি এতদিন একটি অতি সুন্দর জিনিস থেকে বঞ্চিত ছিলাম। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় প্রেমের গল্প আগে পড়ি নি, পরেও না। প্রথম চৌধুরী সম্পর্কে একটা নতুন আবিষ্কারের মতো মনে হয়েছিল, ঠিক যেমন ফরমায়েসি গল্প পড়ে মনে হয়েছিল।

কিন্তু ছাত্রজীবনে 'যৌবনে দাও রাজটীকা' পড়ে মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সে কথাটা আজ বেশি করে মনে পড়ে। এর একটি প্যারাগ্রাফ আমি তখন বার বার পড়েছি, যাতে আছে যৌবনকে আমরা মস্ত বড় একটা ফাঁড়া বলে মনে করি, যেন কোনোমতে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। সে জন্য আমরা সবাই এক লাফে বাল্যকাল থেকে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হই।

এই কথাটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল ভাবতে যে, এমন সত্য কথাটা এমন সুন্দরভাবে আর কেউ বলেন নি। তখন 'মোহমুদ্গর'

-এর নীতি নিয়ে অনেক ঠাট্টা করেছি বন্ধুদের কাছে। বলেছি সবই অনিত্য কেউ কারো আত্মীয় নয়, অতএব সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ব্রহ্মপদে আশ্রয় নাও, কিন্তু তার সঙ্গে মাত্র দুচারটে জিনিস রাখতে পার, বাড়ি গাড়ি আর ব্যাঙ্কে টাকা। স্ত্রীপুত্র তোমার কেউ নয়।

কেন জানি না যৌবনে দাও রাজটীকার পূর্বোক্ত প্যারাগ্রাফ পড়ে রবীন্দ্র-নাথেব জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত তাঁর এক বালককালের অভিভাবকের চরিত্র মনে পড়ত। তার নাম ছিল ঈশ্বর, সে পুকুরে স্নানের সময় দুহাতে উপরের অপবিত্র জল ঠেলে দিতে দিতে চট করে জলের পবিত্র গভীরতা থেকে ঘটি ডুবিয়ে জল তুলে আনত। এর অর্থ, পাছে উপরের কোনো ছোঁয়াচ লাগে। আমরাও তেমনি যেন যৌবন নামক অশুচিতার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এক ডুবে পবিত্র বার্ধক্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হই।

প্রমথ চৌধুরীর সংস্পর্শে আসবাব আগে তাঁর লেখার প্রভাব আমাব মনের উপর কিভাবে পড়েছিল তার একটুখানি আভাস দেওয়া গেল।

১৯৩৯-এর জুন কিংবা জুলাই মাসে ১০ম সংখ্যা থেকে আমাদের অলকা মাসিকে যোগদান। এর দশম সংখ্যা—১৩৪৬ সালের আষাঢ় সংখ্যা। তিন মাসের বেশি থাকি নি। ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন জারমানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় খুব মারাত্মক কিছু ঘটে নি। জারমান-ফরাসী সীমান্তে জারমান ও ফরাসীরা নিজ নিজ ঘাঁটি আগলে বসে ছিল অনেকদিন। পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে জারমানি পোলাণ্ড আক্রমণ করেছিল এবং ঐ তারিখেই বিটেন ও ফ্রান্স সমরশক্তি চালনার আদেশ জারি করে।

প্রথম কিছুকাল এ যুদ্ধকে নকল যুদ্ধ বলা হত— নকল বা phoney war এই সময়েই ফণী ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর পরিচালনায় 'রূপ ও রীতি' নামক মাসিকপত্র ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। অফিসটি থোবর্ন লেনের মধ্যে প্রবেশ করেই বাঁ হাতে। রূপ ও রীতির সম্পাদক, প্রমথ চৌধুরী সেখানে আসেন নি কখনো। এই কাগজে বাংলা ১৩৪৮ (ইং ১৯৪১) সালের কার্তিক সংখ্যা থেকে তিনি আত্মকথা লিখতে আরম্ভ করেন, তার তিন মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথের, মৃত্যু ঘটেছে। রূপ ও রীতির ভাদ্র সংখ্যা প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র সংখ্যা রূপে, শ্রাবণে তিনি মারা যান। এই সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরী চারটি পৃথক প্রবন্ধ লেখেন, সবগুলোই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। তার মধ্যে একটাতে রবীন্দ্রনাথের এক কলেরা রোগীর সেবার যে ছবিটি আছে তা পড়ে

তার পাশাপাশি 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' বইতে বর্ণিত মনুষ্য নামক রচনার আর একটি কলেরা রোগীর ছবি জেগে উঠেছিল মনে।

রূপ ও রীতিতে আমিও কয়েকবার লিখেছি, কিন্তু যুদ্ধ যখন জোর বেধে উঠল তখন কিছুদিনের মধ্যেই আমরা আবার কে কোথায় গিয়ে পড়লাম, অন্তত ঐ কাগজের অফিসে আমার আর যাওয়া হয় নি, প্রমথ চৌধুরীও ১৯৪৩-এর শ্রাবণ পর্যন্ত আত্মকথা লিখে বন্ধ করে দেন। তার কারণ তিনি অতঃপর বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং সেই কাগজে আত্মকথা লিখতে আরম্ভ করেন। এই সময় থেকে তিনি ও ইন্দিরা দেবী শান্তিনিকেতনে বাস করতে থাকেন, রূপ ও রীতি বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতায় জাপানী আক্রমণ তখন আসন্ন।

১৯৪৫ সালের পয়লা মার্চ আমি যুগান্তরের রবিবারে প্রকাশিত সাহিত্য বিভাগের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি, এবং তখনই প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করি। সে সময় তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। আমি চিঠি লিখি ১২ই মার্চ, তার উত্তর পাই ১৮ দিন পরে। উত্তরটা প্রমথ চৌধুরীর নামে, কিন্তু হাতের লেখা ইন্দিরা দেবীর। চিঠিখানা আমার দ্বিতীয় স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়েছে, পুনরায় উদ্ধৃত করি—

ওঁ

লাল বাঙ্গলা, ১ নং পাম প্লেস

বালিগঞ্জ, ৩০।৩।৪৫

কল্যাণবরেষু

শান্তিনিকেতনে তোমার গত ১২ইর চিঠি পাবার পর ১৫ই আমরা এখানে চলে আসি।

তোমার অনুরোধ রক্ষার জন্য সেই অবধি পুরনো অপ্রকাশিত লেখা ঘাঁটতে শুরু করেছি। এবং এ সময়ে ছাপানো যেতে পারে এমন ২।৪টি আলাদা করে রেখেছি।

তুমি যদি অবসর মত এখানে কোনদিন (উপরের ঠিকানায়) বেলা ৯-১১টার মধ্যে এস, তা হলে নিজেই ঐ লেখা-গুলির মধ্যে একটি নিয়ে যেতে পার। আর যদি সুবিধা না হয় ত জানিও, দেখেশুনে একটা পাঠিয়ে দেব। আমার স্ত্রীও খোঁজ করে দেখবেন। ইতি—

(for) শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমাকে লেখা দেবার জন্য এই যে আগ্রহ এ আমি তাঁর আশীর্বাদ ভিন্ন

আর কিছু মনে করতে পারি নি। আমি না যেতে পারলে পাঠিয়ে দেবেন, এতটা সৌজন্য তাঁর কাছে আমি পেয়েছি। আমি চিঠি পেয়ে পরদিনই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবারে দেখি তিনি আরও দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং কথা জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করতে পারেন না। তবু আমি যেন যত্ন করে প্রুফ দেখে দিই এমন অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম আপনার লেখা কম্পোজিটর মহলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে, সে জন্য আমি প্রত্যেকটি লেখা নিজে নকল করে প্রেসে পাঠাব। করেওছিলাম তাই, এবং তাতে ছাপা নির্ভুল হয়েছিল।

আমি যুগান্তর সাময়িকীতে প্রমথ চৌধুরীর যে লেখাগুলো ছাপিয়েছিলাম, তারিখ সহ তার তালিকা—

(১) টোক—২২-৪-৪৫

(২) চিঠি—৬-৫-৪৫

(৩) অলঙ্কার শাস্ত্র (১) ২২-৭-৪৫

(৪) অলঙ্কার শাস্ত্র (২) ২৯-৭-৪৫

এর প্রথমটি, অর্থাৎ 'টোক' শব্দটি সম্ভবত পরিচিত 'টোকা' থেকে করা। প্রমথ চৌধুরীর মতে নোট রাখার বদলে বাংলা টোক রাখা বেশ চলতে পারে। তাঁর এই লেখাটি তাঁর রচনা সংগ্রহে নেই, তাই আমি তার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত করি—

"ইংরাজি notes শব্দের বংলায় কোন আভিধানিক প্রতিশব্দ আছে কি না জানিনে, তবে জমিদারি সেরেস্তায় আমরা যাকে "টোক" বলি, সে কথাটার ইংরাজি অনুবাদ করতে হলে note শব্দই আমাদের ব্যবহার করতে হয়, সুতরাং "নোট" শব্দ বাংলায় অনুবাদ করতে হলে "টোক" শব্দ ব্যবহার করা অসঙ্গত নয়। টোক শব্দের উৎপত্তি আমার কাছে অজ্ঞাত কিন্তু তার ধাতুটি আমাদের কারও কাছে অপরিচিত নয়। আমরা কথায় কথায় বলি টুকে নেয়। টোকা ধাতু থেকে টোক বিশেষ্যের উৎপত্তি হয়েছে, কি তার উল্টো সে কথা আমার পক্ষে বলা অসাধ্য এবং এ শব্দ যে কোন্ ভাষা থেকে আমরা আমদানী করেছি তাও আমার কাছে জানা নেই। তবে ওর ধ্বনি থেকে মনে হয় যে ওটি সংস্কৃত বংশের নয়।...

"আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের যে "টোক" রাখবার অভ্যাস নেই এ বিষয়ে আমার একটি জাপানী বন্ধু প্রথম চোখ ফুটিয়ে দেন।

আমরা যখন বই পড়ি, তখন যে তার টোক রাখিনে, এ ব্যাপার তাঁর কাছে বড়ই আশ্চর্য লাগে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন "তোমাদের স্মৃতি কি এত অগাধ যে একখানি বই পড়ে তার মনে রাখবার মত সব কথা তোমরা মনে রাখতে পারো এবং কোন কথাই তোমাদের লিখে নেবার দরকার নেই?" এ প্রশ্নের আমি কোন উত্তর দিই নি। কারণ সত্য কথা বলতে হলে আমায় বলতে হত যে, ব্যাপার ঠিক উল্টো। আমরা নোট লিখে এবং নোট পড়েই মানুষ হয়েছি, সুতরাং ও জিনিসে আমাদের অরুচি ধরে গিয়েছে। কিন্তু এ উত্তরেও তিনি সন্তুষ্ট হতেন না কেন না পরের লেখা নোট মুখস্থ করা যেমন অকর্তব্য নিজে নোট করা তেমনি কর্তব্য। আমরা যে নোট নিইনে, তার কারণ আমাদের পড়াশুনো ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার আমাদের কোনই অভিপ্রায় নেই, সুতরাং কিসের জন্য ও বাজে খাটুনি খাটা।"...

এই টোক নেওয়া কথাটা চালানো সম্ভব হলে বাংলা ভাষা অকারণ ঐ ইংরেজী নোট শব্দ থেকে মুক্ত হতে পারে, এ কথা প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম এই শব্দটা আপনি নিজে যদি খুব ব্যবহার করতেন তা হলে ভাল হত। মনে আছে, আর বলেছিলাম 'নোট' শব্দের দোষ নেই, কারণ এভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ ধীরে ধীরে বাংলায় এসে বাংলা হয়ে যাবেই, যদি ইংরেজী আর বাংলা আমরা শিশুকাল থেকে পাশাপাশি পড়ি। এই কারণেই অন্তত শব্দের দিক থেকে বাংলা আর ইংরেজী একাকার হয়ে যাচ্ছে এ তো বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। আমার তো মনে হয় তা করে লাভও নেই।

এর পর "চিঠি" নামে যে রচনাটি ছেপেছিলাম, সেখানা চুয়াডাঙা থেকে ১৮৯০ সনের ২৩শে মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা। তার আরম্ভ হচ্ছে "রবিকা, আজ সকালে আপনার লম্বা চিঠি পেয়ে খুব খুশি আছি।" এ চিঠি শান্তিনিকেতন থেকে ২১শে মে ১৮৯০ তারিখে রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তর কি না আমি জানি না। এবং এ সব কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, চিঠি-পত্র নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁরা এ সব ভাববেন।

প্রমথ চৌধুরীর কথা আজ ছাব্বিশ বছর পরে স্মরণ করতে গেলে তাঁর যে সব ছবি আমার মনে ভেসে ওঠে তার আভাসমাত্র দেওয়া গেল। তাঁর ভাষা-ভঙ্গির সরলতা যে তাঁর চরিত্রেরই প্রতিফলন এইটি আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে অনুমিত ছিল, এবং প্রত্যাশিত ছিল। ৩১-৩-৬৬

বিহারীলাল গোস্বামী

১৮৭১-১৯৩১

১৩৩৮ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯৩১) বিহারীলালের মৃত্যু সংবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্জিলিঙ থেকে ৫ই আষাঢ় আমাকে এই চিঠিখানি লেখেন—

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইলাম। একদা তিনি আমার সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার রচনানৈপুণ্যে আমি বিস্ময় বোধ করিয়াছি। সাধারণের কাছে তাঁহার লেখার যথেষ্ট প্রচার হয় নাই, তিনি জনতা হইতে দূরে ছিলেন — আশা করি তাঁহার কীর্ত্তি সাহিত্যক্ষেত্রে অগোচরে থাকিবে না, তোমাদের জন্য আমি সান্ত্বনা ও কল্যাণ কামনা করি। ইতি ৫ আষাঢ় ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে তিনি জনতা থেকে দূরে ছিলেন। নীরবে সাহিত্য সেবা করতে পারবেন বলেই সম্ভবত তিনি দূর পল্লীতে অবস্থিত একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে সমস্ত জীবন কাটিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই আকাঙ্ক্ষার কিছু আভাস পাওয়া যায় আগরতলা থেকে

প্রকাশিত "বঙ্গভাষা" নামক মাসিকের দ্বিতীয়ভাগ প্রথম সংখ্যায় (ত্রিপুরাব্দ ১৩১৩, বঙ্গাব্দ ১৩১০) প্রকাশিত 'বর্ষপ্রবেশ' নামক কবিতায়। তার অংশ-বিশেষ এই—

নববর্ষে এ কি গো সংশয়।
নাহি বাণী নাহি বার্তা
তবু মতি অতি আর্তা
এ কি ভুল এ বিপুল
বিশ্বে আজি কি রে,
আশার আশঙ্কা আসে ফিরে,
বর্ষে ভাসে ভরসার ভয়!
মহাশূন্য পারাবারে
দিগ্‌ভ্রান্ত একেবারে
পড়ে পিছে এত নীচে
ঘুরি সারা বেলা,
সঙ্গী নাই নিতান্ত একেলা
যেন অন্ধ পাখীর মতন।
গেছে তো এমনি আরো মাস,
সারাদিন হারাপথে
ফিরিয়াছি কোনমতে,
ছিল আশা বঙ্গভাষা
নিকুঞ্জ নিলয়ে
ফুলগন্ধ অলিগুঞ্জ লয়ে
কলকণ্ঠে গাহি বারো মাস।...

বিহারীলাল সম্পর্কে বাইরের দৃষ্টি থেকে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব নয়, তাঁর স্নেহের ছায়ায় বাস করেছি আশৈশব।

তিনি সদাশয় ছিলেন, নিরহঙ্কার ছিলেন, ক্রোধ বা উত্তেজনা বর্জ্জিত ছিলেন, কখনো কোনো কারণে ধৈর্যহারা হতে দেখি নি। তিনি খুব সহজ মানুষ ছিলেন, বিলাসবর্জ্জিত ছিলেন, এবং আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। আমরা দেখেছি বরাবর তিনি চীনেবাড়ির কালো ক্যাম্বিসের ফিতাহীন জুতো ব্যবহার করতেন। শীতকালেও তাঁকে গরম জামা পরতে দেখি নি। স্কুলে ব্যবহারের জন্য পৃথক পোষাক ছিল। তাঁতের মোটা চাদর ও শার্ট পরতেন। ম্যালেরিয়ার দেশে থেকেও কখনো জ্বরে ভোগেন নি, শীতেও কখনো সর্দি বা কাসি হতে দেখি নি।

খাওয়া পরার কোনো ভাবনা ছিল না তখন। তাই তাঁর জগৎ সাংসারিক জগৎ থেকে অনেকখানি মুক্ত থাকতে পেরেছিল। তিনি সমস্ত জীবন শিক্ষার জগৎকে শুধু কর্মক্ষেত্র নয়, তাঁর মনের একমাত্র পরিবেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি শিক্ষক হিসাবে আদর্শ ছিলেন বলা চলে। তাঁর শিক্ষণীয় বিষয় প্রধানত ইংরেজী হলেও তাঁর যে যে বিষয়ে আনন্দ ছিল, তা ছাত্রদের সবই শিখিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। স্কুলটি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন পোতাজিয়া নামক গ্রামে। এই গ্রামটি সাজাদপুর থানার অন্তর্গত।

সাজাদপুরকে রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত করেছেন সেখানে মাঝে মাঝে তাঁদের জমিদারীর কুঠিতে বাস করে। সেখানকার ঠিকানাবহনকারী অনেক চিঠিই ছাপা হয়েছে ছিন্নপত্রে। সেখানকার পোস্টমাস্টারকে নিয়েই 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি লেখা হয়েছিল।

এই অঞ্চলের প্রবাদ—"ছ মাস জলে কষ্ট এবং ছ মাস জলের কষ্ট।" জলে কষ্ট বর্ষণের মরশুম থেকে আরম্ভ হয়। নৌকা ছাড়া তখন পোতাজিয়া গ্রামের এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাওয়া যায় না। শীতকালে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যেতে এক পাহাড় থেকে নেমে আর এক পাহাড়ে ওঠার পরিশ্রম। মস্ত বড় গ্রাম। কয়েকটি ধনী পরিবারের বাস ছিল সেখানে। এমন একটি এতগুলি বাসোপযোগী উঁচু পল্লী এবং পল্লী-মধ্যবর্তী গভীরতা সম্বলিত গ্রাম ভৌগোলিক কোন্ জাতীয় ঘটনায় তৈরি হয়েছিল, তা আমার ধারণায় আসে না।

কিছুদিন আগে 'ছিন্নপত্রাবলী' (ছিন্নপত্রের পরবর্তী বৃহত্তর সংস্করণ) নামক বইতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা রঙীন চিত্র 'জলপথে' দেখে চমকে উঠেছিলাম, এ ছবি আমার মনে সেই পঞ্চাশ বছর আগের পরিচিত স্থানের স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছিল—মনে হচ্ছিল পোতাজিয়া হাইস্কুলের ধারে বোটটি বাঁধা আছে।

বিহারীলাল ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে পোতাজিয়া হাইস্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে আসেন। তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছে পাবনা জেলা স্কুলে (১৮৮৭-তে এনট্রান্স পাস করে বৃত্তি পেয়েছিলেন এবং জেলার মধ্যে ইংরেজীতে প্রথম হয়ে বনওয়ারীলাল স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন।) তারপর সিটি কলেজ থেকে বি-এ পাস করেন, এবং পৃথকভাবে ড্রয়িং-এর ট্রেনিং নেন।

গত ১৯৬০ (ভাদ্র ১৩৬৭) সনে "কথাসাহিত্য" নামক মাসিকে পোতাজিয়াবাসী আমার সহপাঠী কবি ও প্রবন্ধলেখক শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'কয়েকটি পুরনো কথা' নামক বহু তথ্য সম্বলিত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ থেকে আমি কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি এখানে। এই প্রবন্ধে বিহারীলাল সম্পর্কে এমন অনেক কথা আছে যা আমার অজানা ছিল।

> "...কুমুদনাথ (ফণীন্দ্রের পিতা) প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজীতে এম-এ পাস করে গ্রামে এসে নবগঠিত ইংরেজী স্কুলের অবৈতনিক হেডমাস্টার হয়ে স্কুলটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ভার নেন। কিন্তু

দীর্ঘদিন তাঁর এ কাজ করা সম্ভব ছিল না [তিনি প্রথমে মুনসেফ ও পরে জজ হয়েছিলেন], তাই খোঁজ পড়ে এমন একজনের যাঁর হাতে তিনি স্কুলের ভার দিয়ে যেতে পারেন। পাবনা ছোট জেলা, বিহারীলালের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁদের কানে আসতে দেরি হয় নি এবং তাঁদেরই আমন্ত্রণে বিহারীলাল হেডমাস্টার হয়ে এ গ্রামে আসেন।

"...পোতাজিয়া গ্রামের পূব দিক ঘেঁষে বইত বলেশ্বর নদ—তার কূলে ছিল ঠাকুরবাবুদের হাটখোলা, সাহাজাদপুর পৌঁছানোর আগে কবির [রবীন্দ্রনাথের] বোট ভিড়ত সেখানে।...তিনি এলে গ্রামে সাড়া পড়ে যেত। বিহারীলালও সেই সূত্রে তাঁর সংস্পর্শে আসেন।

"বিহারীলাল ছিলেন একাধারে কবি ও চিত্রশিল্পী। আমার মা... প্রদীপ নিতেন। ছেলেবেলায় তাতে দেখি বিহারীলাল গোস্বামী রচিত "মেঘদূত" সম্বন্ধে একটি কবিতা এবং তার উপরে বিরহশয়নে শায়িতা যক্ষপত্নীর একখানি ছবি।...মায়ের কাছে শুনি কবিতাটি আমাদের গ্রামের হেডমাস্টার মহাশয়ের লেখা, এবং ছবিখানি তাঁরই আঁকা। ছবির পশ্চাৎপটে জানালার প্যানেলের ফাঁকে ফাঁকে লেখা আধিক্ষামাং বিরাহ-শয়নে সন্নিষন্নৈকপার্শ্বাং।...যতদূর মনে পড়ে, বিহারীলালকে দেখার আগেই এই ছবি ও কবিতা দেখি। পরে তাঁর সংস্পর্শে এসে দেখি তিনি আমার কল্পনার মানুষটির চেয়ে অনেক বড়।

"রবীন্দ্রনাথ পরিমলকে বলেছিলেন, তিনি একবার তাঁকে ডেকেছিলেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু আমি শুনেছি এই 'একবার' দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, এর অর্থ এই নয় যে, এই ডাক একটিবার মাত্র এসেই থেমে গিয়েছিল। নব প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ নানা স্থান থেকে জ্ঞানীগুণীদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। এ সম্ভব নয় যে বিহারীলালের মত গুণী, যাঁর ছন্দের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হয়ে, স্বয়ং ছন্দের যাদুকর হয়েও তাঁকে 'ছন্দোবিনোদ' উপাধি দিয়েছিলেন, তাঁকে অত সহজেই তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।...এ বিষয়ে যাঁরা জানতেন তাঁদের কাছে শুনেছি...তিনি বলেছিলেন আমি তারাবাবুকে [তারানাথ রায়, ফণীন্দ্রনাথের জ্যাঠা-মশাই] ছেড়ে যেতে পারি না।"

তারানাথের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আরও উদ্ধৃত করি—

"সেতারে তাঁর [বিহারীলালের] হাত মিষ্ট ছিল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি তারানাথকে সেতার বাজিয়ে শোনাতেন। বেশ মনে আছে,

প্রায় অর্ধরাত্রে যখন পাড়াগাঁয়ে চারিদিক নিস্তব্ধ, জ্যোৎস্নাধারায় ভরে গেছে আকাশ-ধরণী, তখন তারানাথের বৈঠকখানা থেকে দক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে আসছে তাঁর সেতারের সুর, অন্দরের যে ঘরটিতে আমরা থাকি তার জানালায় বসে আমি তন্ময় হয়ে তাই শুনছি।

রবীন্দ্রনাথের লেখা একখানি চিঠি (শান্তিনিকেতনে যেতে আহ্বান করে লিখেছিলেন, তা আমার কাছে আছে, অন্য চিঠি অনেক গুলি হারিয়ে গিয়েছে। এই চিঠিখানি শিলাইদহ থেকে লেখা।

"সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন, বোলপুর বিদ্যালয়ে ইংরেজি অধ্যাপনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। বেতন পঞ্চাশ—বিদ্যালয় গৃহেই বাস করিয়া অন্যান্য অধ্যাপকদের সহযোগে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণের ভার লইতে হয়। যদি এ কার্যভার গ্রহণ করা আপনার অভিমত হয় তবে কতদিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে পারিবেন জানাইবেন। লোকের অভাবে ক্ষতি হইতেছে অতএব আপনার মত জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। আমি ফাল্গুন মাসে এইখানেই যাপন করিব স্থির করিয়াছি, যদি সুবিধামত আমার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর হয় তবে সকল কথা আলোচনা হইতে পারিবে। আশা করি ভাল আছেন। ইতি ৫ই ফাল্গুন, ১৩১৪।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিহারীলালের শিক্ষাদানের রীতির কথা উত্থাপন করেছি আগে। এ বিষয়ে তাঁর এক ভূতপূর্ব প্রিয় ছাত্র শ্রীনলিনীরঞ্জন রায়কে (এঁরও বাস পোতাজিয়া আমি একখানা চিঠি লিখে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম এই যে, তিনি যেন তাঁর হেডমাষ্টার সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখে জানান—তিনি কেমনভাবে পড়াতেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কি রকম ব্যবহার ছিল এই সব লিখতে বলেছিলাম। যখন ১৯১০ সালে এনট্রান্স উঠে গিয়ে প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন রীতি প্রবর্তিত হয়, সেই বছর নলিনীরঞ্জন পোতাজিয়া স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে পাস করেন। পরবর্তীকালে তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর খুব বেশি দিন সেখানে আর থাকেন নি। তিনি আমাকে যে চিঠিখানা লিখেছেন তা এই—

নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
২৪ পরগণা, ৯-২-৬৬

প্রিয় পরিমল,

তোমার চিঠিখানা পেয়ে আনন্দ হল।···আমি তোমার পিতৃদেবের ছাত্র বলে গর্ববোধ করি।···তাঁর শিক্ষকতা সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে বলেছে ···সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

আমি শৈশব থেকেই তাঁর ছাত্র। কারণ শিশু শ্রেণীতে যখন পড়ি (১৯০০) তখনই তিনি আমাদের প্রধান শিক্ষক। একটু উঁচু ক্লাসে উঠে তাঁকে সাক্ষাৎভাবে পেয়েছি ড্রইং-এর ঘণ্টায়। তখন চেয়ার টেবিল ইত্যাদি দেখে মডেল ড্রইং করতে হত। সেই সময় তিনি পার্সপেকটিভ কথাটি বুঝিয়েছিলেন। তার বাংলা তিনি বলতেন পরিপ্রেক্ষিত। রং সম্বন্ধেও সাধারণ একটা ধারণা তিনি দিতেন। প্রথম তাঁর কাছে রামধনুর সাত রং VIBGYOR শিখি। আরও শিখেছিলাম যে, মৌলিক রং তিনটি—লাল নীল ও হলুদ এবং এদের অনুপূরক রং যথা-ক্রমে হরিৎ, কমলা ও বেগুনে। আর পরস্পর অনুপূরক রঙের সূত্র বলে দিয়েছিলেন—হরিলাল, নীলকমল, তেলেবেগুনে।······তোমরাও শুনেছ নিশ্চয়ই।··· আমার ঠিক মনে আছে তো?

"আমরা ১৯১০-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই। ১৯০৯ পর্যন্ত পাঠ্য-বিষয় নির্বাচিত ছিল, মুখস্থ করে পাস করা যেত, বা বলা যায় পাস করতে হলে মুখস্থ করতে হত। এই 'এনট্রান্স' পরীক্ষা ১৯০৯-তে শেষ হয়ে গেল। আমাদের ইংরাজি ও বাংলাতে কোন পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ছিল না। প্রশ্নপত্রে 'আন্‌সীন প্যাসেজ' থাকত যার সাবস্টান্স পরীক্ষার্থীর নিজের ভাষায় লিখতে হত। বাংলা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ আর রচনা। গ্রামারের প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নপত্রে ইংরাজি অনু-বাদের জন্য ৭০ মার্ক ও দুটি রচনার ৩০। দ্বিতীয় পত্রে আনসীন প্যাসেজের সাবস্টান্সে ৭০, গ্রামারে ৩০। বাংলাতেও, ইংরাজি থেকে বাংলা অনুবাদে ৭০, রচনায় ৩০। এই নূতন ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীর ভাষা-জ্ঞান খুব ভাল না হলে পাস করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সুতরাং পূর্বের শিক্ষণ পদ্ধতিও সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। আমরাই প্রথম দল, যারা এই অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হই ১৯১০ সালে। কিন্তু আমরা

নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছি শুধু হেডমাস্টার মহাশয়ের পরিবর্তিত শিক্ষণ পদ্ধতির গুণে।

"আমাদের যেমন পাঠ্য নির্দিষ্ট ছিল না তাঁরও তেমনি শিক্ষার বিষয়ও নির্দিষ্ট ছিল না। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের যতখানি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন, এইটি বোধ হয় তাঁর লক্ষ্য ছিল। শিক্ষাদানের মাধুর্যে অতি অনায়াসে আমরা কত বিষয় তাঁর কাছে শিখেছি এবং আনন্দ পেয়েছি। ইংরাজি বা সংস্কৃতের ছন্দ আমাদের পাঠ্য ছিল না, কিন্তু তিনি কবি ছিলেন, এবং বুঝতেন যে ছন্দ-জ্ঞান না থাকলে কবিতার মাধুর্যবোধ অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ইংরাজি ও সংস্কৃত ছন্দ আমাদের শিখিয়েছিলেন। তাতে আমরাও বেশ আনন্দই পেতাম। এখনও মনে আছে তাঁর সেই সব সূত্র। তোমরাও নিশ্চয় তাঁর কাছে শিখেছিলে এ সব।

"আই-এ পড়ার সময় এর সুফল পেয়েছিলাম প্রসোডি পড়তে।

"সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে কত শিখেছিলাম, আশ্চর্য এখনও ভুলি নি। এবং তার কারণ আমার স্মৃতিশক্তি নয়, বরং হেডমাস্টার মহাশয়ের শিক্ষাপদ্ধতির অসাধারণত্ব। তাঁর কথা লিখতে গেলে অল্পে শেষ করা কঠিন।......

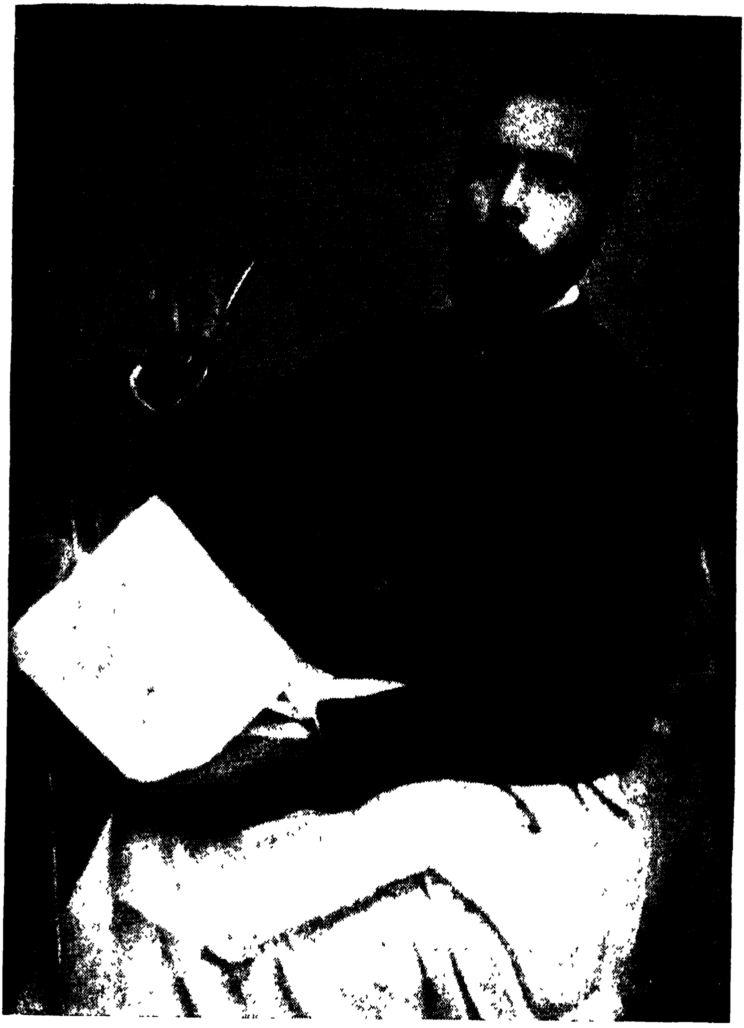
"সংস্কৃত কাব্য ভালবেসেছিলাম তাঁরই কৃপায়। স্কুলেই আমরা শিখেছিলাম—স র সি জ ম নু বি দ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং ইত্যাদি। ন খলু ন খলু বাণঃ সান্নিপাত্যোঽয়মস্মিন ইত্যাদি। আর তার সঙ্গে ছন্দের সূত্র—ন ন ম য য যুতেয়ং "মালিনী" ভোগিলোকৈঃ। আবার এই সূত্র বুঝতে হলে জানা দরকার—

মস্ত্রিগুরু স্ত্রিলঘুশ্চ নকারো
ভাদি গুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ পুনরন্ত লঘুস্তঃ।

আরও অনেক ছন্দ সূত্র শিখেছিলাম মনে পড়ছে—

স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ।
জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তভজা জগৌ গঃ।

হয় তো বলতে বলতেই ক্লাসে ঢুকলেন—"গৃহিনী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয় শিষ্যাললিতে কলাবিধৌ"—বিয়োগিনী ছন্দ, অজবিলাপ, রঘুবংশ।



বিহারীলাল গোস্বামী

ফোটো অনুমান ১৮৯৯

এইভাবে শিক্ষা দিলে সংস্কৃত কাব্যের উপর কার না আকর্ষণ হয়? তাই ত বি-এ পর্যন্ত সংস্কৃত ছাড়ি নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ছিলেন, তাই যাতে আমরা রবীন্দ্রকাব্যের রস গ্রহণ করতে পারি তার জন্য কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তখন বুঝি নি। আর তিনি নিজে যে একজন কবি তাই কি তখন ঠিক বুঝতাম? ক্লাসে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাংলা কবিতার মধ্যে সংস্কৃত আছে এমন কবিতা বলতে পারিস? আমাদের সামান্য জ্ঞানে বন্দেমাতরমের কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, আরও শোন বলি—

দেখিয়া শঠে শিহরি ওঠে, অঙ্গে স্বেদবিন্দু ;
চলিয়া যেতে তুলিয়া পদ করিবে যাই ন্যস্ত—
পথের মাঝে অচলরাজি—আকুলা যেন সিন্ধু
নগাধিরাজতনয়া আজ 'ন যযৌ ন তস্থৌ!'

সঙ্গে এর সংস্কৃতটাও বলেছিলেন বটে। তখন বুঝতে পারি এটি তাঁর অনুবাদ। [ছাপা বইতে "চলিয়া যেতে তুলিয়া পদ"-এর স্থলে বঙ্গদর্শনে ছাপা—"কমলপদ তুলিয়া শুধু"—মুদ্রিত হয়েছে—"চলিয়া যেতে তুলিয়া পদ"—এই পরিবর্তন তাঁর কোনো পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় নি, মুদ্রণ সময়ে অন্তত চোখে পড়ে নি।—লেখক]

"তাঁর ছাত্রদের উপর তাঁর স্নেহমমতার কথা কোন বর্ণনা দিয়ে বোঝান যাবে না।...

"...মামুলি পদ্ধতিতে শিক্ষা না দিয়ে এইভাবে ছাত্রের মনে আনন্দ জাগিয়ে নানা বিষয়ের ধারণা মনে গেঁথে দিতে আমি আর কোন শিক্ষককে দেখি নি।"... ইতি তোমার, নলিনীদা

কুমার-সম্ভবের প্রসঙ্গে আরো একটু আলোচনা করা যাক। এর প্রথম সর্গেই যে-ছন্দ আগাগোড়া দেখা যাবে তা ধ্বনিতে ঝঙ্কারে অতুলনীয়। যথা—

সিন্দুরে গৈরিকে কিন্নরী ললনা
বিভ্রম ভূষা করি বিহরিছে শিখরে—
ধাতু আভা লেগে যবে মেঘে শোভে ছলনা
অকাল সাঁঝের মত পর্বত উপরে। ৪
কটিতটে চলন্ত জলদের নিম্ন
ভুঞ্জি সানুর ছায়া সিদ্ধেরা সমুদয়

বৃষ্টির জলে পড়ে হলে পরে খিন্ন
রোদ্দুরে গিরিচূড়ে লভিতেছে আশ্রয়। ৫
দ্রবহিমে বিধৌত রুধির সে চরণে,
করী বধি গিরি-পথি পলাইছে কেশরী,
নখরের ফাঁকে তার মুকুতার ক্ষরণে
কিরাতেরা ফিরে তারি সন্ধানি' যে-করি'। ৬
করি-শিরে বিরচিত বিন্দুর মত-না
সিন্দুর ধাতুরাগ সুলিখিত আখরে
কিন্নরী কামিনীরা প্রেমলিপি কত-না
ভূর্জের পাতে রচে পর্বত শিখরে। ৭

অথবা—

চলে যেতে পদতলে যন্ত্রণা বড়-যে
এ-হেন তুহিনে ঘন ঢাকা বন-পন্থ,
তবু দুর্বহ-ভার শ্রোণী আর উরোজে
কিন্নরী ছাড়িতে না পারে গতি মন্দ। ১১
রবি হতে রাখে গিরি সুগভীর কুহরে
দিন-ভয়ে লীন হয়ে আসে সেথা যে-আঁধার,
করুণা শরণাগত ক্ষুদ্রেরো উপরে,
মহতের পরে যথা সর্বথা সুচেতার। ১২

প্রতি সর্গে বিভিন্ন ছন্দ। তৃতীয় সর্গে মদনভস্ম অধ্যায়ে ৭২ সংখ্যক শ্লোকে মূলের যে ধ্বনি, এবং যার জন্য এই পদগুলি বিখ্যাত, সেই পদগুলির মূল ও অনুবাদ দুই-ই একসঙ্গে উদ্ধৃত করছি—

"ক্রোধং, প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ সবহ্নির্ভব নেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার।

অনুবাদ—

"ক্রোধ, প্রভু শঙ্কর, সংহর সংহর।"
বহিতে না বহিতে এ নভোবাণী পবনে,
ভব-আঁখি জাত সেই বহ্নি যে নিমেষেই
ভস্মে বিনিঃশেষ করিলেক মদনে।

মূলের ধ্বনি ও সৌন্দর্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে বজায় রাখার চেষ্টায় কচিৎ কোনো ক্ষেত্রে দু-একটি অচলিত শব্দর ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু প্রতি লাইনের অনুবাদ প্রতি লাইনের মধ্যে নিবদ্ধ রেখে এ অনুবাদ যে বিশেষ প্রশংসনীয় এ বিষয়ে সমসাময়িক গুণী পাঠকেরা একমত ছিলেন। কুমার-সম্ভবের কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরে শৈলেশ মজুমদারের সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবার সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পোস্টকার্ড এই—

ওঁ

শিলাইদহ

নদিয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন,

আপনার অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে পাঠাইয়া দিলাম।

ইতি ২৩শে ফাল্গুন, ১৩১৪

ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর দু' বছর পরে কুমার-সম্ভব গ্রন্থরূপে প্রকাশ মানসে এর মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অংশ একত্র করে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠান। উদ্দেশ্য, গ্রন্থরূপে ছাপার আগে কিছু পরিমার্জনা প্রয়োজন বোধ করলে তিনি যেন তা করে দেন, এবং কোথায় প্রকাশ করা সম্ভব তার আভাস দেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানা লেখেন তা এই—

জোড়াসাঁকো

কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন

ছন্দ ও ভাষার কারুনৈপুণ্যে পূর্ণ আপনার কুমার-সম্ভবের অনুবাদে আমি হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না। আপনি যে দুঃসাধ্য কাজে আশ্চর্য সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আমাদের কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না, অতএব ইহার শোধন চেষ্টা করিতে গেলে ইহাতে বিকৃতি ঘটাইবারই আশঙ্কা আছে।

হস্তলিপির প্রারম্ভের কবিতাটি পড়িয়া এমন একটি বেদনা অনুভব করিলাম যাহা যেমন আপনার তেমনি আমারও। সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি, সান্ত্বনা দিবার শক্তি আমাদের হাতে নাই।

চারু আজকাল এলাহাবাদে থাকেন সেখানে আপনার লেখাটি মন্তব্য-সহ পাঠাইয়া দিব যদি তাঁহারা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিহিত ব্যবস্থা করা যাইবে।

ছন্দ আবিষ্কার কবিতাটি হস্তগত হয় নাই। ইতি ১লা ভাদ্র, ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(এই কুমার-সম্ভবের শোভন সংস্করণ ১৯৫৯ সালে মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ প্রকাশ করেছেন।)

এই চিঠিতে "প্রারম্ভের কবিতাটি"র যে উল্লেখ আছে সেটি সদ্যোমৃত দ্বিতীয় পুত্রের উদ্দেশে রচিত ছিল। "ছন্দ আবিষ্কার" নামক কবিতার একটি পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে সেটি এইখানে উদ্ধৃত করি। এটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত, অর্থাৎ মেঘদূতের ছন্দে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'পিঙ্গল বিহ্বল ব্যাথিত নভতল'—(যক্ষের নিবেদন) অনুসরণে লেখা। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছয় নি তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়। সম্ভবত সেজন্য ভারতীতে প্রকাশিত হয় নি।

ছন্দ-আবিষ্কার

সত্যেন দত্তের কবিতা ভারতীর অদ্য দেখলেম সকল সার।
মন্দাক্রান্তার রচনা সুমধুর কিম্বা সুন্দর নকল তার!
গম্ভীর গর্জন জান ত কামানের বর্ষা পদ্মার বিভল ধার?
বংশীর বাদ্যই সদা যে, কদাচিৎ আর-ডি রডডার রিভলভার!
ইংলিশ বলছেন স্বদেশী অরেটার বাংলা ভাষাটার কাঠিন্যেই,
মুনসব পুঙ্গব ডেপুটিবাবু তার ঘণ্টা কিঞ্চিৎ স্বাধীন নেই।
দুর্বল মাস্টার কব কি অবতার? পূর্ব শিক্ষায় প্রাচীন তেঁই,
অন্দর লোকেরাই বাংলা পড়িছেন যুক্ত অক্ষর না চিনতেই।
বাংলার মধ্যেই রয়েছে এত গুণ, কিন্তু হই খুন বিতণ্ডায়,
পণ্ডিতবৃন্দের কত কি তকরার বিক্রি হোক সব দুগণ্ডায়।
মেঘদূত ছন্দের হয়েছে অনুবাদ বাংলাতেই, নয় উগাণ্ডায়।
মণ্ডার লক্ষণ লভেরে সবে শোন মুণ্ড ভক্ষণ কে খণ্ডায়?
পদ্মের সন্ধান রাখি না মোরা কেউ ছন্দ গুঞ্জন চমৎকার
করবেন কোন্ জন? নাহিক প্রয়োজন পঞ্জী দেখলেন গণৎকার।

নিন্দন বন্দন না মানে কিছু যেই এমনি হায় মন মহৎ কার ?
অন্নের লক্ষ্যায় না টানে অনুখন টঙ্কা পায় ঝন ঝনৎকার !

পাণ্ডুলিপিতে যেমন লেখা ছিল ঠিক তেমনি উদ্ধৃত করা হল।

'বঙ্গভাষা' মাসিকপত্রে বিহারীলালের অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল—সবই ত্রিপুরাব্দ ১৩১৩ (বঙ্গাব্দ ১৩১০) সালে। 'স্মৃতি সপ্তক' ও 'গীতি সপ্তক' নামক সাতটি করে কবিতাগুচ্ছ প্রতি সপ্তকে। 'উদ্দেশে' নামক আরও একটি কবিতা। এই কবিতাগুলি ১৩১০, (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হলেও এর রচনাকাল অনেক পূর্বের এটি অনুমান করা যায় তাঁর পুরনো খাতা থেকে। তাতে দু' একটি অপ্রকাশিত কবিতার নিচে "১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ" লেখা আছে। অবশ্য প্রকাশিত কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পরে পুরনো খাতাতে লেখা হয়ে থাকতে পারে।

বিহারীলালের সঙ্গীতে কিছু অধিকার ছিল। সেতার বাজাতে দেখেছি নিয়মিত। বঙ্গভাষায় প্রকাশিত "স্মৃতি সপ্তক" কবিতাগুচ্ছের তৃতীয় ও চতুর্থ কবিতার উপরে সুর ও তালের নাম দেওয়া আছে হাতের লেখা খাতায়। যেমন, তৃতীয় কবিতার উপরে লেখা আছে—গৌরী একতালা। কবিতাটি এই—

(৩)

চকিত আঁখিতে তারে কত আর
হেরিবি রে,
না তুলিতে আঁখিপাতা
সরমেতে মরিবি রে।
হৃদয়ের ভালবাসা,
চোখে যেন ভাসাভাসা,
তাই কি এতেক শঙ্কা
পাছে ধরা পড়িবি রে।

এর পর চতুর্থ গীতি, নাম "লজ্জার সাহস"। এই কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে ঐ নামের পাশে লেখা আছে ঝিঁঝিট খাম্বাজ, দাদরা। কবিতাটি এই—

(৪) লজ্জার সাহস

দেখি দেখি করি মনে
পুলকে পরাণ নাচে,

কথার বাঁধুনিগুলি
ভুলি দরশনে পাছে।"
চোখের আড়ালে থাকি,
যারে শত নামে ডাকি,
দেখিলে কি তারি আঁখি
সকলি ভুলিতে আছে ?
এ কথা সে কথা ধরি'
সম্মুখে ত গিয়ে পড়ি,
না হয়, মরমে মরি'
মরম খুলিব কাছে !

মোট ১৪টি গীতির মধ্যে মাত্র এই দুটিতে সুর ও তালের নাম লেখা আছে।

বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত প্রদীপ (৫ম ভাগ ১৩০৯) নামক মাসিকে যক্ষপত্নী নামক বিহারীলাল গোস্বামীর একটি সনেট প্রকাশিত হয়। তাঁরই আঁকা একটি ছবি, লাইনে এনগ্রেভ করে মুদ্রিত হয়। প্রদীপের প্রথম সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ দাস ও তৃতীয় সম্পাদক বিহারীলাল চক্রবর্তী। (শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের লেখা থেকে পূর্বে এই সচিত্র কবিতার কথা জানা গেছে।)

ভারতী মাসিকপত্রে (১৩০৮ আষাঢ় ও শ্রাবণ) বিহারীলালের মেঘদূতের অনুবাদ (যথাক্রমে পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ) কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে যে ভূমিকা আছে তাতে তারিখ লেখা আছে আষাঢ় ১৩০৪, অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব প্রকাশিত হওয়ার অন্তত চার বছর আগে অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে ভূমিকার আরম্ভে লেখা আছে —"বর্তমান গ্রন্থখানি কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত একটি অভিনব ছন্দ অবলম্বনে অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত 'মানসী' কাব্যে 'বিরহানন্দ' ও 'ক্ষণিকমিলন' নামক দুইটি সুমধুর কবিতা আছে। উহাদের আবৃত্তিতে যে একটি স্নিগ্ধ মধুর খেদের ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াই মেঘদূত অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

বিহারীলালের মেঘদূতের অনুবাদে ঐ ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"এরূপ কঠিন ছন্দে এতগুলি মিল সামলাইয়া আপনি যে এই দুরূহ অনুবাদ এতদূর সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি।

ভাষার উপরে আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।"

ভারতীতে প্রকাশিত মেঘদূতের পূর্বমেঘের আরম্ভটা এইরূপ—

যেথায় জানকীর স্নানে নীর নিরমল—
নিঝর নামে ধীরি রামগিরি পদতল,
সঘন তরুছায় নিরালায় বনাগার,
যক্ষ দীন বেশে বসে এসে সে অচল।
নিয়োগ হেলা পাপে অভিশাপে প্রভু তার—
"বরষ ভুঞ্জিবি প্রেয়সী বিরহানল।"...

শ্রীনলিনীরঞ্জন রায়ের চিঠিতে একস্থানে আছে, তাঁদের হেডমাস্টার মহাশয় "রঙের সম্বন্ধেও সাধারণ একটা ধারণা দিতেন।"—এবং পরে পরস্পর অনুপূরক রং বা complementary colour-এর যে ফর্মুলা তৈরি করেছিলেন—যেমন "হরিলাল, নীলকমল, তেলেবেগুনে" এটি কছিলেন সহজে মনে রাখবার জন্য। এবং ঠিক এই সব তাঁর গড়া শব্দ ব্যবহার করে ভারতীতে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। পার্সপেকটিভ বিষয়েও ১৩০৮-এর কার্তিক সংখ্যায় "চিত্রাঙ্কন" নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধ তিনি আরও কয়েকটি লিখেছিলেন প্রদীপে ও ভারতীতে। যথা "বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দ" (প্রদীপ পৌষ ১৩০৭), "কবিতার ছন্দ ও মিল" (ভারতী, কার্তিক, ১৩০৭)। "বাংলা শব্দের দ্বিরুক্তি" প্রবন্ধও ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সবই প্রায় রবীন্দ্রবিরোধীদের জবাবে।

"কবিতার ছন্দ ও মিল" প্রবন্ধটি ভারতী থেকে শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে" নামক সঙ্কলন গ্রন্থে (১৯৬২) পনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রবন্ধটির আরম্ভ এইরূপ—

"ভাদ্র মাসের ভারতীতে (১৩০৭) তুলসীদাসের রামচরিত্র মানস সমালোচনায় লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "সংস্কৃত ছন্দগুলি প্রাদেশিক ভাষায় আনিতে যাইয়া কোন কবিই সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের নিয়ম উৎকৃষ্টভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই।" কথাটি অনেকটা ঠিক হইলেও বোধ হয় যে, কবিরা সে চেষ্টা করেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই ঈষৎ স্খলিত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাষার প্রকৃতি বুঝিয়া একটু নূতন নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন মাত্র। লেখক-উদ্ধৃত তুলসীদাসের তোটক ছন্দেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভব বারণ দারুণ সিংহ প্রভো
গুণ সাগর সাগর নাথ বিভো।

ইহাতে লেখক [দীনেশচন্দ্র] কোন খুঁত দেখিতে পান নাই, কিন্তু "আজ ব্যাপকমেক অনাদি সদা" চরণে দ্বিতীয় অক্ষর গুরু করা হইয়াছে বলিয়া ভুল বাহির করিয়াছেন। [যুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ গুরু—সংস্কৃত নিয়মে, আগে বলা হয়েছে একবার।] বস্তুত উভয় স্থলেই ভ্রম আছে, একটি তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, অপরটি পড়ে নাই। সংযুক্ত বর্ণের পূর্বাক্ষর গুরু হয়, সুতরাং "আজ ব্যাপকে" চরণে দ্বিতীয় অক্ষর গুরু হওয়াতে যেমন ভুল হইয়াছে, তেমনি তোটকের তৃতীয় ষষ্ঠ নবম অক্ষর গুরু হওয়ার নিয়মে প্রথম শ্লোকের দশম অক্ষর গুরু করাও সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু কবিরা প্রাদেশিক ভাষায় এইটুকু বিশেষত্ব প্রবেশ করাইয়াছেন যে, তাঁহারা দুই পদ আবশ্যক মত পৃথক ধরিয়া পাঠ করেন তাহাতেই সংযুক্ত বর্ণের পূর্বাক্ষর (পূর্বপদের) গুরু বলিয়া কানে বাজে না। তাঁহারা এক পদের মধ্যে এ নিয়ম সর্বত্র রক্ষা করিয়া চলেন। আমাদের রবীন্দ্রবাবুরও এই নিয়ম। তাঁহার বহু কবিতাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম—

"নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
উর্ধ্বে পাষাণ তট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছলছল করতালি দেয় অনিবার।"

ইহার দ্বিতীয় চরণে সংস্কৃত নিয়মে 'তট' শব্দের 'ট' যুক্ত অক্ষরের পূর্বে আছে বলিয়াই যে গুরু পাঠ করিতে হইবে তাহা নহে। কিন্তু 'গহ্বর' শব্দের 'গ' ও 'নিম্নে'র 'নি' একই পদে আছে বলিয়া গুরু উচ্চারিত হইবে।

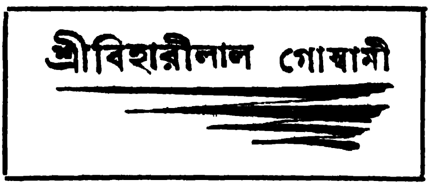
এখানে বক্তব্য রবীন্দ্রবাবু সংস্কৃত ছন্দে লিখেন নাই, ইহা আমাদের অধমতারণ পয়ার ছন্দেই লিখিত হইয়াছ।"……

দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষী বাংলা ব্যাকরণ কি রকম হওয়া উচিত, তা নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। এই আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখছেন (যুগান্তর সাময়িকী, ১৯ই এপ্রিল, ১৯৬০ শিরনামা—"বঙ্গের ভাষা বিচ্ছেদ") "শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ স্বামীর স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত পত্র আমাদের হাতে আসে—

"প্রায় চারি বৎসর হইল বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষার রীতি পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে"—

এই চিঠির আরম্ভ মাত্র উদ্ধৃত করলাম। এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পরে লিখেছেন,—"এইরূপ বঙ্গের ভাষা বিচ্ছেদ ও ব্যাকরণ প্রসঙ্গ লইয়া যখন আলোচনা চলিতেছিল, সে সময় ব্যাকরণ প্রসঙ্গ লইয়া একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনা করেন। তাঁহার সঙ্গে আমার সেকালে কলিকাতাতেই একদিন কোথাও আলোচনা হইয়াছিল, কোথায় আজ তাহা আমার মনে নাই, সম্ভবত বাগবাজারে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ি, কিংবা সাহিত্য পরিষৎ ভবনে। তাঁহার হাতের লেখা ছাপার



বিহারীলালের হস্তলিপি

লেখাকেও হার মানাইত। সে দিন আলাপ ও আলোচনা হইয়াছিল ব্যাকরণ প্রসঙ্গ লইয়া। মনে পড়ে অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লেখকের নাম বিহারীলাল গোস্বামী। আমরা এখানে ব্যাকরণ প্রসঙ্গ প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিলাম" :

"ব্যাকরণ প্রসঙ্গ"

বিহারীলাল গোস্বামী

কতিপয় বৎসর হইল বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। প্রধানতঃ দুই দল হইয়াছে—একদল সংস্কৃতের পথেই চলিতে চান, অন্য দল বঙ্গভাষার জন্য পৃথক ব্যাকরণ রচনার পক্ষপাতী। কেহ কেহ আবার মধ্যপথাবলম্বী।

বাস্তবিক পক্ষে এই কয় দলের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। খাঁটি বাংলার জন্য "স্বতন্ত্র" ব্যাকরণ রচনা করা কাহারও সাধ্য নয়—বোধ হয় দ্বিতীয় দলের তাহা উদ্দেশ্যও নহে। "সংস্কৃত"র সঙ্গে তাহার পূর্ণ বিচ্ছেদ সম্ভবপর হইতে পারে না।

যাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বনে চলিতে চান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই—কিন্তু সংস্কৃতের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ যেভাবে আন্দোলন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে—"ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে কি না ?" ইহার উত্তর খুব সহজ বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ ভাষা কাহাকে বলে তাহা সকলে জানেন। যে উচ্চারিত শব্দরূপ উপায় দ্বারা লোকে মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই মানুষের 'ভাষা' এই ভাষা শুদ্ধরূপে "লেখা" ও "বলা" যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহার নাম ব্যাকরণ। যাহা দশজনে বলে বা দশজনে লেখে তাহা দেখিয়াই প্রধানতঃ ভাষার শুদ্ধি অশুদ্ধি নির্ণীত হয়। এ কথা নিশ্চিত যে, যখন বাংলা বলিয়া একটা ভাষা আছে, তখন তাহারও ব্যাকরণের আবশ্যকতা আছে কি না, এ প্রশ্ন তুলিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। আগে ভাষা, পরে ব্যাকরণ। ভাষা যে পথে চলিবে, ব্যাকরণেরও প্রথমে সেই পথে চলা উচিত। পরে মধ্য পথ হইতে এ উহার সহায় হয়। ভাষা যদি উন্নতিশীল এতএব পরিবর্তনশীল হয়, তবে ব্যাকরণের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। দু'শ পাঁচ শ' বছর পরে ভাষা দুর্বোধ্য হইয়া পড়িবার অর্থ কি ? তখনকার লোকে যে ভাষায় কথাবার্তা কহিবে তাহা কি তাহাদের কাছে দুর্বোধ ঠেকিবে ?······

···কথা এই—বর্তমান ব্যাকরণ আমাদের বর্ধিষ্ণু ভাষার প্রতি সম্যক লক্ষ্য করিয়াছে কি না ? না; এ পর্যন্ত করে নাই। সেই জন্য যাঁহারা বাংলায় কথাবার্তা বলেন বা লেখনী চালনা করেন, তাঁহারা আধুনিক ব্যাকরণের উপযোগী উপাদান নানা প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র। যাহা ইতি-পূর্বেই সংগৃহীত আছে, তাহারও নির্বাচন চলিতেছে। সম্ভবত আরও কিছুদিন এই সংগ্রহ কার্য চলিবে, পরে ব্যাকরণের প্রথম "সংস্করণ" হইবে।

কথিত ভাষা সাধারণ লোকের ভাষা একথাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়।···যদি সাধারণ মানে অধিকাংশ লোক হয়, তবে তাহা ছাড়িয়া ব্যাকরণ কিংবা সাহিত্য রচিত হইবে কি করিয়া ? "বিশুদ্ধ ব্যাকরণ বিদ্যমান না থাকায় বাংলা সাহিত্যের সবিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে"—এ কথার অর্থ কি এই যে, যে সমস্ত ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একখনিও শুদ্ধ নয় ? সকলই যদি ভ্রমসঙ্কুল হয়; তবে ত' আশঙ্কার কথাই বটে। সুতরাং "অধুনা বাংলা লেখকগণ কোন নিয়মের বশবর্তী নহেন" ইহাতে বিচিত্র কি ?···অতএব

লেখকবর্গ যে যাহার মতে চলিতেছে তাহাতে আক্ষেপ কি?…ফলকথা যে সমস্ত ব্যাকরণ প্রচলিত আছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত ব্যাকরণের বাংলা পকেট সংস্করণ। কতক বা ইংরাজি ব্যাকরণের অনুকরণ। অতি অল্প সংখ্যকই বাংলা রচনার অবলম্বন হইতে পারে। এই অত্যল্প সংখ্যকও অবার অল্প লেখকই দেখিয়া থাকেন!…

"ব্যাকরণের সূত্রে বদ্ধ হইলেই ভাষা মরিয়া যায়—এ কথারও কোন যুক্তি বা ভিত্তি নাই।…সজীব ভাষার অনুচর ব্যাকরণ, শেষে অনুচর প্রায় সহচর হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি মত্তদন্তীর মত ভাষার গতি স্বাধীন ও উদ্দাম থাকিলে ব্যাকরণের সাধ্য কি যে, সরু সরু "সূত্র" তৈরি করিয়া তাহাকে বদ্ধ করে। তবে যখন গতি মন্থর হইয়া আসে তখন তাহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিতে পারে। শেষে যখন ভাষা নিতান্ত স্থির হয় বা মরে, তখন ব্যাকরণ তাহাকে একেবারেই বাঁধিতে পারে।…

"কিন্তু উপমার রজ্জু বেশি টানিলে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।…স্থূলকথা এই, ভাষার চরম দশায় ব্যাকরণই প্রহরীস্বরূপ। মৃতভাষাকে নাড়াচাড়া করিতে হইলে ব্যাকরণের অনুমতি ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ব্যাকরণের সহায়তায় মৃত ভাষারও "সাড়া" পাওয়া যায়।…পরবর্তী ব্যাকরণকারেরাও পাণিনি-পরিত্যক্ত অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যবহার নির্দেশ করিয়াছেন। এই সকল শব্দ পাণিনির পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যকারগণ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ব্যাকরণে নূতন সূত্র হইয়াছে। তাহা ছাড়া কত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ, বিকল্প, কত আর্ষপ্রয়োগ…যাহাতে বোঝা যায় যে, ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রথমে সমভাবে বিবাদ করিলেও শেষে সাহিত্যের জয় হইয়াছে।"…(ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২)

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁর "রবীন্দ্রনাথ ও সেকালের লেখকগণ" পর্যায়ে এই রচনাটির সবখানি প্রকাশ করলেও আমি এখানে তার অর্ধেকেরও কম উদ্ধৃত করলাম। এবং যদিও এই উদ্ধৃতিও যথেষ্ট বড় হল, তবু এই প্রবন্ধে বিহারীলালের যে যুক্তিসঙ্গত এবং উদার মত ব্যক্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে বাংলা ব্যাকরণকে যে সেই পথই অবলম্বন করতে হয়েছে, তা ঐ আংশিক উদ্ধৃতিতেও বোঝা যাবে, এই উদ্দেশ্যে অনেকখানি স্থান এর জন্য করে দেওয়া হল।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রবন্ধটি সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করার পর (১৯৬০ সালে) মন্তব্য করেছেন, "প্রায় ষাট বছর আগে ভারতীতে বিহারী-লাল গোস্বামী মহাশয়, সেকালের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে, বঙ্গভাষা ও ব্যাকরণ প্রসঙ্গ লইয়া যে আন্দোলন চলিয়াছিল তাহার সমস্যা লইয়া যে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই মনোরম প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তাহা বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন দিক দিয়া যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ও ঘটিতে চলিয়াছে, তাহাতেও বিশেষ ভাবিবার অবকাশ আছে। সেকালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে যে, দলের সৃষ্টি ও মতবৈষম্য ঘটিয়াছিল, তাহার একটি সুন্দর সমাধানও আমরা পাই।"

এই আন্দোলনে তখন অনেকেই যোগ দিয়াছিলেন—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরীও ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর "কথার কথা" প্রায় এই সময়েই ভারতীতে ছাপা হয়—প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় সোজা আক্রমণ, বিরোধী পক্ষকে। তিনি প্রথমেই বলছেন, "সম্প্রতি বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্য সমাজে একটা বড়রকমের বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। আমি বৈয়াকরণ নই, হবারও কোনো ইচ্ছে নেই!...আমি বাংলা ভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।" ইত্যাদি।

আমার মনে হয় এই সময়ের ব্যাকরণ বিতর্ক নিয়ে যে সব প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল তার একটা সঙ্কলন হওয়া উচিত। ভাষা প্রেমিকেরা এ কাজ করতে পারেন।

ইং ১৯০৯ থেকে বিহারীলাল শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা অনুবাদে মন দেন। এবং যে নলিনীরঞ্জন রায়ের চিঠি পূর্বে ছাপা হয়েছে, তিনি এবং তাঁর আর এক প্রিয় ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—তৎকালীন কলকাতাবাসী দুই কলেজের ছাত্রের উপর ভার দেওয়া হয় গীতার অনুবাদ প্রকাশের। ১৯১৩-তে 'গীতা বিন্দু' নামে বইখানা প্রকাশিত হয়। বাঁ পৃষ্ঠায় লাল কালিতে মূল ও ডান ধারের পৃষ্ঠায় তার অনুবাদ নীল কালিতে ছাপা হয়েছিল। গীতা যাতে সহজ ও সুখপাঠ্য হয়, এবং অনুবাদের ভিতর দিয়ে গীতার মর্ম শুধু পাঠের সাহায্যে অল্প সময়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এই উদ্দেশ্যেই অনুবাদে হাত দিয়ে-ছিলেন তিনি। মূল সংস্কৃতের যেখানেই সুযোগ পাওয়া গেছে, সেখানেই

তার অনুবাদে নতুন ছন্দ ও ভাষার মাধুর্য দিয়ে তাকে চিত্তাকর্ষক করা হয়েছে। গীতার বিখ্যাত শ্লোকগুলি সম্পর্কেও সেই কথা। তা ভিন্ন একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ দর্শনে যে ছন্দোঝঙ্কার ও ভাষায় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা পড়তে গেলে তার মধুর ধ্বনি মনে মোহ সৃষ্টি করে। এটি সম্ভব হয়েছে বিহারীলালের ভাষা ও ছন্দঃপ্রীতির জন্যই। এ জিনিস কানে ধ্বনিত না হলে বর্ণনা দ্বারা বোঝানো যাবে না। আমি একাদশ অধ্যায়ের মাঝখান থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি।

অর্জুন

"নিরখি শ্রীহরি, দেবতারা ভরি আছে তব দেহখানি,
বিশ্বমাঝার আছে যত আর অশেষ প্রকার প্রাণী,
আছে ভগবান্ ব্রহ্মা মহান্ বসিয়া পদ্মাসনে,
ঋষির সঙ্ঘ, আছে ভুজঙ্গ, দিব্য সঙ্গোপনে! ১৫
"বাহু অগণন, উদর বদন নেত্র কত না জানি,
দেখি যে তোমার দিগন্ত পার অনন্ত রূপখানি!
নাহিক অন্ত, কোথা হা হন্ত, আদ্য মধ্য তব—
না হয় গোচর, জগদীশ্বর মূরতি বিশ্বভব। ১৬
"কিরীট মস্তে, ধরিছ হস্তে গদা ও সুদর্শন,
প্রতিভা-পুঞ্জে দিশি কি ভুঞ্জে বহ্নির বরিষণ?
নিরখিতে চাহি কোনমতে নাহি পারি তোমা নিরখিতে,
সূর্যের পারা দীপ্তির ধারা ঠিকরিছে সারা ভিতে! ১৭
তুমি অক্ষর, পরমেশ্বর, সবে চায় তব দেখা,
তুমি আমাদের সারা জগতের শুধু আশ্রয় একা।
তুমি অক্ষত, আছ শাশ্বত ধর্ম সুরক্ষণে,
তুমি সনাতন পুরুষ রতন, হেন লয় মোর মনে। ১৮
"আদি মাঝ শেষ, নাহি কিছু লেশ অনন্ত বীর্য হে।
অসংখ্য-কর, শশি-দিবাকর আঁখি শুধু চেয়ে রহে।
দেখি পূত মুখ—সেথা হুতভুক দ্রুত ধকধকে হরি,
আপনার তেজে তুমি জগতে যে তুলিছ তপ্ত করি। ১৯
দশন-করাল ভীষণ ভয়াল মুখমণ্ডল যত
করি বিলোকন জ্বলিছে কেমন কাল-অনলের মত।

কোথা কোন্ দিক কিছু নাহি ঠিক পরাণ কেমন করে,
জগন্নিবাস, দেবদেব আজ প্রসন্ন হন মোরে। ২৫

* * *

যেমতি নদীর অম্বু অধীর, প্রবল প্রবাহ বুকে,
কুলু কলকল ছুটিছে কেবল সমুদ্র অভিমুখে—
যেন তারি প্রায় ঐ দেখা যায় সারা পৃথিবীর বীর
পড়িতেছে ঢুকে জ্বলন্ত মুখে একান্ত অস্থির। ২৮
"যথা প্রদীপ্ত হুতাশে ক্ষিপ্ত পতঙ্গ শত শত
ছুটি আসি পড়ে মৃত্যুর তরে পাখা ওড়ে পতপত,
তাহারি মতন লভিতে মরণ পশিছে বিশ্বলোক
তোমারি বদন বিবরে, কেমন বিষম পতন ঝোঁক। ২৯
"অনল-শ্বসনা লেলিহা রসনা মেলিয়া সকল দিশে,
তোমার বদন বিশ্বের জন নিঃশেষে গরাসিছে।
নিখিল জগৎ তোমার মহৎ তেজে যে উঠিল ভরি,
উগ্র ঝলক সমগ্র লোক দগ্ধি ছুটিল, হরি!" ৩৩

* * *

শ্রীভগবান—

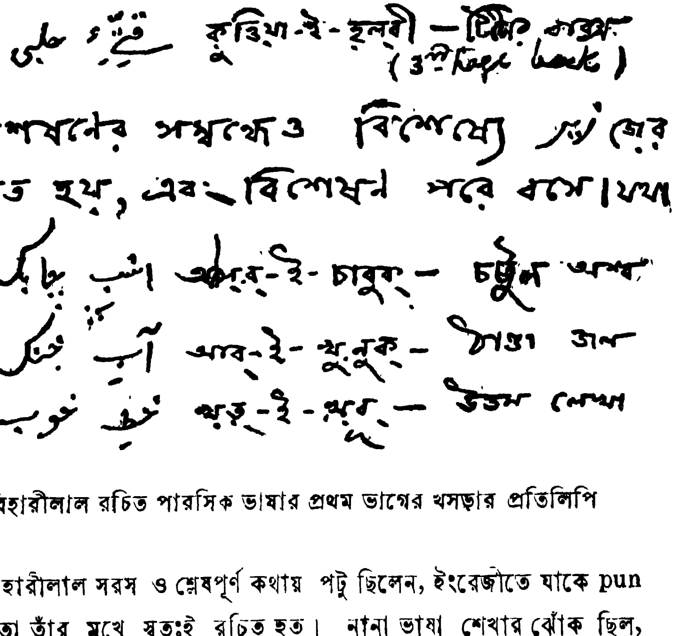
বিশ্ব বিশাল গ্রাসি আমি কাল স্বয়ং ভয়ঙ্কর—
নিখিল-বিনাশ-সাধনে আয়াস করিনু অনন্তর।
তুমি নাহি মারো, তথাপি কাহারো নিস্তার নাহি আজি,
রয়েছে যদিও প্রতিপক্ষীয় যতেক যোদ্ধা সাজি! ৩২
তুমি উঠি তবে খ্যাতি লুটি লবে সমরে সমুদ্যত,
অরাতি পুঞ্জ জিনিয়া ভুঞ্জ রাজ্য সমুন্নত!
আমিই সবারে বধিয়াছি আগে কেহই রহেনি বাঁচি—
নিমিত্তার্থ কেবলমাত্র হও হে সব্যসাচী! ৩৩

প্রতি ছত্রে দুটি থেকে চারটি পর্যন্ত মিল আছে, এবং সমসাময়িক বিশিষ্ট সমালোচকেরা এ অনুবাদকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

ছন্দ ও ধ্বনির মোহে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে বার বার এ সব অনুবাদ শুনতে আসতেন, এবং বিহারীলালও অক্লান্তভাবে আবৃত্তি করে যেতেন। স্কুল জীবনে এ সব আমারও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

এর পর ফার্সি শিখে এবং তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখে শেখ সাদীর পন্দনামা কবিতায় অনুবাদ করেন। এক পৃষ্ঠায় মূল পারসিক, বিপরীত পৃষ্ঠায় অনুবাদ 'পন্দনামা বা নীতিপত্র' এই নামে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদী প্রেস থেকে আমার তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়।

'নীতিপত্র' এই নামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৪ সালে এই প্রস্তাব নিয়েই তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করেছিলাম।



বিহারীলাল রচিত পারসিক ভাষার প্রথম ভাগের খসড়ার প্রতিলিপি

বিহারীলাল সরস ও শ্লেষপূর্ণ কথায় পটু ছিলেন, ইংরেজীতে যাকে pun বলে তা তাঁর মুখে স্বতঃই রচিত হত। নানা ভাষা শেখার ঝোঁক ছিল, এবং পারসিক ভাষা আয়ত্ত করে ঐ ভাষাতে এম-এ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেছিলেন। বাঙালীদের জন্য পারসিক প্রথম ভাগ রচনা করেছিলেন, যে খসড়া তৈরি হয়েছিল, তার প্রাথমিক পরিবর্তন, পরিবর্জন ইত্যাদিতে কাটাকুটি অবস্থায় এখনও আছে।

১৪-৪-৬৬

রাজশেখর বসু

১৮৮০—১৯৬০

রাজশেখর বসু সম্পর্কে কিছু লিখতে বসলেই কোন্ প্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ করব, এ হয় একটা সমস্যা। একদিকে সাহিত্যকর্মে রঙ্গ, ব্যঙ্গ, পরিহাস, অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব শান্ত প্রকৃতি, অনাড়ম্বর জীবন, অপূর্ব নিয়মনিষ্ঠা। আরও একদিকে, স্নেহপ্রবণতা এবং বারো-তেরোটি পোষা বিড়াল। আরও একটা দিকে রামায়ণ, মহাভারত ও অভিধান।

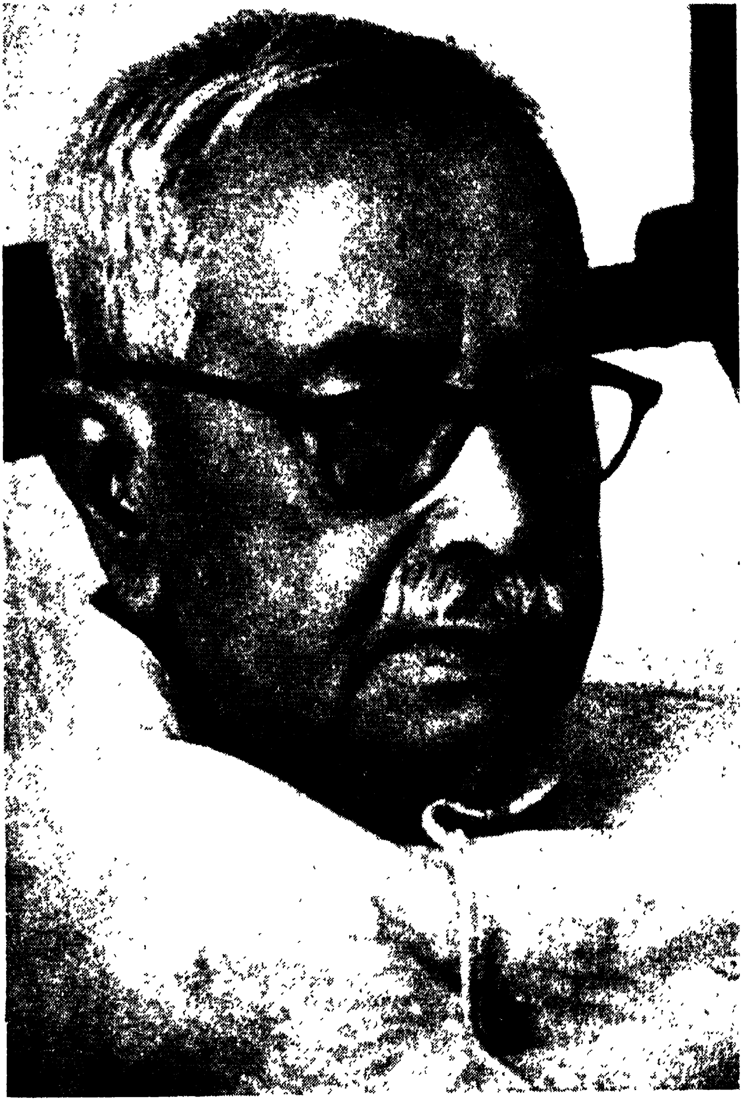
যিনি কলমে কৌতুক সৃষ্টি করেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পক্ষে ধীরস্থির এবং গম্ভীর হতে বাধা নেই। রাজশেখরও তাই ছিলেন। কৌতুক কথা তিনি আবেগ উচ্ছ্বাসহীন, সংযত, ন্যূনতম কথায় বলতেন। আড্ডাবাজ হয়েও তাঁর প্রধান ভূমিকা শ্রোতারূপে, বক্তারূপে দ্বিতীয় ভূমিকা।

নিজে না হেসে অন্যকে হাসানোর বহু দৃষ্টান্ত আছে সংসারে। আর এমন চরিত্র অস্বাভাবিক নয় বলেই সাহিত্যে ফিল্মে বা নাটকে অনেক দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজে না হেসে গম্ভীরভাবে কৌতুক করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

আমি সচেতন রসস্রষ্টাদের কথাই বলছি। আর এক রকম মানুষ দেখা যায় যারা জানে না যে অন্য লোকে তাদের আচরণ দেখে কৌতুক অনুভব করছে। এদের সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নেই। এমন মানুষ কৌতুক হাস্যের উপাদান।

ফরাসী ভাষায় sangfroid (সাঁফ্রোয়া) নামক একটি কথা আছে যা ইংরেজী ভাষাতেও স্থান পেয়েছে। মানসিক স্থিরতা, বিপদে সঙ্কটে বিচলিত না হওয়া, সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকা—ইত্যাদিরূপ মানসিক অবস্থাকে ঐ নামে অভিহিত করা হয়। এই সাঁফ্রোয়া থাকলেই কিন্তু হৃদয়-হীনতা বোঝায় না। এটি মনের পৃথক বৃত্তি। রাজশেখরের সাঁফ্রোয়া ছিল এবং তিনি হৃদয়বান ছিলেন। তাঁর কাছাকাছি এসে এটি আমি নিজে অনুভব করেছি।

গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, আনন্দীবাঈ প্রভৃতি বইতে রাজশেখর প্রচুর হাসির উপাদান জুগিয়েছেন, কিন্তু কোথাও উচ্ছ্বাস নেই, বাড়াবাড়ি নেই। কয়েকটি গল্পে, হাস্যরস ভেদ করে ব্যঙ্গের চেহারাটাও বেরিয়ে পড়েছে,



রাজশেখর বসু

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৬০

কিন্তু তবু তার পিছনে হিংস্রতার স্পষ্ট প্রেরণা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ প্রসঙ্গত বা ইনসিডেনটাল। অবশ্য সাধারণভাবে বলতে গেলে একটুখানি ব্যঙ্গের খোঁচা না থাকলে হাস্যরসও অনেক সময় জমে না। কিন্তু ব্যঙ্গের খোঁচাটা প্রধান না হলে, এবং আক্রান্তের মুখোশ খুলে দিয়ে তাকে শুধু উপহাসের পাত্র নয়, তার বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগাতে না পারলে অনেকের মতে ব্যঙ্গ সার্থক হয় না। 'ম্যালিস্' থেকে জাত না হলে তা স্যাটায়ার হয় না, অনেক ইংরেজ সাহিত্য-বিচারকের এটাই অভিমত।

এই বিচারে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের মধ্যে যে সব চরিত্র আমদানি করা হয়েছে এবং তারা সবাই মিলে প্রতারণার যে খেলা দেখিয়েছে, তা পড়ার পর তাদের কারো উপরেই তো হিংসা জাগে না, শুধু কৌতুক জাগে। এমন কি গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া—রাম-প্রতারক হওয়া সত্ত্বেও, তার চরিত্রের কৌতুককর দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে। অন্য কথায়, সবাইকে নিয়েই ব্যঙ্গের কাঠামোয় একটি হাসির গল্প গড়ে তোলা হয়েছে। গণ্ডেরিরাম যে, সকলের উপর টেক্কা মেরে সরে পড়ল, তাতেও তার উপর কেউ চটে না, কিন্তু তার মুখের কথাগুলি কৌতুকের উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে জেগে থাকে। এবং পড়বার সময় যত হাসা যায়, অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে মনের হিংসা তত দূর হয়ে যায়। অতএব শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড নামক গল্পে কোনো বাণী বা মেসেজ নেই, কোনো ছোট গল্পেই থাকে না, যদি না তা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হয়। এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র বাস্তব এবং জীবন্ত, তারা শুধু প্রতারক, এইমাত্র। ছোট গল্প রচনাই এ গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং কৌতুক সৃষ্টির জন্যই কয়েকজন বিশেষ চরিত্রের মানুষকে গল্পের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

জীবনের সকল বিভাগের মানুষই রাজশেখরের উপকরণ, এবং প্রয়োজন-বোধে ভৌতিক জগৎ থেকে, পৌরাণিক জগৎ থেকে, এমন কি পশুজগৎ থেকেও, তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। শেষোক্ত দৃষ্টান্ত: লম্বকর্ণ, শিবলাল, হনুমান।

ব্যঙ্গসাহিত্যে কিছু কৌতুকরস থাকা ভাল, যদিও আবশ্যিক নয়, এবং হাস্যরসাত্মক গল্পে বা কৌতুক গল্পে কিছু ব্যঙ্গের খোঁচা থাকা ভাল। অর্থাৎ ব্যঙ্গকে হাস্যরস দিয়ে চেপে দিলে হাস্যরসাত্মক রচনা বেশি উপভোগ্য হয় এবং ব্যঙ্গ রচনায় কিছু কৌতুক মিশিয়ে দিলে তা বেশি উপভোগ্য হয়।

কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কতখানি তার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা তৈরি করা কঠিন।

আমি এই দুইয়ের কিছু ধারণা করার চেষ্টা করছি। সংজ্ঞা যখন নির্দিষ্ট নেই, এবং গল্প বা উপন্যাস বা প্রবন্ধ অথবা কবিতার যেমন নির্দিষ্ট চেহারা আছে, ব্যঙ্গের বাহনের কোনো একটি চেহারা নেই বলে, ধারণাও খুব সহজ হবে না। আমি কিন্তু ব্যঙ্গ অর্থে ব্যঙ্গ সাহিত্য বোঝাচ্ছি। এবং বিশেষভাবে রাজশেখরের গল্পসম্পর্কেই।

বলেছি দুটোতেই দুটো জিনিস থাকবে, কিন্তু কোন্‌টা কত মাত্রায় থাকবে তা ভেবে দেখা যাক। রঙ্গব্যঙ্গ সব মিলিয়ে ধরা যাক—এর এক চরম প্রান্তে জোর করে হাসানো, আর এক চরম প্রান্তে লাঠির সাহায্যে অন্যায়কে আক্রমণ করা। একটি কৌতুক, অন্যটি ব্যঙ্গ,—কিন্তু এর কোনোটাই ব্যঙ্গ সাহিত্য নয়। এর মধ্যস্থ যে স্থান, অর্থাৎ যে স্থানে আমরা হাস্যরসাত্মক সাহিত্য এবং ব্যঙ্গ সাহিত্যকে স্থাপন করতে পারি, সেই স্থানকে দশ ভাগে ভাগ করা যাক। এর প্রথম ভাগ থেকে পঞ্চম ভাগ পর্যন্ত হাস্যরসাত্মক সাহিত্য। তারপর থেকে অর্থাৎ ষষ্ঠভাগ থেকে দশম পর্যন্ত ব্যঙ্গ সাহিত্য। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে হাস্যরস বেশি উপভোগ্য, এবং ষষ্ঠ এবং সপ্তম ভাগে ব্যঙ্গ বেশি উপভোগ্য। তারপর থেকে ব্যঙ্গ ক্রমে অত্যন্ত কষায় এবং শেষ ধাপে তিক্ত হয়ে ওঠে।

রাজশেখর বসুর প্রায় সকল গল্পই এই ছকের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের পঞ্চম স্থান। বিরিঞ্চিবাবার স্থান চতুর্থ। অার্থৎ ব্যঙ্গ আরও কম এবং হাসি আরও বেশি। যেমন চিকিৎসা সংকটের স্থান তৃতীয়। এভাবে ছকে ফেলা অবশ্যই অন্যায়, কিন্তু এভাবে না হলে মোটামুটি আমার বক্তব্য স্পষ্ট হত না বলে মনে হয়েছে।

সমাজের যে সব দুর্নীতি বা অসঙ্গতিতে মনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে স্যাটায়ারের জন্ম সে উত্তেজনা রাজশেখরের খুব চাপা ছিল। তাই কলমেও উত্তেজক কিছু সৃষ্টি হয় নি। তিনি খুব ধীরস্থিরভাবে সব লক্ষ্য করেছেন, মনে মনে কৌতুক অনুভব করেছেন এবং তীব্র বিদ্রূপের বিষয়কেও কৌতুকে মুড়ে গল্প রচনা করেছেন। তাঁর মনোজগতে যত ঝড়ই উঠুক, তা অতি গভীর দেশে চাপা থাকত। বাইরে যেটুকু প্রকাশ, তা শান্ত, সংযত, এবং কাউকে আক্রমণ করা বা আঘাত দেবার জন্য তিনি কলম ধরেন নি। তাঁর

মানসধর্ম বিশ্লেষণ করলেও বিজ্ঞান ও সাহিত্য পঞ্চাশ-পঞ্চাশ অনুপাতে পাওয়া যাবে। সমাজকে বা মানুষকে তিনি বিজ্ঞানীর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন, এবং সেই দেখাকে তিনি রসসমৃদ্ধ করেছেন তাঁর শিল্পীর মন দিয়ে। এর একটি প্রমাণ, রাজশেখরকে নিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মধুর কলহ হয়েছিল তার মধ্যে। প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তিনি একজন বিজ্ঞানীকে উস্কানি দিয়ে সাহিত্যের সীমানায় আটকে রাখার চেষ্টা করছেন কেন, এবং রবীন্দ্রনাথ পাল্টা অভিযোগ করেছিলেন তিনি একজন সাহিত্যিককে বিজ্ঞানের মধ্যে আটকে রাখছেন কেন।—এটি একটি বড় প্রমাণ যে রাজশেখর দুদিকে দ্বারাই সমান আকর্ষণীয় অর্থাৎ আকর্ষণের উপযুক্ত ছিলেন।

রাজশেখর কোনো বিষয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হতে পারতেন না। এটি তাঁর স্বভাবের বিরোধী ছিল। এ কথাটা বার বার তাঁর সম্পর্কে বলার দরকার আছে, কারণ তাঁকে অনেকে স্যাটায়ারিস্ট রূপে বর্ণনা করেন। ঐ এক কথায় তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ পায় না। তাঁর হাতে স্যাটায়ারিস্টের চাবুক ছিল না, ছিল ইক্ষুদণ্ড, তা দিয়ে আঘাতের ভঙ্গিতে তার রসটাই তাঁর পরিবেশনের লক্ষ্য ছিল। কাঠখড় এবং একমেটে পর্যন্ত স্যাটায়ার, দোমেটে অবস্থা এবং রং লাগানো সবই হাস্যরসের। কখনো কদাচিৎ বিশুদ্ধ স্যাটায়ারও দেখা দিয়েছে তাঁর হাতে।

রাজশেখরের অনেক গল্প আড্ডার আলোচনা থেকে আরম্ভ। তিনি নিজে এককালে আড্ডাধারী ছিলেন, সেই আড্ডার স্মৃতি থেকেই অনেক কল্পনার জন্ম হয়েছে। এই আড্ডায় আমি ১৯৩৩ সনে একবার মাত্র গিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনের আড্ডায় একজনমাত্র বক্তা ছিলেন—গিরীন্দ্রশেখর বসু। তিনি সেদিন তাঁর লেখা মনঃসমীক্ষা বিষয়ে একটি রচনা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন রাজশেখর ছিলেন না।

এইখানকার এই ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের বসুভবনের আড্ডা বিষয়ে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী লিখছেন—

"একদিন সে [শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন] তার কাজ করবার ঘরের পাশেই ওখানকার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।......এই আড্ডায় অনেক গুণী-পণ্ডিত বিদগ্ধ লোকের আসা-যাওয়া

চলত। যজ্ঞেশ্বর [অর্থাৎ এই যজ্ঞের প্রধান] ছিলেন রাজশেখরবাবুর ছোট ভাই,, গিরীন্দ্রশেখর বসু। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলেখক শশিশেখর বসু একজন নিয়মিত আড্ডাধারী ছিলেন। তাঁর গল্প টীকা-টিপ্পনী এবং মন্তব্য ছিল অরুচি রুগীরও রুচিকারক। আমি যে দিন প্রথম সে আড্ডায় প্রবেশ করলুম সেদিন রাজশেখরবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।……দুই একদিন যেতে না যেতেই…দেখা পেলুম।…প্রথম দৃষ্টিতে রাজশেখরবাবুকে যত গম্ভীর লোক বলে মনে করেছিলুম, দু এক দিনের পরিচয়েই বুঝলুম তাঁর বাইরেটা যতই গাম্ভীর্যের বর্মে ঢাকা থাকুক না কেন, ভেতরে রসের প্রস্রবণ বয়ে চলেছে।…আড্ডায় হাসির ফোয়ারা ছুটত। তার উপর বড়দা অর্থাৎ শশিশেখরের টিপ্পনীর রসান চলত।…সব সময় শ্লীলতার গণ্ডি মেনে চলত না। রাজশেখরবাবু খোলাখুলিভাবে যোগ না দিলেও বেশ উপভোগ করতেন বলে মনে হত।" (যুগান্তর সাময়িকী, ৮ই মে, ১৯৬০)।

এই হল রাজশেখরের গল্পের আড্ডা-পটের আকর। তিনি হিংস্র হতে পারেন নি, এবং তাঁর এই অহিংস স্বভাবও তাঁর সহজাত। তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে শশিশেখর লিখছেন—"রাজশেখর বন্দুক নিয়ে পাখী শিকার করতে পারত না, গাছের ফল লক্ষ্য করে গুলি চালাত। নিরামিষ খেত ছেলেবেলা থেকে। কলে ইঁদুর পড়লে ছেড়ে দিত।"

তা হলে এ পর্যন্ত রাজশেখরের জীবনের দুটি ঘটনা পাচ্ছি,—অহিংসা + আড্ডা। এর পরে আরও প্লাস্ চিহ্ন বাড়বে।

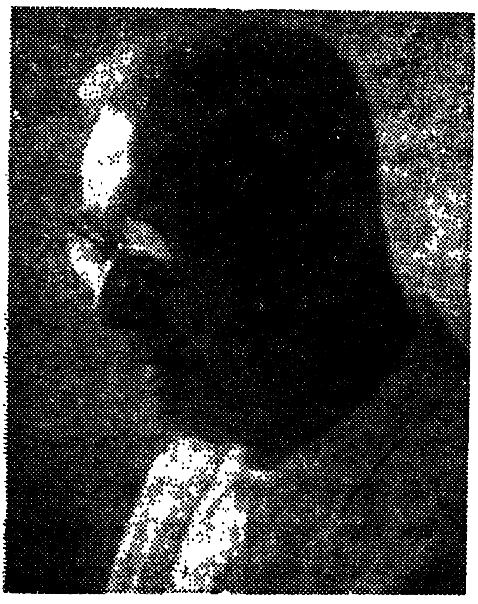
আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল ১৯৫৩ সনে, প্রথম। তার পর থেকে ধীরে ধীরে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে থাকে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে পরিচয় অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেছিল তাঁর বড়দা শশিশেখরের আগ্রহে। শশিশেখরের চরিত্র রাজশেখরের কিছু বিপরীত। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আবেগপ্রবণ এবং তাঁর এমন খোলা মন খোলা কথা যে, লেখার সময়েও তা ভুলে যেতেন। তিনি এমনই সরলপ্রাণ ছিলেন যে, লেখার সময় শালীনতার সীমা কোথায় ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারতেন না। এ বিষয়ে তিনি আমার শাসন মেনে চলতেন। এক সময় কাতর ভাবে আমাকে লিখেছিলেন, "ভাই একটু লাইসেন্স না দিলে যে বুড়োর নাম ডুববে!"

এজন্য আমাকে লেখা পাঠানোর সময় মাঝে মাঝে লিখতেন, এটি একদম নিরামিষ, তাই তোমাকে পাঠালাম। ১৯৫৪ সালের ২০শে জুলাই তারিখে

লিখছেন—"পত্নীপ্রেম" নিরামিষ নয় বলে তোমাকে দিই নি। যখন পড়বে তোমার নিজের ভাল লাগবে, বলবে, "বা রে বুড়ো!"—পত্নীপ্রেম তিনি সচিত্র ভারতে দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে।

তাঁর অনেক মজার মজার চিঠি আমার কাছে আছে, এবং উপরের যে সামান্য দু এক লাইন উদ্ধৃত করলাম, এতেই তাঁর রসিক মন এবং সরলতার পরিচয় পাওয়া যাবে। শশিশেখরকে আমি ৭৮ বছর বয়সে বংলা লেখায় প্রবৃত্ত করি। তাঁর প্রায় সঙ্গীহীন জীবনে মস্ত বড় একটা শূন্যস্থান পূরণের



শশীশেখর বসু

উপায় পেয়েছিলেন বাংলা লেখায় উৎসাহ পেয়ে। তিনি আমাকে একনা মস্ত বড় একটা আশ্রয় ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। শশিশেখরকে অনুরোধ করেই রাজশেখরের বাল্যকাল লিখিয়েছিলাম। এবং তাঁর নিজের সম্পর্কেও লিখিয়েছিলাম। কিন্তু এই শেষেরটি তাঁর ইচ্ছায় এবং অনুমতিক্রমে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর নামে ছাপা হয়। শশিশেখর ইংরেজী জার্নালিজমে সে যুগে খুব খ্যাত ছিলেন, কাগজে তাঁর মতো হিউমার তখন বাঙালী আর কেউ লিখতেন না। তিনি নিজের সম্পর্কে লিখছেন—

"শশিশেখর বলেন আমি সাহিত্যিক নই···অথচ শোনা যায় তিনি জয়দেব চণ্ডীদাস শেক্সপীয়র ইত্যাদি অনর্গল আউড়ে যান। তিনি বলেন, আমি সাংবাদিক নই, একবার মাত্র একটি ডেলি পেপার এডিট করেছিলাম, কিংবা নিউজ সিণ্ডিকেট খুলেছিলাম বলে আমাকে সাংবাদিক বলতে পারেন। তেমন তো আমি নৌকার ব্যবসা করেছিলাম, তা বলে কি আমি মাঝি?"

শশিশেখর থাকতেন বিবেকানন্দ রোডে এবং আমি থাকতাম কৈলাস বসু স্ট্রীটে। আমাদের ব্যবধান ছিল পাঁচ মিনিটের। অতএব আমি যেমন তাঁর কাছে, তিনিও তেমনি আমার কাছে আসতেন। রাজশেখর সপ্তাহে প্রায় একবার আসতেন বড়দাকে দেখতে। এই শশিশেখরের এমন উল্লাস আমি দেখেছি যা রাজশেখরের বিপরীত বলা চলে। আনন্দে এমন ব্যাকুল হওয়া তাঁর বয়সের পক্ষে ক্ষতিকরও ছিল।

রাজশেখর বাইরে সংযত এবং আবেগহীন হলেও তাঁর অন্তর-প্রদেশ স্নেহে বিগলিত ছিল। শশিশেখরের সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতা না হলে রাজশেখরের অন্তরের এই পরিচয়টা আমার কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে যেত।

শশিশেখরের সঙ্গে ১৯৫৩ সালের ২৮শে অগস্ট তারিখে রাজশেখর সন্দর্শনে যাত্রা করেছিলাম। 'দ্বিতীয় স্মৃতি'তে এই ভাবে আরম্ভ করেছি এই সাক্ষাতের কথা—

একটা গল্পে পড়েছিলাম এক ভদ্রলোক কয়েকজন লোককে উপদেশ দিচ্ছিলেন—সব কাজেই নিচে থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হয়, এক লাফে উপরে ওঠা যায় না। জীবনে সফল হতে হলে নিচে থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে।

একজন শ্রোতা তা শুনে বলল, "আমার দ্বারা তা হবে না, মশায়।"

"কেন হবে না?"

"হবে না, কারণ আমি কুয়ো খুঁড়ি।"

এই উপমাটা দিয়েছিলাম, কারণ রাজশেখরের কাছে পৌঁছতে আমাকে উপর থেকে আরম্ভ করতে হয়েছিল—শশিশেখর থেকে।

সেদিন সেই শান্ত সৌম্য মূর্তিটির সামনে বসে এতদিনের দেখার ইচ্ছা পূর্ণ করলাম। বৈঠকখানা ঘরের সেক্রেটারিয়েট টেবল, রাজশেখরের বিপরীত দিকে আমি, এবং আমার ডান ধারে শশিশেখর। তিনি রাজশেখরের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে খুব গর্বিতভাবে বসে রইলেন। অত্যন্ত

অসুস্থ অবস্থায় তাঁর এতদূরে আসাই অন্যায় হয়েছিল, তাঁর তখন হাইপারটেনশন চলছে, মাথা একটু একটু ঘুরছে, কিন্তু আগেই বলেছি তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, এবং এই পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজটিকে তিনি একটি বড় কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। অতএব নিজের পক্ষে এত ঝুঁকি নেওয়ার কথা আর তখন কে ভাবে!

রাজশেখর সম্পর্কে সেই মুহূর্তের বর্ণনা আমি একটুখানি 'দ্বিতীয় স্মৃতি' থেকে উদ্ধৃত করছি—

> "তাঁর মূর্তি ছাপা ছবিতে ভিন্ন আর দেখি নি। কিন্তু তবু তাঁকে আমি দেখেছি। দেখেছি শ্যামানন্দের ভিতরে, গণ্ডেরিরামের ভিতরে। জগদ্‌গুরু, নাদু মল্লিক, আই কেদার চাটুজ্জে নো জু গার্ডেন, জাবালী, নন্দবাবু ইত্যাদি সবার মধ্যেই দেখেছি।"

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাঁর সেই সর্বভুক ছাগলটার ভিতরেও দেখেছি। কারণ, "লব্বুই টাকার নোট" খাওয়া ছাগল তাঁর কৌতুকেরই একটি রূপ, যদিও সেটা ছাগ-রূপ, কিন্তু তবু সে তাঁর মানসবাসী, অতএব তার মধ্যেও তিনি অবশ্যই আছেন। শিবলালের ভিতরেও আছেন।

এর কয়েকদিন আগে ছাপবার জন্য তাঁর কাছ থেকে একটি গল্প পেয়েছি —নাম, নিকষিত হেম। তিনি বললেন, ঐ গল্পটা অন্য একখানা কাগজের জন্য লেখা ছিল, আপনি পেয়ে গেলেন। আমি বললাম, আমি যখন আদায় করেছি তখন সমস্ত পাপ আমার—সমস্ত পাপ কাসেম আলির, আপনি শুধু দিয়ে খালাস।

রাজশেখর শশিশেখরের লেখার খুব প্রশংসা করলেন, তাঁর লেখা 'ম্যারিজ অভ এলিফ্যান্টস'কে খুবই সুন্দর বললেন, এবং বললেন, আমিই ওটা অনুবাদ করব ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন দাদাই পারবেন।—এ কথা বললেন এজন্য যে দাদা এখন সুন্দর বাংলা লেখা আরম্ভ করেছেন।

আমি ঐ ইংরেজী লেখাটা দেখি নি। অনুবাদও হয় নি, কারণ শশিশেখর পাটনার বিহার হেরাল্ডের নিয়মিত লেখার উপরেও বাংলা ভাষায় এত স্মৃতিকথা লিখতে আরম্ভ করলেন যে, অনুবাদের আর সময় পেলেন না। মণি সমাদ্দার যখন বিহার হেরালডের সম্পাদক তখন আমি ঐ সাপ্তাহিকখানা নিয়মিত পড়তাম। ঐ কাগজেই ছদ্মনামধারী শশিশেখরের লেখায় আকৃষ্ট হয়ে মণির কাছ থেকে জানতে পারি আসল লোকটি কে, এবং ঠিকানা পেয়ে

আরও চমৎকৃত যে তিনি আমার বাসস্থান থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট দূরে থা কন—বিবেকানন্দ রোডে।

এই ১৯৫৫-তেই 'কথা সাহিত্য' নামক মাসিকের বিশেষ সংখ্যা বেরোয়, সেটি রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা। তাতে আমার একটি রচনা ছিল। আমি রাজশেখর সম্পর্কে কোনো প্রবন্ধ বা অন্য কোনো কথা লিখি নি, শুধু তাঁর 'মহাবিদ্যা' নামক নাটিকা আকারের গল্পের জগদগুরুর উদ্দেশে একটি নিবেদন জানিয়েছিলাম। রাজশেখরের সে লেখাটি ভাল লেগেছে বললেন, এবং তার সঙ্গে যোগ করলেন "আমার ঐ লেখাটি কিছু দুর্বল ছিল, আপনি ওটার মর্যাদা দিয়েছেন।"

"ঐ লেখাটি দুর্বল ছিল"—এ কথা কেন বললেন, পরে ভেবে দেখেছি। কারণ গল্পরূপে একটু "দুর্বল" হলেও আমি ওটা স্যাটায়ার হিসাবে পড়েছি এবং খুব ভাল মনে হয়েছে এবং রাজশেখরের এই রচনাকে আমি স্যাটায়ার বলতে রাজি আছি। তাঁর অন্যান্য অনেক গল্পে তিনি প্রায় সব সময়েই আড়ালে থাকেন, শুধু এই জাতীয় দুচারটি গল্পে তাঁর নিজের কথা অর্থাৎ নিজের মনের কথা কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ গল্পের কথাগুলো জগদ্‌গুরুর মুখে বসালেও, তাতে মহাবিদ্যা, অথবা প্রতারণা-বিদ্যার বিরুদ্ধে কিছু বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে।

একটি কাহিনী বলি। ১৯৬০-এর কোনো এক অপরাহ্ণে ইউরোপে শিক্ষা-প্রাপ্ত এক তরুণ ডেয়ারি-বিশেষজ্ঞ ও তার এক লেখক বন্ধু রাজশেখরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে ডেয়ারি-বিশেষজ্ঞ বলেছিল, "এদেশে এমন অনেক গোরু আছে যারা কোনো ব্যবহারে লাগে না, তাদের মেরে ফেলা উচিত।" লেখক বন্ধু যোগ করল—"মেরে ফেলা উচিত এবং তার মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহার করলে খাদ্যসমস্যাও কিছু দূর হতে পারে।" তা শুনে রাজশেখর গম্ভীরভাবে বললেন, "এদেশে অনেক মানুষও এমন আছে, যাদের মেরে ফেলা উচিত এবং তাদের মাংস আমাদের খাওয়া উচিত।"

এমন তিক্ত মন্তব্য রাজশেখর কোনো লেখায় দূরে থাক, মুখেও আর কখনো বলেছেন বলে মনে হয় না।—এ ঘটনাটি আমি নিজে জানি, তাই প্রকাশ করলাম।

রাজশেখর সাধারণত অন্তরালে থাকাটাই পছন্দ করতেন, লেখারও অন্তরালে। সভা সমিতিতে তাঁকে কেউ টানাটানি করে পায় নি। তিনি মনোজগতেই নিরালায় বাস বেশি ভালবাসতেন। একবার এক সভায় প্রধান

অতিথি রূপে চুপচাপ বসে উঠে এসেছিলেন। এটি বনফুলের মুখে শোনা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রাজশেখর বসুর মৃত্যুর পরে 'দেশ' সাপ্তাহিকে একটি ছোট্ট রচনা লিখেছিলেন তাঁর সম্পর্কে। তাতে রাজশেখরের নিয়মনিষ্ঠা সম্পর্কে দেখা যায়, তিনি লিখছেন—

"সন্নিহিত প্রতিবেশী আমরা। কটা বেজেছে যদি ঘড়ি মেলাতে চাও, রেডিও খুলে···মেলাবার দরকার নেই, রাজশেখরবাবুকে দেখ। দেখ, উনি বাজারে বেরুলেন কিনা। তা হলে সাতটা। নিচের বৈঠকখানা থেকে উঠে গেলেন কিনা উপরে। তা হলে নটা। খেতে বসেছেন নাকি? তা হলে এগারোটা।"

এই নিয়মানুবর্তিতা তাঁর পরিচ্ছন্নতার অঙ্গ। সব কাজ যথাযথ হওয়া চাই। আমার কাছে তাঁর হাতের লেখা গল্পের পাণ্ডুলিপি আছে সাতখানা। পরিচ্ছন্ন লেখা। কাটাকুটি নেই। শব্দ বদলাবার দরকার হলে সেই মাপের কাগজে লিখে বাতিল শব্দের উপর আঠা দিয়ে এঁটে দিতেন। হাতের লেখা সেকেলে তালপাতা পুঁথির লেখার ধরনে। কিন্তু আরও পরিচ্ছন্ন। পাণ্ডুলিপি ব্লক করে ছাপা চলে, এমন সুন্দর। কাটাকুটিতে তাঁর সৌন্দর্য-চেতনায় ঘা লাগে।

নিজে কালি তৈরি করে তাই লেখায় ব্যবহার করতেন, আমাকে বলেছিলেন। তিনি নিজ হাতে খাম তৈরি করতেন, একদিকে-ছাপা বুলেটিন অথবা ব্যবহৃত খাম উল্টো করে।

তাঁর হাতের লেখার আকর্ষণ গুণীমহলে কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে—১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে রচিত জয়ন্তী উৎসবের জন্য পরামর্শ বৈঠকের নিমন্ত্রণ লিপিটি রাজশেখরের হাতের লেখা ব্লক করে ছাপা। নিচে স্বাক্ষরকারীদের নাম আজ ইতিহাসের পাতায়। যথা—জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দু'ডজন বিশিষ্ট নাগরিক। তার মধ্যে হস্তলিপি শিল্পীটির নাম অনুপস্থিত। এখানেও রাজশেখর স্বেচ্ছায় অন্তরালে রইলেন শুধু লিপিকার হিসাবে, কেউ জানল না, কার লেখা।

বাল্যকালের একটি ছবি দেখা যাক। শশিশেখর "রাজশেখরের বাল্যকাল" প্রবন্ধে লিখছেন "আমরা ভাই ভগ্নী ও বাঙালী ঝি রাই, চণ্ডী ও গোবিন্দ বামনীকে নিয়ে থিয়েটার করতাম। রাজশেখর রামতারণের দোকান থেকে বাংলা ছয় আনা দামের নাটক পছন্দ করে আনত, ও নিজে

পার্ট না নিয়ে ডিরেকশন দিত। আমি কৈকেয়ী সাজতাম, রাই দশরথ সেজে আমার মান ভাঙাত।"

রাজশেখর নিজে পার্ট নিতেন না। শুধু নির্দেশ দিতেন। বাল্যকালেও অন্তরালে থাকা পছন্দ করতেন। সমস্ত জীবন তাই করেছেন তাই তাঁর গল্পে তাঁর নিজের কোনো কথা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে সেজন্য সতর্ক থাকতেন, যদিও সব সময় পারতেন না।

বিশ্লেষণী স্বভাবের দরুন রাজশেখর কি রকম সংযত ভাষায় এবং ধীর-স্থির ভঙ্গিতে কৌতুক সৃষ্টি করতে পারতেন তার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'তিলোত্তমা' গল্প। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং রসসাহিত্য গড়ে তোলার কাজ যেন যুগপৎ ঘটছে। সিদ্ধিনাথ প্রেমে পড়েছিল তিলোত্তমা নামক অভিনেত্রীর। এ বিষয়ে রামদাস কাব্যসাংখ্য-বেদান্তচুঞ্চু নামক এক পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা করার শেষে অব্যর্থ ফল ফলল। প্রথমে তিনি একটি গল্প বললেন, সেই গল্প এই—

> "ইন্দ্র বললেন, তিলোত্তমা, আমার সঙ্গে অমরাবতীতে চল, শচীকে বরখাস্ত করে তোমাকেই ইন্দ্রাণী করব। বিষ্ণু বললেন, খবরদার, তিলোত্তমা বৈকুণ্ঠে যাবে, আমার পদসেবা করবে। মহেশ্বর বললেন, ওহে তোমার তো বিস্তর সেবাদাসী আছে···পার্বতীর একজন ঝি দরকার। তখন ব্রহ্মা বেগতিক দেখে বললেন, তিলোত্তমে, স্ফুট স্ফুট স্ফোটয় স্ফোটয়। তিলোত্তমা দড়াম করে ফেটে গেল অ্যাটম বোমার মতন। তার সমস্ত সত্তা বিশ্লিষ্ট হল, যে উপাদান যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল। কান্তি বিদ্যুল্লতায়, কেশরাশি মেঘমালায়···নিতম্ব করিকুম্ভে, উরু কদলীকাণ্ডে। পড়ে রইল শুধু একটু রেডিওঅ্যাকটিভ ধোঁয়া।"

চরিত্র বিশ্লেষণ নয়, দেহসমেত সমস্ত মানুষটিকেই বিশ্লেষণ, একেবারে ছুরি হাতে শবব্যবচ্ছেদ! সিদ্ধিনাথের মোহমুক্তি ঘটেছিল নিতান্ত নির্বোধ বলেই। কিন্তু যাক সে কথা।

রাজশেখর যে ভাল ছড়াও লিখতেন—হাসির ছড়া—তা সম্ভবত দু চারটিতেই শেষ হয়ে গেছে। তাঁর দক্ষিণ রায় ক্ল্যাসিক। আর একটি অতি উৎকৃষ্ট ছড়া চন্দ্র-সূর্য বন্দনা। ছোটদের বড়দের সবারই জন্য।

"চাঁদের জয় হোক
পরোপকারী ভদ্রলোক,
আস্ত খেঁদো ফালি সব অবস্থাতে

যথাসাধ্য লণ্ঠনের কাজ করে রাতে।
সূয্যিকে নমস্কার,
এই দেবতাটি মহা ফাঁকিদার,
চোপর রাত দেখা নেই মোটে
দিনের বেলা রূপ দেখাতে ওঠে,
যখন তার কিচ্ছু দরকার নেই—
আরে, আলো তো ভর দিন থাকেই।"

এর পর প্রশ্ন হচ্ছে, তবে লোকে সূর্যকে কেন চায়? কবিরা যে বলে জ্যোৎস্নায় ফুল ফোটে, মলয় বয়, হেন হয়, তেন হয়, কিন্তু চন্দ্রালোকে কচি ছেলের কাঁথা শুকোয় কি?

"আমসত্ত্ব ঘুঁটে আর কাঁচা চম্ম
এসব শুখোনো কি চাঁদের কম্ম?
আজ্ঞে না। আমার জানা আছে যদ্দুর
এর জন্য চাই কাঠফাটা কড়া রোদ্দুর।
সূর্য-সৃষ্টির কারণই মশাই এই,
বিধাতার রাজ্যে অনর্থক কিছু নেই।
অতএব গাও চাঁদের জয়, সূয্যির জয়
দুটোর একটিও ফেলবার নয়।"

রাজশেখরের বাল্যকালের কবিতা—যা শশিশেখরের কাছ থেকে পাওয়া, সেটাও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি—

"আর কত দেরি, আর যে সহে না,
ধড়ে প্রাণ আর থাকিতে চাহে না।
এইবার মেল ঢোকে ইস্টিশান
ভ্যাকুঅম ব্রেকে পড়েছে কি টান?
গুম গুম গুম গুম কড় কড় কড়
হড়াৎ হড়াৎ হড় হড় হড়
ক্যাঁচ ক্যাঁচ কোঁ থামিল গাড়ি।"

পরবর্তীকালে 'গড্ডলিকা'য় ভুশণ্ডীর মাঠের কারিয়া পিরেতের মুখে যে উৎপাটন মন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে, সেটাও কুলিমজুরদের মুখ থেকে সংগৃহীত কথা নিয়ে তাঁর বালককালের নিজস্ব রচনা। সেই যে—মারেজ, জুয়ান—হেঁইয়া···ইত্যাদি।

রাজশেখর বসুর আর একটি গুণ নিজে ছবি আঁকতে পারতেন এবং তাঁর বাড়িতে বসে (২২-২-৬০) তাঁর গড্ডলিকা, কজ্জলী প্রভৃতির বিখ্যাত শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের মুখেও শুনলাম, "রাজশেখর নিজে এককালে ভাল ছবি আঁকতেন। গণ্ডেরিরাম ও শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী এ দু'টি মূর্তি কেমন হবে তা রাজশেখর পোস্টকাডের উপর ফাউণ্টেন পেন দিয়ে এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমি ঠিক তাই এঁকেছি। অনেক চরিত্রই তাঁর পরিচিত কারো না কারো চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে আঁকা।"

যতীন্দ্রকুমারের এই সব বিখ্যাত ছবি যা কাহিনীর সঙ্গে এমন যুক্ত হয়ে পড়েছে যে, ঐ গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া বা শ্যামানন্দ বা অন্য যে-কোনো চরিত্র আর কারো হাতে অন্য চেহারা নিয়ে দেখা দিলে পরশুরামের জগৎই উল্টে যাবে—অথচ এই সব চেহারার মূল কল্পনা, হয় রাজশেখরের আঁকা ছবি থেকে, আর না হয় তাঁর পরিচিত কোনো-না-কোনো লোকের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে। এসব চেহারার আর বদল হবার উপায় নেই ভবিষ্যতে। এতে বোঝা যায়, রাজশেখর তাঁর শুধু রচনা নয়, সেই রচনার ছবিসুদ্ধ এক-সঙ্গে মিলিয়ে ভেবেছিলেন। যেমন তিনি বাড়ি তৈরির আগে প্ল্যানের সময় কোথায় খাট, কোথায় চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি থাকবে তারও প্ল্যান এঁকে দিয়েছিলেন। আমার হাতে অধুনিক ফোটো ক্যামেরা দেখে তাঁর ক্যামেরা স্মৃতিও জেগে উঠেছিল। এ কাজও তিনি এককালে করেছেন। এর আগে আমি প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখা থেকে রাজশেখর সম্পর্কে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি, তার আরম্ভে যতীন্দ্রকুমারের নাম আছে। তিনি সেখানে রাজ-শেখরের বন্ধু শিল্পী এই যতীন্দ্রকুমার সেনের কথাই বলেছেন।

বাইশে জানুয়ারি তারিখে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আমি একত্র গিয়েছিলাম রাজশেখরর কাছে। আমার সঙ্গে মুভি ক্যামেরাসহ হিমানীশ ছিল। ওখানে বিকালে যাবার পর শিল্পী যতীন্দ্রকুমার এলেন। সেদিন সাহিত্য আলোচনা বিশেষ কিছু হয় নি, বরং শিল্প আলোচনা একটু বেশি হয়েছিল। রাজ-শেখরের গল্পের চিত্র-পরিকল্পনার কথা যা হয়েছিল আগেই বলেছি। ক্যামে-রার কথাও উঠেছিল। যতীন্দ্রকুমার আমার ছবি কয়েকটি তখনও মনে রেখেছেন দেখলাম। তারপর তিনি নিজের ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলার এক মজার কাহিনী বললেন। অসূর্যম্পশ্যার ছবি তুলতে হবে অথচ তিনি ফোটো-গ্রাফারপশ্যা হবেন না, এমন বিপদে পড়েছিলেন। এ রকম ছবি তোলা এ যুগে অবশ্য সম্ভব। ফ্ল্যাশের এমন ব্যবস্থা করা যায়, যাতে ফোটোগ্রাফার

অদৃশ্য থেকেও ফোটো তুলতে পারে, অথবা ইনফ্রা-রেড প্লেটে ইনফ্রা-রেড ল্যাম্পের সাহায্যে। সে ল্যাম্পের কোনো আলো বাইরে যায় না, সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছবি তোলা যায়। কিন্তু যতীন্দ্রকুমারের সময়ে এসব ছিল না, তাই তিনি নিজের মাথাটি কালো কাপড়ে ঢেকেই রইলেন বরাবর, অসূর্যম্পশ্যার সর্বজনপশ্য স্বামী খুশি হয়ে ভাবলেন, সিটারের সতীত্বধর্ম বজায় রইল।

সেদিনকার আসরে এটাই সবচেয়ে মজার গল্প। এই সময়ের আগের শারদীয় সংখ্যা (১৯৫৯) যুগান্তরে রাজশেখরের 'দাঁড়কাগ' নামক যে গল্প বেরোয় সেইটি তাঁর শেষ গল্প যা আমি ছেপেছি। যতীন্দ্রকুমারের কাছেই শুনলাম সত্যি সত্যিই একটি কালো মেয়েকে ঐ নামে ডাকা হত।

রাজশেখর লেখা পাঠিয়ে তার সঙ্গে জানাতেন, "দু সেট প্রুফ চাই। একটি আমি রেখে দেব, আর একটি দেখে ফেরৎ পাঠাব।" তাঁর একখানা চিঠি এই—

৭২ বকুলবাগান রোড়, কলিকাতা-২৫

৮-৯-৫৪

প্রীতিভাজনেষু,

'যুগান্তর' পূজা সংখ্যার জন্য যে লেখা দিয়েছি, তার প্রুফ আমাকে দেখাবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আশা করি প্রুফ পাঠাবেন। আমি নিজের বানান বজায় রাখতে চাই, কিন্তু প্রুফরীডাররা সব কেটে দিয়ে নিজেদের অভ্যস্ত বানান করেন। সে কারণে প্রুফরীডারের উপর নির্ভর করি না। আপনি সুস্থ আছেন।

আপনার,
রাজশেখর বসু

'চলন্তিকা'র গ্রন্থকারের এই অভিযোগ মিথ্যা নয় এবং এটি তাঁর ভাগ্যের পরিহাসও বটে। কারণ শুধু প্রুফরীডার নয়, অনেক লেখকও তাঁর অভিধান খোলার প্রয়োজন বোধ করেন না। 'চলন্তিকা' বা অন্য অভিধানের যুগ দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে।

তাঁর হাসির গল্প সম্পর্কে যে ভয় ছিল, তা সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। এ যুগে তাঁর পাঠকসংখ্যা বেশি নয়। একদল পাঠক হাসির কথাকে ছ্যাবলামি মনে করে, আর এক দল পাঠক হাসির কথায় অতিগুরুত্ব দিয়ে তার প্রতিবাদ করে, আর একদল পাঠক ব্যঙ্গার্থ ধরতে না পেরে ঠিক উল্টোটা বোঝে।

আমার নিজের অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এ বিষয়ে। কিন্তু বানানের কথা হচ্ছিল। 'ব্যঙ্গ্য' শব্দটি আমি কিছুতে ছাপার অক্ষরে দেখতে পেলাম না। 'ব্যঙ্গ্য' লিখলে শেষ পর্যন্ত শেষের য-ফলা কেটে 'ব্যঙ্গ' বানিয়ে দেয়। এবং রাজশেখর বসু আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন তাতে 'ব্যঙ্গ্য' শব্দটি ছাপবার সময় প্রুফ দেখেও দিয়েছিলাম। কিন্তু ছাপার পর দেখলাম প্রেসের কোনো সদাশয় ব্যক্তি 'ব্যঙ্গ্য' 'ব্যঙ্গ' করে দিয়েছেন।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দশচক্র' উপন্যাসের এক স্থানে বিদ্রূপ করে বলেছেন, "আমি যাহা বুঝি না, তাই সত্য।" এটি ধর্মবিষয়ে সাধারণ মানুষের ধারণাকে ব্যঙ্গ করে বলা। প্রেসের কথা ঠিক তার বিপরীত—সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রুফরীডারের কথা—"আমি যা বুঝি না তা মিথ্যা।"

এ কথা এ প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে বলতে হল, তার কারণ আমি আমার কোনো রচনায় বিশেষ শব্দের চেহারা এবং অনেক ক্ষেত্রে শুদ্ধ বানান ছাপার অক্ষরে বজায় রাখতে অসমর্থ হয়েছি। পাঠক পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

শব্দের ব্যবহার নিয়েও রাজশেখরের সঙ্গে আমার পত্রালাপ ঘটেছে। খবরের কাগজের ভাষা 'দাবদাহ' 'কার্য্যকরী' প্রভৃতি কানে অদ্ভুত শোনায়। তিনি আমাকে লিখেছেন—

৭২, বকুলবাগান রোড়, কলিকাতা—২৫
২৩-৯-৫৫

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ২১ তারিখের চিঠি গতকাল পেয়েছি। খবরের কাগজে (এবং অনেক নামজাদা লেখকের বই-এ) নিরঙ্কুশ বাংলা ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে, তার ত বাধা দেওয়ার শক্তি কারও আছে মনে হয় না। 'কার্যকরী উপায়' 'কলিকাতায় গ্রীষ্মের দাবদাহ' (forest fire) ইত্যাদি নিত্য নূতন idiom দেখা যাচ্ছে।...

আপনার
রাজশেখর বসু

এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি ভাগ্যের পরিহাসের কথা বলি। তাঁর গড্ডলিকা, নবম সংস্করণ (১৩৫৪), আমার কাছে আছে, তাতে অসংখ্য ছাপার ভুল!

রাজশেখর তাঁর এক প্রবন্ধ রচনায় আমাকে স্মরণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতায় বেঁধেছেন। আমি কয়েক বছর আগে থেকেই বাংলায় বিজ্ঞানের

পরিভাষা সম্পর্কে লেখকদের সতর্ক হতে বলছিলাম। বিশেষ করে আমার বক্তব্য ছিল অণুকে পরমাণু না বলা অথবা পরমাণুকে অণু। এতে বাংলা ভাষায় পাঠরত ছাত্রদের ভয়ানক ক্ষতি করা হচ্ছে। দুটি পৃথক জিনিস। এই অসতর্ক প্রচারের ফলে মোলিকিউলার থিওরি ও অ্যাটমিক থিওরির পৃথক বাংলা প্রচার করা দুঃসাধ্য হচ্ছে। যদি প্রথমটি আণবিকতত্ত্ব লিখি তা হলে বিভ্রান্ত পাঠক তাকে অ্যাটমিক থিওরি ভেবে নেবেন। এই সব নিয়ে কিছুকাল ধরে আলোচনা করছিলাম, অবশ্য আলোচনাটা চালিয়েছিলাম ছদ্মনামে। কিন্তু মনে হয় সেটি যে আমারই ছদ্মনাম সে কথা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। সে কথা পূর্বে এক চিঠিতে লিখেছিলেন। তার পর তিনি এক প্রবন্ধে আমার মতামতটা আমার স্বনামেই উল্লেখ করলেন। সে প্রবন্ধটি তাঁর ১৯৫৯ সনে প্রকাশিত 'চলচ্চিন্তা' নামক বইয়ের 'গ্রহণীয় শব্দ' প্রবন্ধে আছে। তিনি লিখছেন—

> "Atomb bomb অর্থে অনেকে আণবিক বোমা লেখেন। এই অনুবাদ ভুল। Atomic-এর বাঙলা পারমাণবিক। পরমাণু বোমা লিখলে ঠিক হয়। এ সম্পর্কে পরিমল গোস্বামী মহাশয় অনেকবার আলোচনা করেছেন।" (১০১ পৃঃ)।

কিন্তু তাঁর কথা মান্য করছেন না অনেক অবিজ্ঞানী, অথচ তাঁদের কণ্ঠ লাউড স্পীকারের মতো জোরালো। কাজেই মনে হয় শিক্ষার উন্নতি কাম্য হলে বিজ্ঞান শিক্ষা পুনরায় ইংরেজীতেই চালু করতে হবে, যদিও রাজশেখর ছিলেন আশাবাদী। বাঙালী পাঠকের মনকে এবং অ্যাটম চিন্তাকে এলোমেলো করে দেওয়া এক দিক থেকে ভালই হচ্ছে। কারণ একমাত্র ইংরেজী ভাষাতেই বিজ্ঞান পড়ানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে তাতে। আজকের এই পরমাণু যুগে শুধু অপপ্রচারের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষায় বাঙালী পিছিয়ে থাকবে, পরমাণু কাকে বলে তাও জানবে না, একটি সম্ভব নয়।

রাজশেখরের অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা বইয়ের পাতায় আবদ্ধ হয়ে আছে, সাধারণ পাঠক তা পড়লে অনেক বিষয় এবং অনেক জরুরি বিষয় জানতে পারতেন, কিন্তু পড়া হয় না।

রাজশেখর নিজে প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাঁর কোথায় দুঃখ তা কারো জানবার উপায় ছিল না। বাইরের জগতে তিনি প্রবলভাবে নিজেকে মেলে ধরেন নি, তাই তিনি অবহেলিত।

রাজশেখর কত সংস্কৃতিমান ছিলেন, কত ভদ্র ছিলেন, তার অনেক

পরিচয় আমি পেয়েছি। শুধু লেখার ভিতরে নয়, ব্যবহারেও তিনি পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তিনি নীরব কর্মী ছিলেন, জীবনেই শুধু নয়, মৃত্যুতেও নীরবতা চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সেই ছোট্ট রচনাটি থেকে আমি আরও কয়েক লাইন উদ্ধৃত করি—

> "জীবনকে তিনি যে প্রসাদ উপহার দিয়েছিলেন তাই আবার উপহার দিলেন মৃত্যুকে। যে শ্রী লিখেছিলেন জীবনে তাই আবার মৃত্যুর ললাটে লিখলেন। কোথাও রিক্ততা নেই, ন্যূনতা নেই, যতিভঙ্গ নেই—অক্ষুণ্ণ সৌষ্ঠবে জীবন-মৃত্যুর ছন্দ মিলিয়ে দিলেন।"

আরও একটু উদ্ধৃতি—

> "সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে—শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্রে এ যেন লেখা না হয়। মরবার আগে অজ্ঞান হব নিশ্চিত, আর প্রাণ যাবে গৃহে, গঙ্গায় নয়, সুতরাং সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তি নিরর্থক। আর আশি পেরিয়ে যে যায় তার মৃত্যুতে শোচনীয়তা কোথায়? সুতরাং পত্রের ইতিতে 'ভাগ্যহীন' লিখো না, লিখো বিনীত।"

অচিন্ত্যকুমারের যে রচনা থেকে আগে এবং পরে আমি অংশ বিশেষ ছিনিয়ে নিলাম, সেটি একটি অখণ্ড কাব্যের মতো, তাই এই কাজটিতে একটা অতৃপ্তি রয়ে গেল। সমগ্রের ছন্দ নষ্ট হল খণ্ড উদ্ধৃতিতে।

এই আত্মপ্রচারবিমুখ, হুজুগবিমুখ, এবং যুগপৎ লঘু ও গুরুধর্মী, অহিংস্র, হৃদয়বান, পূজনীয় ব্যক্তিটি নানা দিক দিয়ে বাংলা দেশের হৃদয় হরণ করেছিলেন। তিনি ১১ই জানুয়ারি (১৯৬০) আমাকে লিখছেন, "আমার মৃগী বা epilepsy রোগ, মাসখানিক আগে, অনেকবার আক্রান্ত হয়েছি। চিকিৎসা হচ্ছে কিন্তু জড়ভরত হয়ে আছি, সমস্তক্ষণ অস্বস্তি। সারবে আশা করি না।"

এই চিঠিতে দেখলাম তিনি আমার কাছে এই প্রথম বাজারের নীল কালি ব্যবহার করলেন, তার আগে বরাবর নিজের তৈরি কালিতে লিখেছেন। ভিতরে ভিতরে এমনিভাবে বন্ধন কাটতে থাকে। কিন্তু তবু এ চিঠি তাঁর নিজের হাতের লেখা। এর পর চিঠি লেখেন এর ছয় দিন পরে, সেও নিজ হাতে লেখা। কিন্তু ১৯৬০ মার্চ মাসের ১৬ তারিখের যে চিঠিখানা পাই সেখানা আর নিজে লিখতে পারেন নি, অন্যের হাতের লেখা, নিচে তাঁর স্বাক্ষর।

সমস্ত জীবনের বাঁধা পথ থেকে সরে আসার দৃশ্যটি করুণ। ঐ চিঠিতেই আমাকে জানিয়েছিলেন, 'চটপট নিষ্কৃতি চাই।'

১৯৫৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি সকালে কৃষ্ণশেখর বসু আমার কাছে শশিশেখরের মৃত্যু সংবাদ বহন করে আনলেন। তার এক ঘণ্টা পরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও আমি একখানা রিকশায় গিয়ে পৌঁছলাম (আমি কৈলাস বসু স্ট্রীট ও প্রেমাঙ্কুর চালতাবাগান লেন থেকে) বিবেকানন্দ রোডে। গিয়ে দেখি আরও অনেকের সঙ্গে রাজশেখর বসে আছেন। প্রশান্ত মূর্তি। মৃতদেহ অন্য ঘরে। কিছুদিন হল মৃতদেহ দেখার ইচ্ছা নষ্ট হয়ে গেছে। তবু তাঁর পুত্রের প্রয়োজনে একটি ছোট্ট ক্যামেরা পকেটে নিয়ে গিয়েছিলাম। মৃত-দেহের ফোটোগ্রাফ ছাপার আমি বিরোধী, ওতে সৌন্দর্য-বোধ গুরুতর রকমের ধাক্কা খায়।

১৯শে মার্চ (১৯৬০) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে আবার যাই রাজশেখরের কাছে, তাঁরই প্রেরিত গাড়িতে। সঙ্গে মুভি প্রজেক্টর। ২২শে জানুয়ারি যে মুভি ফিল্ম তোলা হয়েছিল সেইটে দেখানো হল। কিন্তু সেদিন যে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে বিশিষ্ট কয়েকজনের আগমন হয়েছিল সেখানে, তা আমাকে আগে জানানো হয় নি।

তিনি ফিল্মটি সবার সঙ্গে দেখলেন। মুখে একটি কথা শুনি নি সেদিন। স্বভাবতই সে দিন কিছু অত্যাচার হয়েছিল তাঁর দেহের উপর। তাঁর হার্টের অসুখ ছিল।

২৭শে এপ্রিল ১৯৬০ তারিখে ঘুমিয়ে পড়ে আর জাগলেন না। শেষ দেখার ৩৯ দিন পরের ঘটনা এটি। সেই দিনই রেডিও থেকে জরুরি খবর পেয়ে তাঁর সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধা নিবেদন (পাঁচ মিনিটের উপযুক্ত) রেকর্ড করা হল, এবং রাত্রে সেটি ব্রডকাস্ট করা হল।

কিন্তু সে কথিকা বেতার জগতে ছাপা হতে দেখি নি। রাজশেখর বসু তাঁর মৃত্যুর সমসাময়িক কালের অধিকাংশের কাছে এর পূর্বেই মারা গিয়েছেন।

২১-৪-৬৬

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

১৮৮১—

এই গ্রন্থ প্রকাশ বৎসরে, ১৯৬৮ সাল, শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে।

শরৎচন্দ্রের বয়স যখন পঁচাত্তর বৎসর, সেই সময় তিনি আমাকে যে চিঠিখানা লেখেন তা এই—

Post Box 11404
CALCUTTA-6
28-12-56

দীর্ঘায়ুর্নিরাপৎসু

সপরিবার কলির ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ কর। সব দিন পোস্ট বক্স খোলার সামর্থ্য হয়ে ওঠে না। গতকাল দৌহিত্রকে চাবি দিয়ে পাঠিয়ে তোমার চিঠি পেলাম। ২।৩ দিনের মধ্যে বাসায় দেখা করবো। ইংরাজী EYE উল্টে না, বাংলা নয়ন উল্টে না। 'নয়ন' ইংরাজীতে লিখলেও উল্টে না—'NAYAN'। আমার ইংরাজী জন্ম খৃস্টাব্দ ১৮৮১, তাও উল্টায় না। দৃষ্টির বেলায় তা হয় না। লেখার ভঙ্গি দেখেই বুঝবে। কত উঁচু নজর। দেখা করে সব বলব। —শুভকাম—শ্রীদাদা।

এ বয়সেও শরৎচন্দ্র পণ্ডিত স্বধর্ম ছাড়েন নি। কথা নিয়ে খেলা, এই আনন্দে ডুবতে পারলে অন্য সব কাজ ভুল হয়ে যায়। ডান ধার থেকে বাঁ ধার, অথবা বাঁ ধার থেকে ডান ধার, দুদিক থেকে পড়লেই যে শব্দ অথবা বাক্য একই থাকে, তাকে ইংরেজীতে প্যালিনড্রোম বলে। উপরের চিঠিতে এই প্যালিনড্রোম শরৎচন্দ্র খুব সুন্দর ব্যবহার করেছেন। তাঁর আসল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, চিঠির অক্ষরগুলি খুব বড় বড় হয়ে গেছে, কারণ দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে। এই কথাটি জানাতে একেবারে জন্মের সন পর্যন্ত টেনে এনেছেন। তাঁর দৃষ্টি-ক্ষীণতার দুঃখ প্যালিনড্রোমের আনন্দের মধ্যে ডুবে গেছে।

বাংলা প্যালিনড্রোম তৈরিতে শরৎচন্দ্রের জুড়ি নেই, যেমন জুড়ি নেই বাংলা অ্যানাগ্রাম রচনায় শোভাবাজারের হারীতকৃষ্ণ দেবের, যেমন জুড়ি নেই বাংলা ক্রসওয়ার্ড রচনায় নলিনীকান্ত সরকারের।

এর পর যখন তাঁর বয়স আশি পার হয়েছে সেই সময়ে লেখা একখানা চিঠিও এখানে উদ্ধৃত করি। এ চিঠির একটুখানি ইতিহাস আছে। তিনি গত ১৯৬২ সালের গোড়ার দিকে কিছু জখম হন। পথে চলতে একটি মুক্ত গোরু তাঁকে ধাক্কা দেয়। পরে আমি এ সংবাদ শুনে তাঁকে যে চিঠি লিখি তা এই—

কলিকাতা-৬ ১০-৩-৬২

দাদা,

শুনলাম আপনি কপি নিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক গোরু আপনাকে ধাক্কা মেরে কপি কেড়ে নিয়েছে। গোরু চিরকাল বুদ্ধিমান বলে খ্যাত, চেয়ে নিলেই পারত। গো সম্প্রদায়ের এতে কি গৌরব বাড়ল? গো হয়ে ব্রহ্মহত্যার চেষ্টা? গোস্বামী বলেই প্রতিবাদ জানাই।

এর উত্তর দিলেন তিনি ১৩।২, নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীট থেকে। তিনি থাকেন হাওড়ায়, কিন্তু বীডন স্ট্রীট ডাকঘরে তাঁর চিঠির বাক্স। ঐখানে প্রায় নিজেই হেঁটে এসে বাক্স খোলেন এবং নিকটস্থ নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে ভূষণচন্দ্র দাসের বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। ভূষণচন্দ্র যুগান্তর সাময়িকী বিভাগের সহকারী সম্পাদক। আমার চিঠির উত্তর তিনি সেইখান থেকে ১৯-৩-৬২ তারিখে লেখেন—

দীর্ঘায়ুর্নিরাপৎসু,

ভাই, গোরু যদি ব্রহ্মহত্যা করত তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত না। ব্রাহ্মণ যদি গোহত্যা করত তাকে ভুরু সুদ্ধ কামিয়ে পাপের ফল ভোগ করতে হত। গো মাতা বোধ হয় কোন কাগজ বের করবেন, তাই লেখক খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কপির জন্য। খুব ভাল আছি। হেঁটে নয়ানচাঁদের ১৩।২ এসেছি ৭টায়।

শ্রীদাদা।

প্রেসে যে পাণ্ডুলিপি দেওয়া হয় তাকে ইংরেজীতে কপি বলে। শরৎচন্দ্র বাংলা কপি (বাঁধা বা ফুল কপি) ইংরেজী প্রেস কপির অর্থে ব্যবহার করে ভাষা নিয়ে খেলার আরও একটি সুখকর দৃষ্টান্ত দেখালেন। এ জাতীয় রসসৃষ্টি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত। বাল্যকালে তিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তবু সেই অবস্থাতেই তিনি স্কুলজীবনে যে মেধা দেখিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। তিনি তখন থেকেই নানা বিষয় আয়ত্ত করার নিজস্ব সব মজার মজার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন। তাঁর কবিত্বশক্তি সহজাত। বুদ্ধির প্রখরতা

বয়সের তুলনায় আশাতীতরূপে চমকপ্রদ। আর এরই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব দুষ্টুমিবুদ্ধিজাত সব কৌতুক ক্রিয়ার মিশ্রণ-ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ তেমনি করুণ।

আমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে ১৯৩৬ সনে। এতদিন ধরে তাঁর চেহারার ধীরে ধীরে কিছু বদল ঘটলেও তাঁর চরিত্রের আচরণের এবং হৃদয়ের কোনো বদল আমার চোখে পড়েনি। তাঁকে শেষ দেখেছি ১৯৬৩ সালের ১৫ই অক্টোবর। সেদিন তিনি আমাদের বাড়িতে কেন এসেছিলেন সে কথা পরে বলছি। এখন (১৯৬৬) তিনি অসমর্থ, হাওড়ার বাস ছেড়ে এখন তিনি রঘুনাথগঞ্জে প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় আছেন—বয়স পঁচাশি। ১৯৬২ সন তিনবার এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে—সিঁথিতে। সেই একই চেহারা। খালি পা, খালি গা, শাদা চুল, ইঞ্জিনের সামনেকার কাউ-ক্যাচারের মতো গোঁফ—শাদা ধবধব করছে। দেহ-বর্ণ গৌর, কপালে কয়েকটা ভাঁজ বেড়েছে।—এই হল তাঁর ১৯৬৩ সনের চেহারা। দারিদ্র্যের চেহারা।

কিন্তু এই দারিদ্র্য তাঁর স্বেচ্ছাবৃত। এর পিছনে কৈশোরের যে এক অতি করুণ-মধুর দৃঢ়সঙ্কল্পের ইতিহাস আছে তা অতিশয় বেদনাদায়ক, কিন্তু তবু তা অতিশয় গৌরবজনক। সে কাহিনী তাঁর পরিচিত মহলের সবাই তাঁর নিজের মুখেই শুনেছেন। নদীর তীর ভেঙে তপ্ত বালির উপর দিয়ে হেঁটে স্কুলে যেতে পায়ে ফোস্কা পড়ে। খুব ইচ্ছা, একজোড়া জুতা তিনি তাঁর প্রতিপালক কাকার কাছ থেকে চেয়ে নেন। কাকা তাঁদের প্রতিবেশী কাঠের পাওয়ালা এক সেকরাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ওরে, মানুষের যত অভাবই থাক, চলে যায় ঠিক। ঐ দেখ ওর একখানা পা নেই, তবু চলে যাচ্ছে, আর তোর জুতো না হলে চলবে না?

সেই থেকে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের খালি পা। কাকার ইচ্ছা পূরণ শুধু নয়—নিজের চরিত্রের পজিটিভ দিকের উন্মেষ হল এইভাবে। কিভাবে সমস্ত জীবন কাটাবেন তা ঐ বালক বয়সেই ঠিক করে ফেললেন, তার বদল ঘটল না। সেই থেকে আর ভিক্ষা নয়। কারো কাছে নয়, না মানুষের কাছে, না দেব-দেবতার কাছে। সংসারে নানা জাতীয় মানুষ আছে, কেউ ভগবানে বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী। শরৎচন্দ্র এ দুয়ের বাইরে। তাঁর মনে ঈশ্বরজিজ্ঞাসা নেই। তিনি নিজের স্বার্থের জন্য কারো কাছেই যখন এক পয়সা ভিক্ষা করেন নি, সুবিধা ভিক্ষা করেন নি, তখন ঈশ্বর তাঁর কাছে অবান্তর। তিনি তাঁর

কাছে মোক্ষ ভিক্ষাও করেন নি, লটারিতে টাকা পাইয়ে দাও—এমন ভিক্ষাও করেন নি। অর্থ পরমার্থ কিছুই না।—শরৎচন্দ্রের এই জীবন ধারা একেবারে স্বতন্ত্র।

আমার অনেক দিনের ইচ্ছা শরৎচন্দ্রের জীবনকথা প্রচার হোক। এই কাজটি যিনি করবার পক্ষে যোগ্যতম, তাঁর উপরেই একটি কৌশলপূর্ণ অথচ মধুর চাপ সৃষ্টি করে এ কাজটি করিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি নলিনীকান্ত সরকার। ভাষাপ্রেমিক, ছন্দোরসিক, শরৎ-সুহৃৎ নলিনীকান্ত সরকার। এঁদের দুজনের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ এবং দুজনে একত্র সুখদুঃখের অংশীদাররূপে বাস করেছেন অনেক দিন।

আমি তাঁর লেখা প্রায় প্রতি সপ্তাহে যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে নিয়মিত ছাপতে লাগলাম। সেটা ঠিক জীবনী নয়, কিন্তু জীবনের এমন সব কাহিনী যা পড়লে শরৎচন্দ্রকে তাতে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়। সেই লেখাগুলি সংগৃহীত হয়ে "দাদাঠাকুর" নামে প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সনে।

তাঁর চরিত্রের কৌতুক-প্রিয়তার দিকটি একেবারেই স্বতন্ত্র বলে মনে হয় আমার কাছে। এবং বর্তমান বা অতীত কারো সঙ্গে এটিকে মেলাতে পারি না। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোনো মানুষকেও এঁর প্রোটোটাইপরূপে কল্পনা করা আমার অসাধ্য। আমাদের সম্পর্কে অন্তত বলতে পারি যে, তাঁর সংস্পর্শে এলেই তিনি আমাদের এমন একটি মাধুর্য এবং আলোর স্পর্শ দিয়েছেন যার কথা ভাবতে গেলেও মন আনন্দে ভরে ওঠে। ম্যাথু আরনলড কালচার সম্পর্কে একস্থানে বলেছেন. "Culture seeks to······make all men live in an atmosphere of sweetness and light" —সেই কালচার দেখেছি আমি শরৎচন্দ্রের মধ্যে। এই sweetness and light-এর জনক শরচন্দ্র।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানুষের কথা বলছিলাম। আকবর বাদশার দরবারে ছিলেন বীরবল, তাঁর চরিত্রের সামগ্রিক পরিচয় আমার জানা নেই, তবে 'উইট' সৃষ্টিতে তিনি সে যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন, তা ছাড়া যুদ্ধ বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু তাঁর যত গুণই থাক, শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের চরিত্রের মূল ভিত্তি যেটি, সেখানে তিনি কি পৌঁছতে পেরেছিলেন? পৌঁছবার কথা নয়, কারণ বীরবল ছিলেন ধনী, রাজা মানুষ। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য গ্রহণ এবং অসহায় বা শরণাগতকে রক্ষার জন্য নিজের সকল ক্ষতি স্বীকার করে লড়াই

করার কি কোনো দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন ? গোপাল ভাঁড় নামক ব্যক্তি কি শরৎচন্দ্রের চরিত্রের মতো উদার ছিলেন, অথবা অন্য কারো সমালোচনা বা চাটুকারিতাকে সমান অগ্রাহ্য করে, স্বনির্বাচিত নীতিতে অনমনীয় দৃঢ়তায় সমস্ত জীবন কাটাতে পেরেছেন ? দারিদ্র্যকে এমন কৌতুকের খড়্গাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পেরেছেন ? আগের দিনের একটি জমিদারি ক্রয়-ক্ষমতার উপযুক্ত পঁচিশ হাজার টাকার একটি শ্রদ্ধা-ভালবাসার দানকে তিনি কি শরৎচন্দ্রের মতো প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছেন ?

আমার তো কল্পনার বাইরে। জীবনসংগ্রামের এত বড় বীর যোদ্ধা আমার আর জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আত্মমর্যাদাচেতন অভিমানী দরিদ্রকে কল্পনা করেছিলেন,

> "ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
> ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ ;
> হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥"

শরৎচন্দ্র তাদেরই একজন। তাঁরও ঐ একই কথা।

শরৎচন্দ্র কখনো কোনো কারণে স্বধর্মভ্রষ্ট হননি, কারো অনুগ্রহ দান গ্রহণ করেননি। নিজে হেসে অন্যকে হাসিয়ে চারদিকে খুশির ফুলঝুরি ছড়িয়ে আজও অদৃষ্টকে পরিহাস করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। শিশু যুবক বৃদ্ধ—শিক্ষিত অশিক্ষিত তিনি তাদের সবার কাছে সমান সুগম। হাসি-মুখ লেগেই আছে, গল্প লেগেই আছে। নিজের ছোটবেলার দারিদ্র্যের কথা যখন বলেন, তখন তা কারো সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য নয়। হাসতে হাসতে বলেন, আর সে কি অদ্ভুত মর্মস্পর্শী ভাষা এবং ভঙ্গি। দীনতার অপূর্ব সব ছবি—হীনতাবোধহীন করুণ ভাষায় বলা। শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। তার চোখ ভিজে ওঠে অজ্ঞাতসারে। বক্তা কিন্তু নির্বিকার নিস্পৃহ। নিজের রচিত সমস্ত কবিতা, সমস্ত কৌতুক কাহিনী তাঁর মুখস্থ, একটি কথাও ভুল হয় না। যত গান রচনা করেছেন, এমন কি মুখে মুখে রচনাও কোনোটি ভুল হয় না। গেয়ে শোনান। তাঁকে তাঁর অভ্যস্ত দীনবেশে নতুন যদি কেউ দেখে বা তাঁর সঙ্গে আলাপ করে, তা হলে সে কল্পনাও করতে পারবে না যে, এই ক্ষীণস্বাস্থ্য কৃশদেহ বৃদ্ধ বাংলা দেশের মধ্যে এক অতুলনীয় মনোবলের অধিকারী এবং ভাগ্যের বিরুদ্ধে সবার চেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা। একদিকে পৌরুষ এবং বীর্য, অন্যদিকে পরম স্নেহশীল, করুণার্দ্র একটি হৃদয়। অদ্ভুত যোগাযোগ।

আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর স্নেহপ্রবণতার একটি কাহিনী বলি। ১৯৫৭ সালের অগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে যখন আমার স্ত্রী দীর্ঘমেয়াদী ব্যাধিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই সময় তিনি প্রতিদিন বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে এসে রোগিণীর বিছানার পাশে বসে দু'তিন ঘণ্টা করে কাটিয়ে যেতেন। নানা রকম হাসির গল্পের সাহায্যে তাঁকে একটুখানি খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। খানিকটা করে উৎকৃষ্ট দই হাতে করে আনতেন তাঁর খাওয়ার জন্য। এই ছিল তাঁর দৈনিক কর্তব্য। এ রকম কষ্ট করে প্রতিদিন আসতে আমি তাঁকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সেকথা তাঁর মর্মে প্রবেশ করে নি। একদিন বর্ষায় পথ ডুবে গিয়েছিল, তারই মধ্যে তিনি হাওড়া থেকে এসেছেন, সেই হাঁটুসমান জলের ভিতর দিয়ে হেঁটে। সমস্ত জীবন তিনি এমনিভাবে সকল প্রতিকূলতাকে ঠেলে চলেছেন, পথের জল তাঁকে কতটুকু বাধা দেবে?

কিন্তু এইখানেই কি শেষ? তারপর সেই মর্মান্তিক ১৯শে সেপ্টেম্বর, যেদিন সকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে. সেদিনও তিনি এসেছিলেন। এবং শুধু এসেছিলেন নয়, নীরবে চোখের জল ফেলেছিলেন, এবং কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে বেনেটোলা পার্ক সার্কাস অঞ্চলের ক্রিমেটোরিয়াম পর্যন্ত গিয়ে, সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর, ফিরেছিলেন। না খেয়ে ছিলেন বৈকাল পর্যন্ত।

এই হল তাঁর চরিত্রের একটি দিক। একই চরিত্রে বহু বিভিন্ন গুণ, এবং প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে চেনা যায়। তাঁর চরিত্রের সকল দিকের পরিচয় যাঁর কাছে অজানা, তিনি হঠাৎ সব শুনলে চমকে যাবেন।

তিনি যেন উদার নীল আকাশের নিচে আতত একখানি রৌদ্রস্নিগ্ধ খোলা হাওয়ার ছুটি। তাঁর কাছে বসে একবেলা কাটালে স্বাস্থ্য-মন দুই-ই সতেজ হয়ে ওঠে। যাঁদের এ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা শুধু এ কথা স্বীকার করবেন তাই নয়, বলবেন, আমার এ বর্ণনা যথেষ্ট হল না, তিনি ঠিক যেমন. তা যথাযথভাবে প্রকাশ পেল না। আমি যা বলেছি তিনি তাঁর চেয়ে আরো বড়।

সমস্ত জীবনটাকে এমন শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখা সহজ নয়। জীবনের সকল ঘটনা সিনেমা ছবির মতো তাঁর মনের চোখে ফুটে ওঠে এবং সিনেমা ছবির মতোই তা বার বার অন্যকে দেখানো যায়। তাঁকে বললেই তিনি দেখান, এবং প্রতিবারেই জীবন্ত বোধ হয়। একটা ঘটনা বলতে তার আনু-

ষঙ্গিক আরও দশ-বারোটা মনে পড়ে যায়। সবগুলিই সমান চিত্তাকর্ষক।

ব্যাবহারিক জীবনেও একই রকম নিস্পৃহ। জীবনকে দূর থেকে দেখলে প্রায় সবার পক্ষেই এই নির্লিপ্ত দৃষ্টি লাভ করা অনেকটা স্বাভাবিক। কিন্তু কোন্ শক্তির বলে তিনি চরমতম সঙ্কটের মাঝখানে বসে মুখে মুখে গান রচনা করে গাইতে পারেন? এই ঘটনা তিনি কত শত বার বহু বন্ধুজনকে বিবৃত করেছেন। এবং সেই গান গেয়ে শুনিয়েছেন।

মৃত পুত্র চিতায়। এমন অবস্থায় কি কেউ নির্লিপ্ত থাকতে পারে? কিম্বা কজন পারে? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই নির্লিপ্ততা ছিল অনেকখানি। মর্মান্তিক বেদনার মুহূর্তে তিনি অবিচলিত থাকতে পারতেন। বেদনাকে তিনি অন্তরে চেপে রাখতে পারতেন।

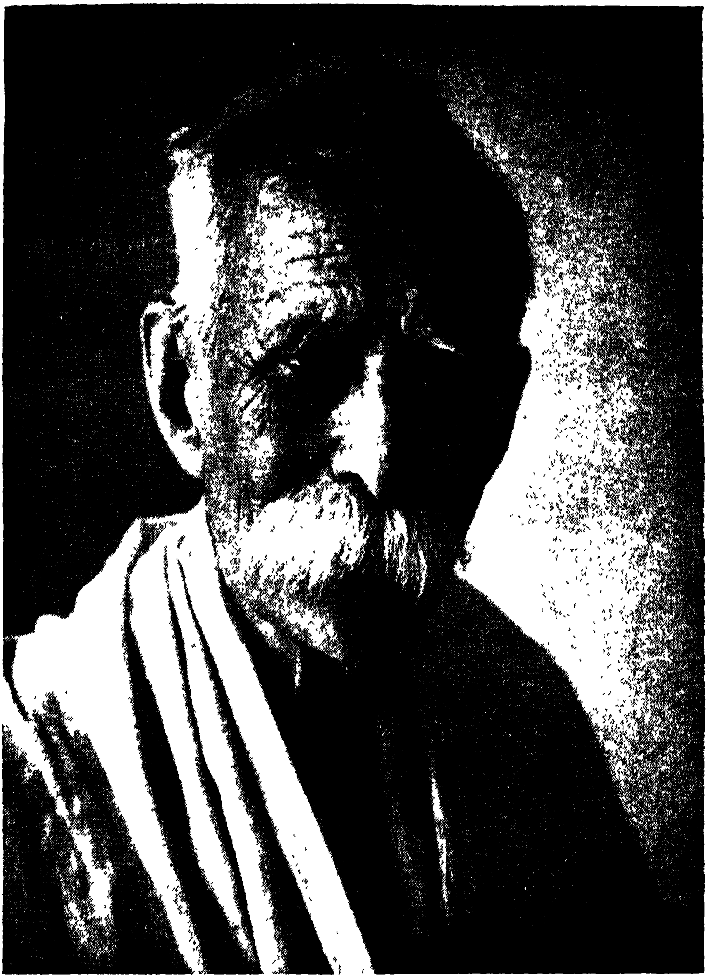
কিন্তু তবু মৃতপুত্রের চিতার সামনে বসে যখন পিতা বিমূঢ়, তখন তাঁর মনোবল যত দৃঢ়ই হোক, পিতার পুত্রশোককে চাপা দিয়ে অন্তরের শিল্পীকে সেই মুহূর্তে জাগিয়ে তোলা এক পরম আশ্চর্য ঘটনা বলে বোধ হয়। সম্ভবত 'শিল্পীকে' বলা ভুল হল। 'সাধককে'ই তিনি জাগিয়েছিলেন পুত্রশোককে চেপে রেখে। এই সাধক তাঁর অন্তরবাসী। ঘটনাটি এই —

শরৎচন্দ্রের এক বন্ধু তাঁকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই হোক বা মনটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই হোক, তাঁকে বলে বসলেন, তুমি যদি এই সময় মুখে মুখে রচনা করে গান গাইতে পার তা হলে দেখব তোমার মনের জোর কতখানি।

শরৎচন্দ্র মূঢ়বৎ তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে গান ধরলেন—

"দুখ দিয়ে বুক ভাঙবে তুমি
তাই ভেবেছ ভগবান?
আমি মার খাব তাও কাঁদব না কো
পরাণ খুলে গাইব গান।

দত্তাপহারী হলে?
নিলে জিনিস করে দান?
ভাগ্যে আমার হবে যা হোক
হলাম তোমার দুখের গ্রাহক,
তোমার ভাণ্ডারের দুখ খালি করে
করব দুখের অবসান।"



শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৫৪

এই গানের কথা যখনই ভাবি, শরৎচন্দ্রের মুখে গানসুদ্ধ কাহিনীটি যখনই শুনি, তখনই ভাবি, এও কি সম্ভব?

আমি 'দ্বিতীয় স্মৃতি'তে লিখেছি—

"এই মনোবলই সম্ভবত আজও তাঁর এই একাশি বছর বয়সেও তাঁকে খাড়া রেখেছে, বেঁকতে দেয় নি। মনের মেরুদণ্ডটি দৃশ্য হলে সন্দেহ রইত না যে সেটি ইস্পাতের তৈরী।"

নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন,

"গান ও কবিতার ভিতর দিয়ে দাদাঠাকুর অনেক কীর্তি করেছেন। সব কথা সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করাও যায় না। অনেক রকম বাধা আছে। এ কথা কেউ কি কখনো শুনেছে যে, কোনো কবি নিজেকে গালাগাল দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন? দাদাঠাকুর নিজের প্রতি অভদ্র-ভাবে কটূক্তি করে একাধিক কবিতা রচনা করেছেন এবং সে সব সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।"

আছে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাঁর যে উদ্দেশ্যে আত্মবিদূষণ রচনা, তেমনভাবে আর কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। তেমন কৌশলও আর কেউ সম্ভবত অবলম্বন করেন নি। আমি কিছু কিছু জানি। জানি, কিন্তু বলব না। তবে যে একটি ঘটনা শরৎচন্দ্র নিজে শতাধিক ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেছেন, সেটি বলতে বাধা নেই।

একখানা সহযোগী কাগজ অন্যায়ভাবে সরকারী খাতির পাচ্ছিল, শরৎচন্দ্রের কাগজকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে। আপন স্বার্থে সে কাগজ শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের অতিশয় বিরোধী ছিল। শরৎচন্দ্র ঐ কাগজকে জব্দ করার জন্য চাণক্যের ভূমিকা নিলেন। তিনি এমন একটি কূটবুদ্ধি খাটালেন যাতে এক ঢিলে তিন-চারটি পাখী মারা যায়। তিনি নিজেকে যাচ্ছেতাই গাল দিয়ে সুন্দর ভাষায় জোরালো এক কবিতা রচনা করে বেনামায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের সম্পাদককে পাঠালেন। শরৎ বিরোধী সম্পাদক সে কবিতা পেয়ে উল্লসিত। তিনি পরবর্তী সংখ্যাতেই সেটি ছেপে দিলেন এবং ভাবলেন এবারে শরৎ পণ্ডিতকে খুব জব্দ করা গেছে।

এর কয়েক দিনের মধ্যেই মহকুমা হাকিমের নামে এক বেনামা চিঠি ও তার সঙ্গে কাগজ থেকে কাটা ঐ কবিতাটি। চিঠিতে লেখা হল '—' কাগজ শরৎ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে যে কবিতা ছেপেছে সেটি আসলে আপনার বিরুদ্ধে লেখা কবিতা। এই কবিতাটি অ্যাক্রস্টিক, এর প্রতি লাইনের আদ্যাক্ষর

পরপর পড়ে গেলেই বুঝতে পারবেন সব।

পড়ে দেখলেন, সত্য কথা। ঐ কবিতাতে তাঁকে অতি জঘন্য ভাষায় গাল দেওয়া হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, সেই কাগজ রাজ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হল। তাঁর অ্যাক্রস্টিকের সাহায্যে শত্রুপক্ষকে দমন করার দৃষ্টান্ত বোধ হয় এই একটিই।

দুষ্ট ছেলের চরিত্র তাঁর যৌবনকাল পর্যন্ত বজায় ছিল, এবং দুষ্টের দমনে এই দুষ্টবুদ্ধি নানাভাবে কাজে লেগেছে। কার্তিকচন্দ্র সাহার ঘটনাটি বিখ্যাত। কার্তিকচন্দ্র ছিল চানাচুর বিক্রেতা, প্রায় নিরক্ষর, কিন্তু জেদের বশবর্তী হয়ে শরৎচন্দ্র তাকে জং মিং কং করে ছাড়লেন। ঐ সংক্ষিপ্ত তিনটি আদ্যাক্ষরের অর্থ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।

শরৎচন্দ্রের কাছে বসলে অবিরাম তাঁর কথা শুনতে হয়, না শুনে উপায় থাকে না, তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন শ্রোতাকে। তাঁর আকর্ষণী ক্ষমতা এনশেণ্ট ম্যারিনারের মতো, কিন্তু ঐ নাবিক একজন লোককে প্রায় জোর করে ধরে তাকে সম্মোহিত করেছিল তার কাহিনী শোনাবার জন্য, শরৎ-চন্দ্রের ক্ষেত্রে তার বিপরীতটা সত্য। অর্থাৎ তাঁকেই পথে থামিয়ে তাঁর কাহিনী শুনতে হয়, তিনি নিজেই সম্মোহিত হয়ে পড়েন।

কতদিক থেকে তাঁর পরিচয় দেওয়া যায় তা ভেবে পাই না। সহায়হীন শরণার্থীদের পক্ষ নিয়ে তিনি সব সময়েই প্রায় হাতে-কলমে কাজ করেছেন, এবং কথাটি আক্ষরিক অর্থেও সত্য। হাতেও করেছেন, কলমেও করেছেন। দুদিকেরই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি, আরও শতাধিক আছে, এবং প্রত্যেকটি শোনাবার মতো, যদিও তাঁর মুখ থেকে যাঁরা না শুনেছেন তাঁরা তার সম্পূর্ণ রসটুকু উপভোগ করতে পারবেন না।

শরৎচন্দ্র ভাষার যাদুকর, তাঁর কবিত্বশক্তি সহজাত, মুখে মুখে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী—কবিতা রচনায় অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী, নিজে গুণী অভিনেতা, ক্যারিকেচার করার ক্ষমতা তাঁর চমকপ্রদ, গান গাইতে ওস্তাদ, তাঁর চালচলন, খাওয়া-পরা সাধারণ বাঙালী থেকে স্বতন্ত্র, সব সময় সপ্রতিভ, উত্তর প্রত্যুত্তরে পাকা শিল্পী, নিজে টাইপ কম্পোজ করে স্ত্রীর সহযোগে নিজের হাতে-টানা ছাপাখানায় ছেপে নিজের সম্পাদিত কাব্য-পত্রিকা বিদূষক নিজে কলকাতার পথে গান গেয়ে ফেরি করে বেড়িয়েছেন। লোকনিন্দা, সমালোচনা, কটাক্ষপাত, কোনো দিকে দৃক্‌পাত নেই, কে কি বলছে তা কানে এলে তার মনোহর জবাব তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে যায়। হুকার-তাড়ানো

গোরা সার্জেণ্ট দেখে অন্যান্য হকারের মতো পালিয়ে না গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইংরেজী গানে তাকে মুগ্ধ করে তাকে সমস্ত বোতলপুরাণ বিক্রি করেছেন। ইংরেজী গান মগজযন্ত্রে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে গেল—তাঁর ঐ বোতলের আকারে ছাপা মদ্য-বিরোধী ছড়ায় কি বলা হয়েছে তার আভাস দিয়ে গান গাইতে লাগলেন—

Humour, satire, wit,
are in my publication.
Gentleman, take the bottle
for your relaxation······

ইত্যাদি

তাঁর চারিত্রিক "মাধুর্য এবং আলো" উচ্চপদস্থদেরও খুশির কারণ হয়েছে। রাজা, মহারাজা, লাটসাহেব, সবারই তিনি সমান শ্রদ্ধেয়। গভরনর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর একজন ভক্ত ছিলেন। তাঁর বাড়িতে শরৎচন্দ্রের উপযুক্ত সম্মান দিয়েছেন তিনি। শরৎচন্দ্র একদিন তাঁকে বললেন—"আপনার নাম ভুল।" "কেমন করে?" "সোজা কথা। আপনি আপনার উপার্জন সব দান করেন, আর আপনার নাম হরেন! আপনি তো হরণ করেন না?"

কখনো উল্টো কথা বলে সন্দেহ জাগিয়ে দেন, কখনো মজা সৃষ্টির জন্য মিথ্যা কথা অবলীলাক্রমে বানিয়ে বলেন। যেমন দিল্লীতে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের অতিথিরূপে অনেক ভি-আই-পির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। একদিন একখানা চিঠি লিখছিলেন, মোতিলাল নেহরু তা দেখে রসিকতা করে বলেছিলেন—পণ্ডিতজি কি ব্রাহ্মণীর কাছে চিঠি লিখছেন? কথা যেমন হয়েছিল, তেমনই উদ্ধৃত করি—

"Panditji, are you writing to your wife at home?"

"No, sir, she is my guaranteed wife."

"How so?"

"Guaranteed against writing a letter or receiving a letter. That is our family custom, sir. The husband cannot write a letter to the wife, and the wife cannot write a letter to the husband."

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলে যাচ্ছেন, 'আমাদের পারিবারিক প্রথা—স্বামী-

স্ত্রী কেউ কাউকে চিঠি লিখতে পারবে না।'

মোতিলাল নেহরু এ কথা শুনে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত। এমন হাস্যরসিক পণ্ডিতজি, এমন উদার, অথচ কি নিষ্ঠুর নিয়ম!

কথাটা মহম্মদ আলী জিনার কানে যেতে তিনিও চমকে উঠলেন। বললেন, This is indeed cruel, I should say more cruel than your suttee.

সতীদাহ প্রথরে চেয়ে নিষ্ঠুর! নির্মলচন্দ্র এ কথা শুনেই সব বুঝতে পারলেন এবং হেসে বলে উঠলেন, Panditji has fooled you all! His wife is illiterate! ওঁর স্ত্রী নিরক্ষর।

পাল্টা উত্তর দেওয়ার দৃষ্টান্ত এত আছে যে শুধু সেইগুলি সংগ্রহ করলে একখানা বই হতে পারত। দু-একটি মাত্র বিখ্যাত হয়ে আছে। গজেন্দ্র ঘোষের আড্ডায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের দেখা হতেই চট্টোপাধ্যায় বললেন, এই যে 'বিদূষক' ভাল? শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বললেন, এই যে 'চরিত্রহীন' ভাল তো? এই জবাব দিতে এক মুহূর্তও দেরি হয় নি শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের।

শরৎচন্দ্র জীবনটাকে যথার্থ অভিনয় রূপেই গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীটা রঙ্গমঞ্চ, আমরা যে যার ভূমিকা অভিনয় করে বিদায় নিচ্ছি, এ কথা আমাদের দেশে এত লোক বলেছেন যে, এবিষয়ে শেক্সপীয়ারের বিখ্যাত উক্তিটিতেও নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু এ তো গেল অস্তিত্বের একটি ব্যাখ্যা মাত্র। বুদ্ধি দিয়ে অথবা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা। কিন্তু এই জীবনদর্শনকে বিশ্বাস করে নিজেকে "ভবের নাট্যরঙ্গ মাঝে" একজন অভিনেতারূপে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেওয়া এ যুগে ক'জন পেরেছেন? এ কি সহজ কথা?

এঁর জীবনকথা নিয়ে নলিনীকান্ত সরকারের লেখার উপর ভিত্তি করে সিনেমা ছবি তৈরি হয়েছে, আমি সে ছবি দেখি নি। কারণ আমার আসল মানুষটির সঙ্গে যে পরিচয়, পাছে তা নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয় ছিল।

বিখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস ঐ ছবিতে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ভূমিকা অভিনয় করেছেন এইটুকু জানা ছিল আমার। ছবি বিশ্বাসের দুর্ঘটনায় মৃত্যু (১১-৬-৬২) আমাদের সবার কাছেই দুঃখের হয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তাঁর কিছু পরিচয়ও ছিল। শরৎচন্দ্রও খুব দুঃখ পেয়েছিলেন এই মৃত্যুতে। আমি এর মাস ছয়েক পরে গম্ভীরভাবে শরৎচন্দ্রকে বলে-

ছিলাম, ছবি বিশ্বাসের জীবনী ফিল্ম হচ্ছে তাতে আপনাকে তাঁর ভূমিকায় নামতে হবে।

অভিনয়ের কথা শুনেই বললেন, হাজার মানুষের ভূমিকা অভিনয় করেছি, আর ওটা পারব না যে ভাই?

এই প্রসঙ্গে মনে আসে শরৎচন্দ্র শিশিরকুমার ভাদুড়ির এক জন্মদিনে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হলে দাঁড়িয়ে উঠেই বলতে আরম্ভ করলেন, "আমি শিশিরের চেয়ে বড় অভিনেতা।"

সবাই উৎকর্ণ।

তারপর বললেন, "শিশির যে অভিনয় করে তা তার জানা জিনিস, কোন্ দৃশ্যের পর কোন্ দৃশ্য আসবে সব মুখস্থ। কোন্ কথার পর কোন্ কথা বলতে হবে সব মুখস্থ। আগে অনেক দিন ধরে তার রিহার্সাল দেওয়া থাকে, উপরন্তু পার্ট মনে করিয়ে দেবার জন্য প্রম্পটার থাকে। কিন্তু আমি যে অভিনয় করি তার পরমুহূর্তে কি হবে জানি না, কি বলতে হবে জানি না, আমার নাটকের প্লট আগে জানি না, তবু সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে চলেছি।—অতএব বড় অভিনেতা আমি।"

কাজি নজরুল ইসলাম শরৎচন্দ্রকে বিশেষ মান্য করতেন। নজরুলও কথায় pun ব্যবহার করতেন খুব, এবং তার অনেকখানি শরৎচন্দ্রের প্রভাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নজরুল তাঁর "চন্দ্রবিন্দু" নামক গানের বইখানা শরৎচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে—হে হাসির অবতার। লহ গো চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার"—নজরুল।

দ্রুত গান মুখে মুখে রচনা সুরসমেত কঠিন কাজ, কিন্তু সেই কঠিন কাজও এক আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন একবার—নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে। সেখানে অমৃতলাল বসু প্রমুখ গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। আদেশ হল, মুখে মুখে রচনা করে গাইতে হবে। শরৎচন্দ্র বললেন আগের রচনা গেয়ে তো ঠকাতে পারি। তখন আদেশ হল ঐখানে এতক্ষণ যে সব বিষয় আলোচনা হয়েছে সেই বিষয়ে গান গাইতে হবে। শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক কঠিন মিল দিয়ে গান আরম্ভ করলেন। অমৃতলাল বলেছিলেন, হায় রে, পণ্ডিত ঠকে যাবে এবারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র শুধু ঠকেননি তাই নয়, তাঁদের স্তম্ভিত করেছিলেন অপ্রত্যাশিত শব্দের আমদানি করে, মিল সম্পূর্ণ ঠিক রেখে। সেই দিনের সেই গান তাঁর মুখে অনেকবার শুনেছি সমস্ত কাহিনী সমেত।

সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে এক আশ্চর্য কৌশলপূর্ণ কবিতা লিখে দু রকম কালিতে হাফ-ক্রাউন সাইজের কাগজে ছাপিয়েছিলেন। তার নাম "তেইশে জানুয়ারী—নেতাজীর জন্মদিনে পদ্ম বন্ধে শ্রদ্ধা নিবেদন (আনন্দ-বাজার ২৩-১-৪৬)।"

লাল রঙে পদ্মের ছবি, তার ভিতরে ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ কবিতাটি ছাপা। প্রত্যেক লাইনে পর পর সংখ্যা চিহ্ন দেওয়া আছে, যাতে এক নম্বর থেকে আরম্ভ করতে ভুল না হয়। পদ্মের ভিতরে দুটি লাল চক্ররেখা আছে এবং সেই রেখা দুটি যথাক্রমে সূর্যরশ্মির ভঙ্গিতে সাজানো কবিতার লাইনগুলিও অষ্টম ও চতুর্দশ অক্ষরগুলি স্পর্শ করে গেছে। এবং স্পৃষ্ট অক্ষরগুলিও লাল। এই দুটি চক্ররেখার বাইরে অথচ পদ্মরেখার ভিতরে, কবিতার প্রত্যেক লাইনের দ্বিতীয় অক্ষরটিও লাল। মাঝখানে অর্থাৎ কেন্দ্রে, বৃন্তের মধ্যে, সুভাষচন্দ্রের ছবি। না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না, তবু আমি কবিতার প্রথম দশ লাইন সাধারণ কবিতার মতোই উদ্ধৃত করে একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করছি—

মনের মানুষ অনেক পেয়েছি শুনেছি অনেক দেখেছি কত
মাতামাতি করি যা তা করিয়াছি গতানুগতিক লোকের মত।
আজীবনকাল বাজী দেখাইল বাজীকর দল সাফাই হাতে
অসুস্থ করিল বসুমতী মায়ে অসুর স্বভাব চোর ডাকাতে।
এ ভারতভূমি শোভার আধার অভাব এদেশে ছিল না কিছু,
বিষ ঢালি এতে শেষ করিবারে পাষণ্ড দল লাগিল পিছু।
সুচতুর যত কুচক্রী-কপট সূচ হয়ে ঢুকে হইল ফাল,
ইন্দ্রজালবলে চন্দ্রদেব সাজি কেন্দ্রমাঝে পশে রাহুর পাল।
অবরুদ্ধ নর সব নিজগৃহে ধীবরের জালে যেমন মীন,
অসুবিধা ভোগে বসুধা মাঝারে অসুখী মানব অধীন দীন।

উপর থেকে দ্বিতীয় অষ্টম ও চতুর্দশ অক্ষরগুলি নিচের দিকে পড়ে গেলে তিনটি জায়গায় পাওয়া যাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আর বত্রিশ লাইনের সমস্ত কবিতায় ঐ তিনটি জায়গাতেই পাওয়া যাবে, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জনম লভিল ধরায় আজি গঠন করিতে আজাদ হিন্দ।" আমি আরম্ভের দশটি লাইন মাত্র উদ্ধৃত করেছি। অথচ সমস্ত কবিতারও একটি সুসম্পূর্ণ অর্থ আছে।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে যে যে উপাদান পাওয়া যায়,

তার অনুপাত শতকরা হিসাবে এই রকম দাঁড়ায়—

বিদূষক	৮
কৌটিল্য	১২
বিদ্যাসাগর	২২
বীরবল	১০
গোপাল ভাঁড়	১০
মুকুন্দ দাস	৮
শরৎ পণ্ডিত	৩০
	১০০

শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মার্জিন রেখেছি ৩০, তা আর কারো সঙ্গেই মেলানো যাবে না।

এই চরিত্র সম্পর্কে আমি 'দ্বিতীয় স্মৃতি' থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করছি—

—"একদিকে প্রখর আত্মসম্মানবোধ তাঁকে যেমন ভিক্ষা করতে বাধা দিয়েছে, তেমনি তা বারে বারে তাঁকে দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করেও তাঁকে কদাপি পরাস্ত করতে পারে নি। মঙ্গলকাব্যের যাবতীয় দেবতা এঁর সঙ্গে লড়াই করতে এলে হেরে যেতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

শরৎচন্দ্র মানুষের অনুগ্রহ দান যেমন প্রত্যাখ্যান করেছেন, দেবতার কাছেও তিনি কখনো হাত পাতেননি। এ বিষয়ে কত যে গল্প তাঁর কাছে শুনেছি। সরস্বতীর কাছে কখনো বিদ্যা ভিক্ষা করেননি, করতে হবে ভয়ে পুজো করেননি। স্ত্রী দুর্গার কাছে সন্তানের অসুখ ভাল করার জন্য পুজো দিতে গিয়েছিলেন শুনে বলেছিলেন, যে-দুর্গা তাঁর ছেলের শুঁড় ভাল করতে পারেন না, তিনি তোমার ছেলের অসুখ ভাল করবেন কি করে? নিজ পুত্রের মৃত্যু হলে তিনি সান্ত্বনাদাতা বন্ধুকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে আমরা সবাই রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছি, ওর মেয়াদ ফুরিয়েছে আগে চলে গেল।

এর মধ্যে বিদূষক কোথায়? এ যে জীবন সাধনার এক চরম পর্যায়ের ছবি। কিন্তু এখানেও সেই পরাজয় স্বীকার না করার দৃষ্টান্ত।

ঠাকুর দেবতা সম্পর্কে রসিকতা লেগেই আছে। ১৯৬৩ অক্টোবর মাসে যখন তিনি একটা দিন কাটিয়ে গেলেন আমাদের সঙ্গে, সেদিন একসময় পুত্র হিমানীশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, রবি ঠাকুরকে দেখেছেন আপনি?

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "দেখি নি, তবে দেখা হলে বলতাম, আপনি যেমন 'ঠাকুর' আমিও তেমনি 'পণ্ডিত'।

উস্কানি দিলেই রস উপচে পড়ে।

জীবনকে কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ফেলার কথা কোথাও নেই। জীবনের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে প্রাচীন যে সব মহৎ বাণী আছে, তা তো একান্তভাবে তপশ্চর্যায় পেতে হয়, কিন্তু তা যে সাধারণ জীবনের ভিতর দিয়েই প্রতি মুহূর্তে পেতে পেতে এগিয়ে চলা যায় তার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। অথচ শরৎচন্দ্র তো পূর্ণ জীবনই যাপন করেছেন, শুধু "মা গৃধঃ" নীতিকে জীবনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করে।

তাঁর সম্পর্কে এত বলা যায় যে শেষ হতে চায় না। এমন সহজ মানুষ, অথচ কি উদার এবং কি কঠিন। বহু গুণের একত্র সমাবেশ—সহ-অবস্থান। অন্যায়কে ক্ষমা করেননি, সেখানে তিনি নিষ্ঠুর। অন্য দিকে যেখানে মনুষ্যত্ব সেখানে তিনি কত বড। কত দরিদ্র ছাত্রের বই কিনে দিয়েছেন, অর্থসাহায্য করেছেন, নিজে টাকা দিয়ে তাঁর ভূতপূর্ব দরিদ্র শিক্ষককে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। যে পরিমাণ দিয়েছেন, সেই পরিমাণ নিজেকে বঞ্চিত করেছেন।

সততার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তিনি তাঁর নিজ হাতে কম্পোজ করা এবং হাতল টেনে ছাপার যন্ত্রে স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপার ভার নিতেন, এবং ঠিক সময়ে ছেপে দিতেন। একবার অল্প সময় ছিল, সেবারে তিনি এগারো দিন ছাপাখানায় শুধু মুড়ি খেয়ে দিনরাত কাজ করে ঠিক সময়ে প্রশ্নপত্র ছেপে দিয়েছিলেন। একবার ত্রিশ মাইল দূরের এক স্কুলে যাবার ট্রেনটি অচল হওয়ায় সেখানে হেঁটে গিয়ে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

দুঃখকে হেসে উড়িয়ে দেবার আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা আছে। বর্ষা-কাল, রাত্রে প্রবল বৃষ্টি, খড়ের চাল ভেদ করে বিছানায় জল পড়ছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে সেখান থেকে বিছানা সরিয়ে এককোণে সরে গেলেন, কিন্তু সেখানেও জল পড়ে! তারপর যে দিকেই সরে যান, সেখানেই জল, অতএব সমস্ত রাত বৃষ্টির জলের নিচেই কাটালেন।

এই ঘটনায় কি তিনি নিজের দারিদ্র্য স্মরণ করে ভাগ্যকে দোষী করে-ছিলেন? মোটেই না। তিনি এটিকেও বর্ণনা করার সময় হাসির উপাদান রূপে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই থেকে ভাই জ্যামিতি শিখেছি ভাল করে। একেবারে হাতে-কলমে। মানে, দেখলাম এক কোণ

আর এক কোণের সমান, এবং সব কোণ সেই কোণের সমান, অতএব কোণগুলি পরস্পর সমান। Things which are equal to the same thing are equal to one another.

অনেক বিষয়েই বালকের মতো সরল। ১৯৬২ সালে তিনবার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। সে সময় একদিন তাঁর ছবি মুভি ক্যামেরায় তুলেছিলাম। আর এক দিন যখন সে ছবি দেখাতে আরম্ভ করেছি, তিনি বলে উঠলেন, কৈ, কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না? আমি পিছন ফিরে চেয়ে দেখি, তিনি পর্দার দিকে না তাকিয়ে প্রোজেক্টর যন্ত্রের দিকে চেয়ে আছেন।

১৯৬৩ সালে ১৫ অক্টোবর এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। কিন্তু তার আট দিন আগে ৭ই অক্টোবর আমার পুত্র শতদলকে যে চিঠি লেখেন তার অংশবিশেষ এই—

"...আমি বর্তমানে ৮২ বছর ৬ মাসের শয্যাশায়ী খোকা। যাতায়াত করা ডাক্তার বন্ধ করেছেন। পোস্ট বক্সেও (হাওড়া থেকে বীডন স্ট্রীট) যেতে পাই না।...আমি রোজ দুবেলা যবের ছাতু, রাইটার্স বিলডিঙের নীচে যে মধু বিক্রি হয় তারই চাটনি দিয়ে জল ও নুন দিয়ে মেখে খাই। জঙ্গিপুরে আমার রাজধানীতে ঘোর বিভ্রাট...। তুমি আমার পত্রের আশায় থাকো। একটু চলাফেরা করতে পারলে ভূষণ দাসকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোমার পিতৃদেবের কুশল মাঝে মাঝে জানাবে। শুভকামনা ছাড়া শক্তি নাই।"

—শ্রীশরৎচন্দ্র।

অসুস্থ, ডাক্তারের নির্দেশ চলাফেরা চলবে না, বয়সের উল্লেখ আছে। কিন্তু ভাষার সরসতা অদম্য। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমার অসুখের কথা শুনে এমন অবস্থাতেও এর আটদিন পরে, কোথায় চলেছেন বাড়িতে না বলে, সকাল ৮ টার সময় আমার কাছে এসে হাজির!

আমার এই লেখা প্রথমেই একখানা চিঠি দিয়ে আরম্ভ করেছি, শেষও করা গেল একখানা চিঠি দিয়ে। দুই চিঠির ব্যবধান সাত বছর। শরৎচন্দ্রের বয়স ৭৫ থেকে ৮২ অতিক্রম করেছে ১৯৬৩ সনে। বয়স বদল হয়েছে, ভাষা ও চরিত্রের বদল হয় নি। এ পর্যন্ত হিসাবের মধ্যে আসে। যেটুকু হিসাবে ধরা যায় না, তা অতলস্পর্শ।

১০-৩-৬৬

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৮৮৩—১৯৬১

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর (১৯৩২-৩৩) আগে চারুচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। কিন্তু কোথায় কি উপলক্ষে তা আর এখন আমার মনে পড়ে না। কারণ সে পরিচয় মৌখিক পরিচয়, এবং তার ধারাবাহিকতাও ছিল না। ধারাবাহিকতা রাখতে পারলে স্মৃতিরও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

প্রথম পরিচয়ে তাঁকে 'বেপরোয়া' দলের মানুষ বলে মনে হয় নি। বেপরোয়া নামক অসাময়িক (আসলে সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী অর্থে) পত্রিকাখানি ১৯২২-২৩ সনে প্রকাশিত হয়। এই দলের প্রধান পুরোহিত ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯২৫ সনে। 'বেপরোয়া' অবশ্য আগেই পড়া ছিল কিছু এবং তখন থেকেই তার কার্টুন ছবি ও ব্যঙ্গকবিতার অংশবিশেষ মনে গাঁথা ছিল। কিন্তু তার মধ্যে চারুচন্দ্রের স্থান কোথায় তা আমার জানা ছিল না। তাঁকে তখন ফিজিক্স্-এর অধ্যাপকরূপেই জানা ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সাহিত্যরসের আকর্ষণ কোন্ সূত্রে তা তখন বুঝতে পারি নি, বুঝতে চেষ্টাও করি নি। অথচ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ডাক্তার হয়েও সাহিত্যিক অথবা শিল্পী কেন, এ প্রশ্ন কিন্তু মনে আদৌ জাগে নি, কারণ তিনি কতখানি ডাক্তার তা দেখবার অবসর তিনি দেন নি, কারণ তিনি ব্যঙ্গসাহিত্য ও চিত্র রচয়িতারূপে অতি প্রবলভাবে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন।

চারুচন্দ্রের স্বভাববৈশিষ্ট্য পরে যা দেখলাম, তাতে বোঝা গেল, তাঁর পক্ষে কোথাও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। মোটামুটিভাবে নেপথ্যে থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব।

কিন্তু তাই বলে পথ্যে নয়।

পথ্যে তাঁর যে দুঃসাহস ছিল, তাতে তিনি প্রাচীনকালের বাঙালী ভোজন-বীরদের সঙ্গে প্রায় সমান আসন দাবি করতে পারেন। কিন্তু তাঁর এ সব স্বভাবশৈষ্টা প্রথম দিকে সামগ্রিকভাবে আমার অজানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর একটি আচরণে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই।

ঘটনাটি বাইরের দৃষ্টিতে সাধারণ, তবু সাধারণ তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়েই

মানুষের আসল পরিচয় অনেক সময় পাওয়া যায়। ১৯৩৩ সাল। ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় হয়ে এসেছে। একদিন সকালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল একটি রোল নম্বর নিয়ে। তিনি ছিলেন তখন ট্যাব্যুলেটর। তিনি আমার ঠিকানা রেখে দিয়ে অপরাহ্ণে এক ভদ্রলোক মারফত আমাকে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা তখন একই পথের বাসিন্দা। যাঁকে আগে ফলাফল জানানো বিষয়ে সকালে কড়া কল্পনা করেছিলাম, তাঁরই এক দূত অপরাহ্ণে আমার দরজার কড়া নেড়ে জানিয়ে দিলেন আমার ধারণা ভুল। সেই থেকে তাঁকে আর ভুলি নি।

একটি স্নিগ্ধতা ছিল তাঁর ব্যবহারে। তাঁর হাসিটি ছিল তাপহীন আলোর মতো। এই সহজ মানুষটির সঙ্গে পরে অল্পদিনের জন্য কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠন উপলক্ষে। অল্পদিনের জন্য বলছি, কারণ কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যে পরিমাণ সময় দিলে আমার মনে একটা তৃপ্তি হত, তা দেওয়া সম্ভব হয় নি বলে, এবং অন্যান্য নানা কারণে আমাকে পরিষদ ছেড়ে আসতে হয়েছিল। ভেবেছিলাম পরিষদের উদ্দেশ্য যখন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচার, তা বাইরে থেকেই করা যাবে। করেছিলাম যথাসাধ্য, এবং এখনও করি—কিন্তু পরিষদ এবং আমি এ বিষয়ে সমান অসহায়। পরিষদ তবু তো তার সীমাবদ্ধ কাজে আত্মতৃপ্ত, আমার কাজের সীমা নির্দিষ্ট না হলেও সক্রিয় বাধা সাধারণ সাময়িক পত্রিকাদি থেকে আসে। সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হয়। বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার সম্ভব যাতে না হয়, তারই জন্য বাইরের এই আয়োজন অতি শক্তিশালী। চারুচন্দ্র জীবিত থাকলে সম্ভবত লড়াইয়ে কিছু জোর পাওয়া যেত। তবে রাজশেখর বসু হেরে গিয়েছেন, তিনি চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞানের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বলবার আর কেউ জীবিত নেই এখন।

চারুচন্দ্রের সঙ্গে পরে বিশ্বভারতী অফিসে মাঝে মাঝে দেখা হত। তিনি সেখানে যেতেন তাঁর নিজস্ব অধিকার বলে। বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। আমি যেতাম পুলিনবিহারী সেনের কাছে, নানা উপলক্ষে, কখনো বিনা উপলক্ষে।

আমি প্রবেশিকা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষক থাকাকালে (পুলিনবাবু ছিলেন প্রথম পত্রের পরীক্ষক) পরীক্ষার খাতা থেকে কিছু কিছু উদ্ভট উত্তর

টুকে রাখতাম, এবং নানা পত্রিকায় তা ছাপাও হয়েছে। চারুচন্দ্র পেপার-সেটার বা প্রশ্নপত্র রচয়িতা ছিলেন। তিনিও ছেলেদের উত্তরপত্র থেকে কয়েকটি "হাউলার" টুকে রেখে পুলিনবাবুর হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন সেই "হাউলার"-গুলিও আমি আমার প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। প্রবন্ধটি আমার 'সপ্তপঞ্চ' (মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ) বইতে আছে। কৌতুককর ব্যাপারে চারুচন্দ্রের মগজের কৌতুককেন্দ্র কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠত, এ থেকেও তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমি সেই সব নমুনা পুনরুদ্ধৃত করছি। তিনি লিখছেন—

"এবার ম্যাট্রিকের সায়েন্সে আমারই একটি প্রশ্ন ছিল—মানবদেহে রক্ত চলাচলের রীতি বর্ণনা কর—Describe the circulation of blood in the human body. একটি ছেলে এর উত্তরটা ঠিকই লিখেছে, কিন্তু শেষে লিখেছে—কিন্তু আজ সাম্প্রদায়িক যে অত্যাচার চলছে তাতে আমাদের রক্ত স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুত চলছে, ইচ্ছে হচ্ছে অস্ত্র নিয়ে বেরোই। আর আমি থাকতে পারছি না, আমি এক কবিতা লিখি—

"এর পর তিন পাতা কবিতা চলল। শেষে লিখেছে, কবিতাটি আমি এখানেই রচনা করলুম। কি রকম হয়েছে, সার ?"

চারুবাবু সংস্কৃত ও ইংরেজী উত্তরপত্র থেকেও কিছু নমুনা ঐ সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে কয়েকটা উপহার দিচ্ছি।

অনুবাদ সংস্কৃত থেকে—"বাতেন উদরং পূরয়িত্বা—filling the belly with gout" [বাত বায়ু অর্থে, বুঝতে পারে নি।]

বাংলা থেকে ইংরেজী—"এক শৃগাল এক দ্রাক্ষান্তবক—A jackal seeing a heron in grapes." [দ্রাক্ষাস্থ বক ভেবেছে।]

বাংলা প্রথম পত্র থেকে—"রামের সুমতি গল্পে লিখছে : 'রাম অনেকবার সুমতির পরিচয় দিয়েছে। দশরথ যখন তাকে বনে যেতে বলল সে কোনো প্রতিবাদ না ক'রে গেল। ইত্যাদি।"

বাইরে বাইরে স্থিরাচারী ব্যক্তিটি অন্তরে অন্তরে পুরো রসিক ছিলেন। কিন্তু শুধু সাহিত্যরসিক ছিলেন তাই নয়, ভোজনরসিক একটু বেশিই ছিলেন। এবং বাইরে বাইরে প্রচার ছিল তিনি gourmet, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিলেন gourmand। 'গুরমে' প্রকৃত ভোজনরসিক, কিন্তু 'গুরমাঁ' একমাত্র অগ্নিদেবের সঙ্গে তুলনীয়। দৃষ্টান্ত অবশ্যই দেব। আমি প্রথম তাঁর এই বিলাস লক্ষ্য করি ৭২ বকুলবাগান রোডে। উপলক্ষ বলি। ১৯৩০ সনের

২২শে জানুয়ারি তারিখে আমি এই চিঠিখানা পাই—লেখক রাজশেখর বসু—

"প্রীতিভাজনেষু······আগামী শুক্রবার ২২ জানুয়ারি বিকালে আন্দাজ পৌনে চারটের সময় আপনার কাছে গাড়ি যাবে। চারুবাবু থাকবেন।"······

এই ২২ জানুয়ারি (১৯৬০) যা যা ঘটেছিল তার একটি বর্ণনা লিখেছিলাম এবং চারুচন্দ্র তাঁর সম্পাদনাকালে তা বসুধারায় (১৩৬৭, বৈশাখ সংখ্যা) ছেপেছিলেন। তার থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করি—

"উৎকৃষ্ট সব খাবার এসে গেল। তখন চারুচন্দ্র একটু যেন মাত্রাতিরিক্তরূপে সবাক হয়ে উঠলেন বলে মনে হল। নিজে থেকেই বয়সের কথা তুলে বললেন, আমি ৭৭, যতীন্দ্রকুমার [সেন] ৭৮, আর রাজশেখর ৮০। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি শিশু—শিশু।···

"চারুচন্দ্র আরও বললেন, তাঁর ৭৭ বছর বয়সেও সবগুলো দাঁত স্বস্থানে আছে, একটিও স্খলিত হয় নি। শুনে সে সময় একটি কথাও বলতে পারলাম না, কেন না আমার দুপাশের দুটি দাঁত নেই। সুতরাং নীরবে, তিনি ৩২টি দাঁতে এবং আমি ৩০টি দাঁতে সম্মুখস্থ খাদ্যবস্তু নিষ্পেষিত করতে লাগলাম।"

খুব বড় কচুরি এবং সিঙাড়া প্রতি প্লেটে বোধ হয় ৮টি করে ছিল। তার উপর ছিল কয়েকটি করে বড় বড় সন্দেশ। চারুচন্দ্র অবলীলাক্রমে সেগুলি সাবাড় করলেন। মনে পড়ছে, শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনও প্লেট শূন্য করে ফেলেছিলেন। আমি শুধু দুখানা সিঙাড়া ও কচুরির বেশি খেতে পারি নি। মিষ্টি একেবারেই খাই নি। আমাকে এই কারণেই শিশু বলেছিলেন, নিজের হজমশক্তির পক্ষ সমর্থনে।

কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস, রাজশেখরের বাড়িতে বসে এই খাওয়া তাঁর লুকিয়ে খাওয়া, বাড়িতে এ খাওয়া চলত না। কারণ তিনি এর নয় বৎসর আগে লিখেছিলেন, "আজ পঁয়ত্রিশটা লেডিকেনি খাওয়া চারু ভট্চাজ পারের ঘাটে এসে পৌঁছেছে, এখন তার রাত্তিরের খাওয়া হল দুখানা রুটি।"

অবশ্য এটুকু পড়ে বোঝা যায় না যে তিনি বাইরে নানাস্থানে নানা অখাদ্য (তাঁর বয়সের পক্ষে) খেয়ে এসে রাত্রে দুখানা রুটি খেতেন কি না। কিন্তু পঁয়ত্রিশটা লেডিকেনি খাওয়ার ব্যাপারটা খুব মজার। তাঁর নিজের কথাতেই বলি—

আমি ছিলুম আমাদের বংশের কুলাঙ্গার, তবু আমার কীর্তিকাহিনী

উল্লেখ করি। তখন সবে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। সাতই পৌষের উৎসবে আমরা সব গিয়েছি। দুপুরবেলা একসঙ্গে খেতে বসা হয়েছে। শেষে মিষ্টি এল, লেডিকেনি ও দরবেশ। আমার ঠিক পাশে বসেছিলেন শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ। খাইয়ে বলে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। বললুম, জ্যোতিষবাবু, আসুন, মিষ্টিতে কম্পিটিশন লাগান যাক। জ্যোতিষবাবু তখনই আমার চ্যালেঞ্জ আক্সেপ্ট করলেন। হয় লেডিকেনি, না হয় দরবেশ, একটা ওঁর পাতে একটা আমার পাতে, এই রকম চলতে লাগল। চৌত্রিশটায় যখন দাঁড়াল তখন বুঝলুম একটু কষ্ট হচ্ছে। জ্যোতিষ বাবুর দিকে চেয়ে দেখি তাঁর চোখ দুটো ঠেলে বেরবার জো হয়েছে। তাঁকে দিতে গেলে তিনি বললেন, আর না। আমি বললুম,—আর একটা। জয়মাল্য আমার গলাতেই এসে পড়ল, কিন্তু আমার অহঙ্কার স্থায়ী হল না। পরদিন সকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছি, তিনি বললেন,

'চারুবাবু, আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে কায়স্থ জ্যোতিষ ঘোষের কাছে খাওয়ায় হেরে গেলেন।'

'না আমিই জিতেছি, আপনি ভুল খবর পেয়েছেন।'

'না আপনার হার হয়েছে।'

'কি করে হল, আমি পঁয়ত্রিশটা খেয়েছি, আর জ্যোতিষবাবু খেয়েছেন চৌত্রিশটা।'

'আপনারই হার হয়েছে। তবে শুনুন। রাত্তির আটটার সময় যখন শুতে যাব, তখন একটু অস্বস্তি বোধ করলুম, আপনারা দুজনে কে কেমন আছেন। একজনকে বললুম, একবার যা তো গেস্ট হাউসে, চারুবাবু ও জ্যোতিষবাবু কি করছেন দেখে আয়। কোনো কথা জিজ্ঞেস করিসনে, শুধু দূর থেকে তাঁদের দেখে ফিরে আসবি। সে এসে বলল, ওঁরা সকলে গল্প করছিলেন, এমন সময় রাত্তিরের খাবারের ডাক এল। চারুবাবু বললেন—আমি খাব না শুতে যাই, জ্যোতিষবাবু খেতে গেলেন। বলুন, হার হল কার?'

বিশ্বভারতী সবে স্থাপিত হয়েছে, তা হলে ধরতে হবে সেটি ১৯২০-২১ সন। অতএব তখন চারুবাবুর বয়স প্রায় ৩৮ বছর। ৩৮ বছরে অন্যান্য খাওয়ার শেষে ৩৫টি মিষ্টান্ন ভক্ষণ উল্লেখযোগ্য অবশ্যই, এবং আমি তাঁর ৭৭ বছর বয়সে খুব বড় আকারের কচুরি সিঙাড়া মিলিয়ে গোটাআষ্টেক এবং তৎসহ বড় বড় ছুটি সন্দেশ ভক্ষণ দেখে তাঁর এই অবনতিতে দুঃখ পেয়েছিলাম

কি না মনে নেই, তবে তিনি আহার ব্যাপারে সে সময় আমাকে শিশু বলাতে আমি যে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শান্তিনিকেতনে জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে ভোজন প্রতিযোগিতার কথাগুলি তাঁর "খাদ্য জিজ্ঞাসা" নামক প্রবন্ধ (শারদীয় যুগান্তর ১৩৫৮) থেকে উদ্ধৃত। এই প্রবন্ধটি আমিই তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছিলাম। এতে তিনি একই সঙ্গে ভোজন-রসকথা, সাহিত্য পর্যায়ের রসিকতা এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিরাপদ বিধিভঙ্গের কথা আশ্চর্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিধি অমান্য করেই অনেকে বেশি স্বাস্থ্য লাভ করেছেন, কিংবা অনেকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কিছুই না জেনে আজীবন সুস্থ থেকেছেন, এসব প্রসঙ্গে, তিনি স্বয়ং বিজ্ঞানসেবী হওয়া সত্ত্বেও, মুক্ত মনে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন, যে জন্য এই রচনাটি বহু দিক দিয়ে মূল্যবান হয়ে উঠেছে। সব চেয়ে মন ভোলে তাঁর বর্ণনা-ভঙ্গিতে। আরও সামান্য একটুখানি নমুনা দিতে লোভ হচ্ছে—(প্রায় গোড়া থেকেই আরম্ভ করছি)—

> অনেক দিন আগেকার কথা। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সবে ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছেন। তখনও ভাইটামিন আবিষ্কৃত হয় নি অথচ আমরা বেশ সুস্থ সবল আছি। অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ খাদ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করছেন। প্রত্যেকের প্রত্যহ এতটা পরিমাণ ক্যালরি খেতে হবে, খাদ্যে এই পরিমাণ শর্করাজাতীয়, এই পরিমাণ চর্বিজাতীয় জিনিস চাই, এতটা পরিমাণ প্রোটিন পেটের মধ্যে চালান করতে হবে—এই সব বলে যাচ্ছেন।...তখন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওই সব নতুন তথ্য শুনে চলেছি, আর কথাগুলো মগজের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছি। কি আশ্চর্য! এ সব কিছুই জানতুম না, অথচ বেঁচে রয়েছি। যা হোক কাল থেকে ঠিক ওই হিসেবে খেতে হবে। হাতের পেশীটা টিপলুম...! অধ্যাপক মশায় তাঁর বক্তৃতার শেষে বললেন—আমি এতক্ষণ যা বললুম, তা একজন সাধারণ লোকের পক্ষে খাটে, কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলর সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর সিকি পরিমাণ খেয়ে সুস্থ ও সবল আছেন, আর বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর এর চারগুণ খান, তাঁর শরীরও বেশ ভাল।
>
> ও হরি, এর নাম কিছু কিছু ব্যতিক্রম! একশ'র জায়গায় এক দিকে

পঁচিশ আর অন্য দিকে চার শ'। এই রকম যার ব্যতিক্রম তাকে বিজ্ঞান বলতে হবে! সব উৎসাহ চলে গেল, এখন ব্যতিক্রম খুঁজতে লাগলুম। বেশি দূর যেতে হল না, বাড়িতেই মিলল। আমার জাঠতুতো দাদা আমার চেয়ে ছ' বছরের বড় ছিলেন। দুজনে অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগছি, শেষে দার্জিলিং গেলুম। লুই জুবিলি স্যানিটেরিয়মে থাকি। কয়েক দিনের মধ্যে দাদার শরীরের কি রকম উন্নতি হল বলছি। শেষের দিকে রাত্তিরের খাওয়ায় রুটির সংখ্যা ছাপ্পান্নতে উঠল, উপযুক্ত পরিমাণ তরকারি, মাংসটা নিতে হল স্পেশাল। খাওয়া দেখবার জন্য চারদিকে ভিড় জমে যেত। একদিন জিজ্ঞেস করলুম, আর পার? বললেন, কি জানি, রুটি কি না, চোয়াল ব্যথা করে যে!

এর পর আশ্চর্য সব ব্যতিক্রম-কথা দিয়ে সাজানো হয়েছে তাঁর এই রচনাটি। রচনা রসনা-বিষয়ক বলেই এতে তিনি এতটা রসসিঞ্চন করতে পেরেছেন। নিজ নিজ প্রিয়বস্তুই তো কাব্যের প্রেরণা। এই দীর্ঘ রসসমৃদ্ধ রচনারটির শেষে চারুচন্দ্র আর এক ভোজনরসিককে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। এই সাক্ষী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চারুচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি দিয়ে তাঁর রচনা শেষ করেছেন সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আমি তার অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

অসংকোচে করিবে ক'ষে ভোজনরসভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ।
যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত রবে, কিসের ভয়,
না হয় হবে পেটের গোলযোগ।
কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ডর
সুখভোগের হারাস অবসর।
জীবন মিছে দীর্ঘ করা
বিলম্বিত মরণে মরা
শুধুই বাঁচা না খেয়ে ক্ষীর সর।
দেহের তামসিকতা ছি ছি মাংস হাড় পেশি,
তাহারি 'পরে দরদ এত বেশি।
আত্মা জানে রসের রুচি,
কামনা করে কোফতা লুচি,



চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ফোটো হিমানীশ গোস্বামী ১৯৬০

তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী।
ওজন করি ভোজন করা, তাহারে করি ঘৃণা,
মরণভীরু, এ কথা বুঝিবি না।
রোগে মরার ভাবনা নিয়ে
সাবধানীরা রহে কি জিয়ে—
কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা।...

খাদ্যজিজ্ঞাসা প্রবন্ধটিতে 'ব্যতিক্রম' কাহিনীগুলি চমকপ্রদ। চারুচন্দ্রের মামার পিতা, মফঃসল থেকে পনেরো মাইল হেঁটে কলকাতা এলেন, পাঁচ থালা ভাত খেয়ে। রওনা হবার আগে এক থালা ও কলকাতা দু'দিন থেকে সেখানকার জলস্পর্শ করবেন না, সেই হিসাবে চার থালা। খাদ্য-বিজ্ঞান তা হলে কার পক্ষে সত্য?

বিজ্ঞানী চারুচন্দ্র খাদ্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থাপত্রকে নাকানিচোবানি খাইয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু আমি এ প্রবন্ধটি নিয়ে এতটা বেশি আলোচনা করছি অনেকগুলো কারণে। প্রথমত এর ভিতর দিয়ে চারুচন্দ্রের চরিত্রের কয়েকটি দিক খুব স্বচ্ছভাবে দেখা যাবে। তিনি নিজে অত্যন্ত ভোজনপ্রিয় ছিলেন তা তাঁর স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাঁর এই রচনা আপাত-দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-বিরোধী মনে হলেও তিনি অভিজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলে-ছেন, অর্থাৎ গড় মানুষের জন্য যে ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তিগত-ভাবে গড় মানুষের বাইরে বাস করে (আসলে গড় মানুষ কল্পিত মানুষ, সংসারে তার অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ)। কিন্তু তার পরের কথা হচ্ছে, এবং (বা আমার নিজের বিশ্বাস) তিনি ভোজন বিষয়ে 'গুরমাঁ'-ধর্মী ছিলেন বলেই ঐ সব স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থা উল্টিয়ে দিয়ে, যাকে বলে 'প্র্যাগম্যাটিক' দৃষ্টিভঙ্গি, তারই সাহায্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকে বিচার করেছেন, যাতে তাঁর নিজের আহার বিষয়ে 'ঋণংকৃত্বা' নীতিটি সমর্থিত হয়। কিন্তু মূলে এর প্রেরণা যাই থাক না কেন, সরস রচনায় (এবং সরল ভাষার রচনায়) তিনি যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এটি তার একটি বড় প্রমাণ।

এর আগে পরাক্কার খাতা থেকে 'হাউলার' সংগ্রহে দেখেছি তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা। এই রচনার মধ্যে দেখলাম তাঁর রসসৃষ্টির ক্ষমতা। অতঃপর 'বেপরোয়া' নামক পত্রিকায় দেখব তাঁর ব্যঙ্গনিপুণতা।

'বেপরোয়া' নামটি বড় ভয়ানক। চারুচন্দ্র নিজে আহার ভিন্ন অন্য

বিষয়ে বেপরোয়া ছিলেন না। তাঁদের দলের প্রধান এবং প্রকৃত বেপরোয়া ছিলেন ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। বনবিহারীবাবু চারুবাবুর চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন। কিন্তু ব্যঙ্গস্রষ্টা বনবিহারীবাবুর সঙ্গে চারুচন্দ্র ব্যঙ্গ-সাহিত্যের টানেই এসে মিলেছিলেন। বনবিহারী ছিলেন প্রভঞ্জনের মতো। যেমন ধারালো চেহারা, তেমনি সর্বজাতীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ছিল তাঁর ধারালো ব্যঙ্গ-অস্ত্রখানা সদা উদ্যত। চারুচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল মনের দিক থেকে, আচরণের দিক থেকে নয়। চারুচন্দ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন।

বেপরোয়া কাগজখানা অনিয়মিত তিন সংখ্যা বেরিয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমাজের উপর এমন কঠিন আক্রমণ সে সময়ে অবশ্যই জনপ্রিয় হতে পারে নি। কালটা ১৯২৩, আজ থেকে ৪৪ বছর আগে। কাগজখানা বেশি দিন চললে চারুচন্দ্রের হাতের ব্যঙ্গসাহিত্যও সম্ভবত আরও বেশি পাওয়া যেত। আমার হাতে মাত্র একখানা বেপরোয়ায় তাঁর একটি মাত্র ব্যঙ্গ রচনার নমুনা আছে। তার অংশবিশেষ এই—

ইলেকট্রিসিটি

স্বর্ণ।—ভারতধর্মমহামণ্ডল কর্তৃক পরিচালিত একখানি কাগজে দেখা গেল যে "স্বর্ণের ভিতর এক প্রকার তড়িৎ আছে যাহা দেহের সহিত মিশ্রিত হইলে ইন্দ্রিয়গণকে অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত করিয়া তোলে।" এই জন্যই বিধবার স্বর্ণালঙ্কার বর্জনীয় এবং বিধবা ব্যতীত অন্য সকল স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়কে অনুক্ষণ অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত করিবার জন্য তাহাদিগকে সর্বদা স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত রাখা উচিত—তা তাঁহাদের বয়স ৫ মাসই হউক কি ১০৫ বৎসরই হউক।

লোহ।—লোহনির্গততড়িৎ স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করে। হস্ত-স্থিত লোহবলয় নারীকে স্বামীসোহাগিনী করে তাই সধবা স্ত্রীলোককে হাতে লোহ ধারণ করিতে হয়। পূর্বে স্বর্ণের গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাই আজকাল শুধু লোহ তাঁহারা পরেন না, উহাকে স্বর্ণমণ্ডিত করেন। পুরুষের হস্তস্থিত লোহবলয় মস্তিষ্ক শীতল করিয়া তাহাকে ধীর শান্ত করে, যথা, কালীমাতার বালা বা দারোগা সাহেবের বালা। এইরূপে দেখা যায় বিভিন্ন ধাতুনির্গত বিভিন্ন তড়িৎ আপনার বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া মানবদেহের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। চতুর মানব অষ্টধাতুর আঙটিতে সব গুণগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া লয়েন।

আমরা জানি দেহ তড়িতে পূর্ণ। এই দেহস্থিত তড়িৎ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিশ্চয়ই ল' অভ রিপাল্‌শন অনুসারে মস্তক ও পদ, শরীরের এই দুই প্রান্তে চালিত হয়। পদসংলগ্ন তড়িৎ ভূগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়। অবশিষ্ট থাকে মস্তকস্থ তড়িৎ। এই তড়িৎকে যদি অল্পপরিসর স্থানে নিবদ্ধ করিতে পারা যায় তো ঐ তড়িতের পোটেন্‌শিয়াল খুব বেশি হওয়ায় উহার কার্যকারী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তড়িৎ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আর্যগণ একথা জানিতেন, তাই তাঁহারা রাখিলেন টিকি। সমস্ত তড়িৎ টিকিতে সংহত হইল। কিন্তু এই টিকির ডগা যদি ঊর্ধ্বে ফর্‌ফর্ করিয়া উড়িতে থাকে তো তড়িৎ পয়েন্ট দিয়া আকাশে লীক করিয়া যাইবে, তাই তাঁহারা টিকিতে ফাঁস দিয়া তাহার ডগাটি মস্তকের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। ফলে শিখায় নিবদ্ধ সমস্ত তড়িৎ প্রাণন শক্তিমূলক মেডালা অবলংগাটা, স্পাইন্যাল কর্ডের উপরিভাগ, চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পরিচালক স্নায়ুকেন্দ্রগুলির উপর, নিঃশেষে ব্যয়িত হইল—সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়া উঠিল। কিন্তু পদদেশে চালিত তড়িৎ তো ভূপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাই তাঁহারা বসিবার আসন করিলেন সব নন-কন্‌ডাক্টর—মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, প্রভৃতি। কিছুই নষ্ট হইতে পারিল না।...

(বোপরোয়া, চৈত্র, ১৩২৯)

ইলেকট্রিসিটি নিয়ে সে যুগে আমাদের দেশে খুবই উত্তেজনা। এ বস্তু যে আমাদেরই আবিষ্কার একথা প্রমাণের অনেক চেষ্টা হয়েছে তখন। এবং আমাদের অনেক প্রথাকেও বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। (রবীন্দ্রনাথ নিজে এর অনেক আগে এ বিষয়ে ব্যঙ্গ রচনা করেছেন। তাঁর ম্যাগনেটিজ্‌ম ও গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি বিষয়ক ব্যঙ্গ রচনাগুলি দ্রষ্টব্য।)

রসবোধ, রসনা ও রসসৃষ্টির দিকগুলির পরিচয় পাওয়া গেল, এ ছাড়া চারুচন্দ্রের চরিত্রের আর একটা দিক আছে, সেটি তাঁর রস-বিশ্লেষণের দিক। অনেকেই জানেন না যে চারুচন্দ্র অভিনয়-শিল্পপ্রিয় ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর নিষ্ঠা অতুলনীয়। কলকাতার থিয়েটার তিনি প্রায় গোড়া থেকেই নিয়মিত দেখেছেন, এবং মনে হয় কোনো একটি অভিনয়ও তিনি তাঁর তালিকা থেকে বাদ দেন নি। এবং তারই ফলে তিনি নটনটী ও নাট্য বিষয়ে অতি সুন্দর একখানা বই লিখেছেন। বইখানা ছদ্মনামে লেখা। আমি আগেই বলেছি তিনি নেপথ্যে থাকাটাই পছন্দ করতেন। নিতান্ত

প্রয়োজন ছাড়া তিনি আত্মপ্রকাশে প্রবল আগ্রহী ছিলেন না, এবং তাঁর সমসাময়িক বন্ধুদের মতো দুর্দান্ত ছিলেন না। নাটকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু নাটকীয়তাপ্রিয় ছিলেন না। এ বিষয়ে তিনি তাঁর বন্ধু শিশিরকুমার ভাদুড়িরও সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর সূত্রধার ছদ্মনামে লেখা "অথ নট ঘটিত" (বসুধারা প্রকাশনী) বইতে একস্থানে, আর্ভিঙের অভিনয়ে অসংযত আতিশয্য দেখে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের উদ্ধৃতি সহ নিজে বলছেন, "অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলি, শিশিরকুমারের চাণক্যে এই 'অসংযত আতিশয্য' বেশ কিছুটা ছিল।"

চারুচন্দ্রের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না। তিনি "প্রফুল্ল" নাটক সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা তাঁর এই বিশ্লেষণ ক্ষমতার একটি নিদর্শন। তিনি লিখছেন—

> "রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লকে নিয়ে নাটকটি গড়ে ওঠে নি, সুতরাং নামটি নিরর্থক। রমেশ শিক্ষিত, সে অপুত্রক, একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে সে মেরে ফেলতে উদ্যত। হঠাৎ কোনো উত্তেজনাবশে নয়, ধীরে ধীরে স্ত্রীকে মেরে ফেলল। এ চরিত্র অস্বাভাবিক। কাঙালীচরণ মানুষদানব নয়, শুধুই দানব। আর জগমণি শুধু অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভব। সুরেশ চরিত্রটি মনোরম। আর যোগেশ! আগে একটু মদ খেতো, প্রথম দৃশ্যতেই দেখি সে মদের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। সুতরাং তার সাজানো বাগান কোথায় কবে ছিল দর্শক দেখতে পেল না। দু-তিন মাসের মধ্যে সে এত মাতাল হল যে, ছেলের হাত থেকে পয়সা কেড়ে নিচ্ছে, পথে পথে ভিক্ষা করে পয়সা নিয়ে মদ কিনছে, স্ত্রীকে লাথি মারছে। এ সব টেম্পারেন্স সোসাইটির বিজ্ঞাপন হলে মানানসই হতো। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া শুনে যোগেশের মদ খাওয়া বেড়ে গেল, কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের 'রিকভার' করার কথা যোগেশ জেনেছিল। কতকগুলি কৃত্রিম ও অবিশ্বাস্য ঘটনাজাল নাটকটিকে একেবারে নামিয়ে দিয়েছে।"

এই সব নানা জাতীয় লেখার ভিতর দিয়ে চারুচন্দ্রের চরিত্রের নানা দিক বেশ ভালভাবেই দেখা যাবে। তবু এর পরেও কিছু অবশিষ্ট আছে। সে হচ্ছে তাঁর অনুমান ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে আসা এবং বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তিনি শেষ পর্যন্ত এ কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন এবং রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬ খণ্ড তাঁর ব্যবস্থাপনাতেই বেরিয়েছে। এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের যে সব রচনা

'প্রচ্ছন্ন' রেখেছিলেন সে সবের "অধিকাংশই অসম্পূর্ণ অপরিপক্ব" বলে তাও সংকলিত হয়ে অচলিত সংগ্রহ নামে দুই খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সে দুই খণ্ডেরও প্রধান সম্পাদক চারুচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছিলেন (১৯৪০)

"প্রকৃতির সৃষ্টিতে যা ত্যাজ্য, প্রবল তার সম্মার্জনী। মানুষের রচনার জন্যেও আছে সম্মার্জনী, সেটা ঝেঁটিয়ে ফিরিয়েও আনে। তার প্রভাব মানতেই হবে! প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছয় নি তারও মূল্য আছে হয় তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে; তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাসর্পোর্ট পেয়ে থাকে।"

এবং এ বিষয়ে তিনি নানাভাবে আপত্তি জানিয়ে চিঠিতে গদ্যে পদ্যে এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। চারুচন্দ্র-লিখিত 'নিবেদন' থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি—

সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপা-যন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা
জীর্ণ শীর্ণ মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণ-পাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোপার গাধা?

এই জাতীয় সব আপত্তির জবাবে চারুচন্দ্র একস্থানে বলেছেন—

"ইতিহাসের খাতিরেই যে এই বর্জিত রচনাগুলি পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইয়াছি তাহা নয়—যদিও তাহা করিলেও অন্যায় হইত বলিয়া মনে করি না……রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন্ অংশ বর্জনীয়, কোন্ দান শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহার বিচার-ভার কবিকে দিলে সুবিচার হইবে মনে করি না, আমরা নিজেরাও সে ভার গ্রহণ করি নাই—ভাবী কালের উপর রাখিয়াই এই গ্রন্থগুলি সংকলন করা হইল।"……

রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে চারুচন্দ্র অ্যাণ্ড কো. ভোটে পরাস্ত করে অচলিত সংগ্রহ দুই খণ্ড, রচনাবলীর অনুসারী করতে পেরেছিলেন।

১-৬-৬৭

—

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৮৮৬—১৯৬৫

বনবিহারীর অসামান্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এককালে আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর ধারালো ব্যঙ্গপূর্ণ কথা, প্রখর স্বতন্ত্র মতবাদ, চিত্তাকর্ষী যুক্তিবাদ, আমাকে মাঝে মাঝে চমকে দিত। এমন জীবন্ত প্রাণোচ্ছল মানুষ তার আগে আর আমি দেখি নি। এক এক সময় তাঁর প্রখর ব্যঙ্গ যেন তড়িৎ-গতি সাপের মতো তাঁর সমস্ত দেহে এঁকে বেঁকে খেলে বেড়াত, কাছে থাকতে ভয় হত। কিন্তু পরক্ষণেই মধুর হাসিতে সকল ভয় দূর করতেন।

গল্প উপন্যাস কবিতা কারটুন ছবি তাঁর এমনই আনায়াস সৃষ্টি, এবং তা তাঁর সমস্ত জীবনের আচরণ, বিশ্বাস এবং কর্মধারার সঙ্গে এমনই অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত যে, ব্যক্তিটিকে বাদ দিয়ে তাঁর রচনা যেন সম্পূর্ণ নয়। অবশ্য তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলেই তবে একথা মনে আসে। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে তিনি প্রবলভাবে আছেন, এবং তাঁর নিজের মতবাদের মধ্যে তাঁর সকল রচনার উপকরণ সংহত হয়ে আছে। তবু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁর রচনা সেহেতু ব্যক্তিসর্বস্ব একেবারেই নয়। কারণ তিনি তাঁর জীবনদর্শনকে ব্যক্তিসর্বস্ব করেন নি। তিনি যা কিছু চিন্তা করেছেন, যা কিছু রচনা করেছেন, তার মধ্যে তিনি আছেন চিন্তার জড়ত্ব দূর করে যুক্তি প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকায়। তাঁর বাক্যে এবং ব্যবহারেও তা প্রকট ছিল, এবং বড় বিস্ময়ের কথা এই যে, তিনি প্রচারক ছিলেন না। ধর্ম নিয়ে গভীর চিন্তা করেছেন, কিন্তু ধর্মযাজক ছিলেন না। তিনি শুধু যুক্তির পথে চলার চেষ্টা করেছেন, অসহনীয় বেদনায় তিনি সমাজের মঙ্গল চিন্তা করেছেন. তাঁর জীবনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর সমস্ত সত্তাটি ছিল উচ্চস্তরের দার্শনিকের এবং তাঁর প্রকাশ ছিল প্রকৃত শিল্পীর। শিল্পী হিসাবে তিনি তাঁর রচনায় বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ অথবা শুধু ব্যঙ্গের 'টোন'টিকেই সবচেয়ে উপযোগী মনে করেছিলেন, কারণ এ ছাড়া আমাদের সর্বজাতীয় অর্বাচীনতার বিরুদ্ধে তাঁর মনের ক্ষোভ অন্য কিছুতে এমনভাবে প্রকাশ পেত না।

তাই আমার মনে হয়, তাঁর রচনা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করতে

গেলেও তাঁর নিজের সম্পর্কে আগে জানা থাকলে ভাল হয়। কিন্তু আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় সেই ১৯২৫ সনে, সে পরিচয় অল্প দিনের। তার প্রায় তেত্রিশ বছর পরে তাঁকে যখন পুনরায় পেলাম তখন আমাদের পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিল, এবং আমার উপর তিনি অনেকখানি নির্ভরও করেছিলেন। তিনি লেক রোড থেকে উত্তর কলকাতায় আমার কাছে চলে আসতেন মাঝে মাঝে, অসুস্থ দেহ নিয়েও। তাঁর অনেক কথা আমাকে বলতেন, এবং তাঁর লেখা এবং তাঁর ব্যবহার আমি ঠিক অর্থে নিতে পেরেছি বলে, এবং তাঁকে কোনো কারণে আমি ভুল বুঝি নি বলে, এবং তার চেয়েও প্রধান কথা—তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ উদারতার গুণে তিনি আমার লেখার মধ্যে তাঁর সুরের অনুরণন খুঁজে পেয়েছিলেন বলে, তিনি আমাকে অত্যন্ত কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রে অনেক সময় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেত, এবং হ্যাংলামি, নির্বুদ্ধিতা, এবং অন্যায়ভাবে সুবিধা আদায়কামীদের প্রতি তিনি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতেন অনেক সময়। কিন্তু সেও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি স্মৃতিচিত্রণে দিয়েছি, তার সঙ্গে আরও একটি যোগ করলাম বলাইচাঁদের কাছ থেকে সম্প্রতি পেয়ে। আমি সবগুলোই বিবৃত করি—

একদিন এক ভদ্রলোক সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে জানতে এসেছিলেন, বেড খালি আছে কি না, একটা রোগীকে তিনি ভর্তি করাতে চান। বনবিহারী তখন সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রার, তিনি ভদ্রভাবে বললেন এখন খালি নেই, তবে মাঝে মাঝে খোঁজ করে যাবেন, খালি হলেই পাবেন। কিন্তু এই কথাটি ভদ্রলোকের পছন্দ না হওয়াতে তিনি অপর একজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ঐ একই অনুরোধ জানালেন। সে ডাক্তার তাঁকে পুনবায় বনবিহারীর কাছেই নিয়ে এলেন। তিনি তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাঁকে দেখেই চকিতে সব বুঝতে পেরে বললেন বসুন। তার পর হাতের কাজ শেষ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ঐ ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নিয়ে আগে যে সব কথা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করলেন, এবং একবার এ কানে, একবার ও কানে। তিনি ক্রমাগত পালা করে দু কানে ঐ একই কথা বার বার বলতে লাগলেন। ভদ্রলোক স্তম্ভিত। বনবিহারী দু-একজন ছাত্রকে ডেকে বললেন, ইনি বাংলা ভাল বুঝতে পারেন না, কিন্তু এঁকে বোঝাতেই হবে যে এখন বেড খালি নেই।

আর একটি ঘটনা—এক রোগী আউটডোরের অন্যান্য অপেক্ষমাণ

রোগীদের ভিড় ঠেলে আগে বনবিহারীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আমি ডাক্তার "—" বসুর চিঠি এনেছি, আমাকে একটু আগে দেখে দিন। বনবিহারী এই ভদ্রলোকের আচরণে এমন চটে গিয়েছিলেন যে, সে ক্রোধ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের প্রয়োগ ছাড়া অন্যভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল। তিনি চিঠিখানা হাতে উঁচু করে ধরে হঠাৎ চিৎকার করে ছাত্রদের বলতে লাগলেন, ওহে, ইনি ডাক্তার অমুক বোসের চিঠি এনেছেন, তোমরা এঁকে নিয়ে নাচতে আরম্ভ কর, আমিও আসছি কাজ সেরে।

তৃতীয় ঘটনা—বাইরের কোনো মহকুমা শহরে। সেখানে এক ভদ্রলোক বনবিহারীর কাছে অনেক বই দেখে ভেবেছিলেন তাঁর কাছ থেকে বই পড়ায় বেশ সুবিধা হবে। তিনি এক দিন বই চেয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে। বনবিহারী রবীন্দ্রনাথের একখানা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্র-লোক সেখানা পড়ে বড়ই হতাশ হয়ে ফেরৎ পাঠালেন, এবং জানালেন এবারে যেন ডাক্তার সাহেব একখানা ভাল বই পাঠিয়ে দেন। বনবিহারী তাঁকে একখানা বড পঞ্জিকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আর একটি ঘটনা—বনবিহারী সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রার হয়েছেন অল্পদিন। ছাত্র দুলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছিল তাঁর ক্লার্ক। সে ভাগলপুর থেকে আমাকে সম্প্রতি লিখে জানাচ্ছে—

"আমাদের কাজ ছিল দোতলার একটা ঘরে। সার্জনদের সঙ্গে দেখা হত না। হঠাৎ এক দিন তাঁর সঙ্গে নিচে স্টীন সাহেবের দেখা। স্টীন তখন ওখানকার সেকেণ্ড সার্জন। তিনি বনবিহারীবাবুকে বললেন, 'বন-বিহারী আজকাল তোমার মুখ দেখতে পাই না, ব্যাপার কি?' বনবিহারী বললেন, 'এখন আমি রেজিস্ট্রার, সেই জন্যই দেখতে পাও না।' সাহেব বললেন, 'ও! আমি জানতাম না।'

"সাহেব চলে যাবার পরদিন বনবিহারী আমাকে বললেন, 'চল নিচে, আজ আর কাজ করব না।'

"নিচে গেলাম। স্টীন সাহেব ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন। বনবিহারী তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর স্টীন যেই একটু দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, বনবিহারী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এমনি কয়েকবার হতেই স্টিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? তুমি আজ অফিসে নেই কেন?' বনবিহারী বললেন, 'তুমি অভিযোগ করেছিলে আমার মুখ দেখতে পাও না, তাই মুখ দেখাচ্ছি'।"



বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

ফোটো চারুচন্দ্র গুহ ১৯২৪

(বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

মেডিক্যাল কলেজের সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রারের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক মনে হবে। দেখা যাচ্ছে বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বই এখানে প্রধান, পারিপার্শ্বিক বা কৃত্রিম পদমর্যাদা ভেদ করে তা সময়ে অসময়ে বেরিয়ে পড়ে। কলমে যিনি ব্যঙ্গ সৃষ্টি করেন, হাতেও যে সেই একই ব্যক্তি ব্যঙ্গ করতে পারেন, সে দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দেখিয়েছেন। কিন্তু বনবিহারীর এই ব্যঙ্গের চেহারা উগ্র রকমের স্বতন্ত্র। এর আর জুড়ি নেই। বনবিহারীর হাতে-কলমে ব্যঙ্গ অধিকাংশই প্রকাশ্যত নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, কিন্তু মূলে মূঢ়তার প্রতি অসহিষ্ণুতা। প্রকৃত ব্যঙ্গকারীকে কিছু নিষ্ঠুর হতেই হয়, যদিও তা নিজের স্বার্থে নয়। এবং বনবিহারীর ক্ষেত্রে এ সবই অবশ্য ব্যাবহারিক ব্যঙ্গ।

বনবিহারীর চরিত্রের আর এক দিক ঠিক এর বিপরীত। সেখানে তাঁর মহান্ ত্যাগ, অসহায়ের জন্য বেদনা বোধ, আর্তকে সাহায্য করার স্বতঃপ্রবৃত্ত বাসনা। সেদিকের পরিচয় পেলে মন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠবে। নানা দিক থেকে তাঁকে দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি তাঁর ভাইদের এবং তাঁর অনুরক্ত বন্ধু ও পাঠকদের মধ্যস্থতায়। সে সব আমি একে একে বিবৃত করছি। গিরিডিবাসী বনবিহারীর চতুর্থ ভ্রাতা বিজনবিহারী এবং শান্তিনিকেতনবাসী কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী, আমাকে সাহায্য করেছেন, তা ছাড়া তাঁর পুত্র কানাইলাল ও অন্যান্য যাঁরা আমাকে চিঠি দিয়েছেন তাঁদের সবার দেখা মিলিয়ে বনবিহারীর পরিচয় এতে সম্পূর্ণ হবে।

বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতন থেকে আমাকে জানাচ্ছেন—"আমি মেজদার চেয়ে কত ছোট যে তাঁর প্রথম জীবনের কোন কথাই জানা নেই। তাঁর কাছে আমি কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলোম। খুব ভাল পড়াতে পারতেন। তাড়াতাড়ি কোন কথা বুঝতে না পারলে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। ইংরেজী অক্ষর পরিচয়ের পূর্বে ইংরেজী বই পড়ে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী সোপান বাড়িতে প্রথম আমি পড়েছি। আমার দাদাদের তিনি ইংরাজী বাংলা অঙ্ক ইত্যাদি আই-এ পর্যন্ত পড়িয়েছেন।···সাহিত্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে তিনি বেশি পছন্দ করতেন। সৈয়দ মুজতবা আলি ও অনিল চন্দের কাছে শুনেছি আমাদের সময় আপনি বিশ্বভারতীর (১৯২১) ছাত্র ছিলেন। আমার চিত্র প্রদর্শনী সম্পর্কে অপনার লেখা (যুগান্তর সাময়িকী, ২৪-৩-৪৬) দেখেছি। কানাইলালের পিতার সম্বন্ধে সব রেকর্ড

কানাইলালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সঙ্গে তাকে আপনার প্রয়োজনের কথা জানিয়ে দিলাম।"

এই 'রেকর্ড' বিনোদবিহারীর অনুরোধে বিজনবিহারী লিখেছেন। তা থেকে আমি অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করব। ঐ সঙ্গে বিজনবিহারী আমাকে যে চিঠি দিয়েছেন তা এই—

"আমার মেজদা বনবিহারীর বিষয় আপনার যে আলোচনা কিছুদিন পূর্বে [মৃত্যুর সপ্তম দিনে ১১-৭-৬৫ তারিখে] যুগান্তরে বেরিয়েছে তা আমি পড়েছি, কিন্তু সেটা অসম্পূর্ণ ছিল, তাই এ বিষয়ে আপনার আরও কিছু লেখার প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।...শারদীয় যুগান্তরে (১৯৬৫) সৈয়দ মুজতবার লেখাটি পড়েছি। তার লেখা ভালই হয়েছে, দু-একটা ছোট-খাট ভুলভ্রান্তি আছে, তবু ভাল।...দূর থেকে বনবিহারীবাবুকে এখনো কেউ বোঝে নি, বোঝা যেত না, এবং ঐটেই তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। সৈয়দের লেখায় বনবিহারীবাবুকে ঘোরতর নাস্তিকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু আমি জানি সেটা তাঁর আসল রূপ নয়। তিনি জ্ঞানবুদ্ধিবিচার পথের পথিক ছিলেন। তিনি দয়া ক্ষমা করুণায় প্রকৃত সহৃদয় লোক ছিলেন। আবার ধৈর্য সহিষ্ণুতায় এবং সত্য পথে চলায় তিনি কঠিন কঠোর ও দুঃসাহসী বীর ছিলেন। তাঁর কোন কাজেই আড়ম্বর বা প্রচার ছিল না। এক দিক দিয়ে তিনি নীরব গোপন, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে রঙ্গরসিকতায় ও ব্যঙ্গে তিনি উচ্ছল ও মুখর ছিলেন। ডাক্তার তুলসী ভট্টাচার্য তাঁর এই বাল্য-বন্ধুর কথা বলতে বলতে প্রায় মাঝে মাঝে বলে ওঠেন সে একজন ক্ষণজন্মা লোক ছিল'।—কথাটি খুব মিথ্যা নয়। বনফুলের যে চতুর্দশপদীটি 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল সেটি বনবিহারীবাবুর একটি দিককে খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে এবং বলার ভঙ্গিতে তাঁর মাস্টার মশায়ের রূপ ধরা পড়েছে।...

"সাংসারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি উদাসীন ছিলেন সত্য, কিন্তু সংসার ও সমাজপীড়িতদের জন্য তাঁর চোখের জল পড়তেও দেখেছি।... তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর অসীম মনোবল। ছোট-বড় অনেক সাংসারিক দুর্যোগ দুর্ঘটনার মধ্যে এবং কর্মজীবনের অনেক জটিল সমস্যার মধ্যে তাঁকে সম্পূর্ণ অবিচল থাকতে দেখেছি।"

কিন্তু বনবিহারী প্রকৃতই নাস্তিক ছিলেন অথবা বিশ্বাসী ছিলেন, এ আলোচনা নিরর্থক। নাস্তিক কথাটাই এখন পুরনো এবং পরিত্যক্ত, অত-

এব ওটা পরিত্যাজ্য। সেহেতু মুজতবা আলী বা বলেছেন এবং বিজন-বিহারী যা বলছেন, দুটোরই অর্থ এক। তবে বনবিহারী নিজে যুক্তিবাদী, 'এথিক'-ধর্মী ছিলেন। কতগুলি নীতি তাঁর স্থির করা ছিল, সমাজ বিধান সম্পর্কে তাঁর আচরণ এবং চিন্তাধারা ঐ নির্দিষ্ট নীতির পথেই চলত। তিনি নির্লোভ ছিলেন, স্বার্থহীন ছিলেন। সমাজের ধর্মের, মূঢ়তায় তীব্র বেদনা বোধ করেছেন। চিন্তার সাহায্যে, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে, ব্যঙ্গ চিত্রের ভিতর দিয়ে জাতিকে (জাতিধর্ম নির্বিশেষে) ধর্মের মূঢ়তা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন, এটাই তাঁর বড় পরিচয়। ঈশ্বর বা কোনো সচেতন সৃষ্টিকর্তা কোথাও কেউ আছেন কি না তা মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে যখন জানবার উপায় নেই, তখন কারো পক্ষে "আমি অবিশ্বাসী" বলাও যতটা অর্থহীন "আমি ঈশ্বর মানি" বলাও ঠিক ততটা অর্থহীন। অতএব কেউ কিছু মানেন কি মানেন না, তাতে কারো জীবনে গৌরব বাড়েও না, গৌরবের হানিও হয় না। একদল লোক ভূত মানেন, আর একদল ভূত মানেন না, অথচ দুদলের মধ্যে কেউ ভদ্রলোক হতে চাইলে তাঁর সে পথ খোলা আছে। কেউ বাধা দেবে না, ভূতও না, অভূতও না।

বিজনবিহারী আরও জানাচ্ছেন—"বনবিহারীর জীবনের প্রথম ভাগে তিনি দুটি উদার মহাপ্রাণ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং এঁরা দুজনেই এখন বাংলা দেশের···বিস্মৃত ব্যক্তি। একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, আমাদের জ্যাঠামশাই, যিনি মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন, কালীপ্রসন্নের মহাভারত রচনাকালে যিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং যিনি মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম পুস্তকটি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলন ও সম্পাদন করেন।···আর একজন সংস্কৃত কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক, নববিধানসমাজভুক্ত, শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ।···তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন।···তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে (১৯৬৪) তাঁর বহু কৃতী ছাত্র যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন তার মধ্যে বনবিহারীও ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র ডাঃ তারকনাথ ঘোষ তার টেপ রেকর্ডিং করিয়ে রেখেছেন।···

"বাল্যকালে মেজদা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতেও পরিচিত ছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন।

"পনেরো-ষোল বছর বয়সেই মেজদা সংস্কৃতে আদ্য মধ্য ও কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেক পদ্য লেখেন। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের অতি প্রিয় বনবিহারী স্কুল কলেজ

এবং ইউনিভারসিটি ইনসটিট্যুটে বহু নাটক অভিনয়ে ও আবৃত্তিতে পুরস্কার পেয়েছিলেন, এ বিষয়ে অন্য ছাত্রদের শিক্ষা দিতেও দেখেছি।

"প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, আমাদের জ্যাঠতুতো বড় ভাই ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় [নিউ থিয়েটার্সের কমিক অভিনেতা, অধুনা মৃত] পাঠ্যাবস্থায় যখন আমাদের বাড়িতে থাকতেন তখন মেজদার সাহচর্যে তাঁর আবৃত্তি ও নাট্যকলা শিক্ষা হয়।

"ছবি আঁকা, মডেলিং করা, তাঁর 'হবি' ছিল। তিনি বহু কারটুন চিত্র এঁকেছিলেন [ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি প্রভৃতিতে প্রকাশিত]। শত শত কবিতা গান তাঁর মুখস্থ ছিল, অনেক সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত গুন্‌গুন্‌ করে গাইতেন। অনেক সময় উচ্চকণ্ঠেও গাইতে শুনেছি।

"ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও স্বাধীনতা নিয়ে তিনি প্রায়ই আলোচনা করতেন। মনে হয় তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন প্রায় সব পড়া ছিল। আলোচনার সময় তিনি উপনিষদ, গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি—সব থেকেই মুখেমুখে এমন উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন যে আশ্চর্য লাগত তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে। আবার আমাকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ট্রিগোনোমেট্রিও পড়িয়েছেন বই না দেখে। হিন্দু ধর্মচর্যার পদ্ধতি, রঘুনন্দনের বিধি বিধান, সামাজিক নির্যাতন এবং বর্বরতার প্রতি তাঁর কোন ক্ষমা ছিল না। এইখানে তাঁকে মনে হত যেন কালাপাহাড়।

তিনি তাঁর যৌবনকালে সমাজের বাধা ঠেলে নিজ পৌরোহিত্যে তাঁর বিধবা ভগ্নীর বিবাহ দেন, হিন্দু শাস্ত্র মতে। তখন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহের পর হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরে এটি পরবর্তী বিধবা বিবাহ। এই বিবাহ বাসরে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং স্যর আশুতোষ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মা যদিও বিদ্যারত্নের কন্যা, তবু তিনি এ বিবাহে মত দিয়েছিলেন। ১৯১৩-১৪ সনে মেজদার বিলেত যাওয়া নিয়েও এই রকম অনেক সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছিল। আমরা কিছুদিনের জন্য একঘরে' হয়েছিলাম।

"কর্মজীবনেও মেজদার এইরূপ চ্যালেঞ্জ বিরল নয়। তিনি যখন দিনাজপুরে সিভিল সার্জন, তখন সরকারের একটা সিভিল ডিজো-বীডিয়েন্স বিরোধী অভিযান শুরু হয়, তাতে গভর্মেন্ট সব জেলা অফিসারদের সহযোগ দাবী করে। একা মেজদা তাতে যোগ দেন নি, সেজন্য তাঁকে খারাপ জায়গায় বদলি করা হয়। মেজদা জেলের অনেক দণ্ডবিধির

বদল ঘটিয়েছিলেন, কয়েদীদের খাওয়া থাকার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন, সব পারেন নি, শেষে যথাসময়ের পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেন।…

আয় করেছেন অনেক ব্যয়ও করেছেন অনেক, কিন্তু নিজ হাতে করেন নি।…নিজের পায়ে নিজে অপারেশন করেছেন দেখেছি, লোক্যাল অ্যানিস্থিসিয়াও ব্যবহার করেন নি।…তাঁর অসীম মনের বল, তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তিনি জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে স্বাবলম্বী থেকেছেন, ছেলে-মেয়ে কাউকে তাঁর ভার বইতে দেন নি।

"আত্মভোলা, স্বার্থহীন, নিরাসক্ত, নির্ভীক—তিনি নাস্তিক ছিলেন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তা কে বলতে পারে।"…

এ এক আশ্চর্য জীবনকথা!

বনবিহারীর মৃত্যু তারিখ ৫ই জুলাই সোমবার ১৯৬৫। সেইদিন সকালে টেলিফোনে আমি এই দুঃসংবাদ শুনে, তখনই তাঁর সম্পর্কে একটি ছোট রচনা লিখি, এবং তা ১১ই রবিবার যুগান্তর সাময়িকীতে ছাপা হয়। বিজনবিহারী এই প্রবন্ধের কথাই তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। সেই লেখাটি পড়ে বনবিহারীর পরিচিত এবং আমার অপরিচিত দুজন ব্যক্তি আমাকে যে চিঠি লেখেন তা বিশেষ মূল্যবান। সেই দুখানা চিঠির অংশ-বিশেষ আমি প্রথমে এখানে উদ্ধৃত করছি।—

প্রথম চিঠি (জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী) জবলপুর, মধ্যপ্রদেশ ১২-৭-৬৫… "মাননীয় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা পড়িয়া আমার পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে বনবিহারী ও তাঁর সতীর্থ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী (শ্রীমান গৌরীনাথ শাস্ত্রীর পিতা), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী, তুলসী ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। আমার তিন শ্রেণীর উপরে উঁহারা পড়িতেন।…তুলসীচরণের ছোট ভাই বিষ্ণুচরণ (অধ্যাপক) আমার সতীর্থ…।

"রেসিটেশনে ভাল ছিলাম, ও আমার শ্রেণীর প্রথম বিধায় আমি তাঁহাদের প্রিয়পাত্র ছিলাম। আমি আলিপুরে ওকালতি করিতাম, ও মধ্যে মধ্যে হাইকোর্টে গেলে পশুপতি শাস্ত্রীর সহিত অনেক কথাবার্তা হইত।

"স্কুলের আবৃত্তিতে বনবিহারীদা শাইলকের পার্ট করেন, ও পশুপতিদা পোরশিয়ার পার্ট করেন। বৈকালে আমি প্রায় রোজই গোলদীঘিতে ঘুরিতাম। একদিন বনবিহারীদা আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন 'কি

রাখাল কেমন আছ? অনেকদিন দেখি নি। তা বেশ মোটা হয়েছে! কলাই ডাল বেশি খাচ্ছ বুঝি?' আমি ত অবাক। বলিলাম, 'আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না? আমি জিতেন।'

'ও! তাই তো। রাখালের কথা ভাবছিলুম কি না? তা বেশ, কিন্তু তুমি তো রোগা হয়ে গিয়েছ দেখছি। উপোসটুপোস করছ বুঝি?'

"আমি খুব মোটা ছিলাম ও গোঁড়া বলে আমার অখ্যাতি ছিল।

"আমাদের শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রত্যহ ছুটির পর দালানে দাঁড়াইতেন এবং আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া···নানা বিষয়ে আলোচনা শুনিতাম। পশুপতিনাথ, দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, বটুকনাথ ভট্টাচার্য ও আমি। তুলসীচরণ ও বনবিহারী দুজনে ডাক্তারি পড়িতে গেলে তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। বনবিহারীর বিধবা ভগিনীর বিবাহে বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দেন। তেহি নো দিবসা গতাঃ।"

দ্বিতীয় চিঠি (ব্যোমকেশ মজুমদার) ৬২ অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-৯ ২৬-৭-১৯৬৫।

"সম্প্রতি যুগান্তর সাময়িকীতে প্রকাশিত আপনার 'স্যাটায়রিস্ট বনবিহারী মুখোপাধ্যায়' নামক রচনাটি পাঠ করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইলাম —আমার একটা গভীর সংশয়ের নিরসন ঘটিল।

"কয়েক বৎসর পূর্বে পূজা-সংখ্যা 'বেতার-জগৎ'এ প্রকাশিত বনফুলের রচনা 'অগ্নীশ্বর' পাঠ করিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, অগ্নীশ্বর চরিত্রে নিশ্চয় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছায়াপাত হইয়াছে। আজ দীর্ঘকাল পরে আপনার প্রবন্ধে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব প্রাপ্ত হওয়ায় বড়ই আনন্দ বোধ করিতেছি।

"স্রষ্টা বনবিহারী ও ব্যক্তি বনবিহারী উভয়েই আমাদের দেশে দুর্লভ। আমাদের দেশের মাটি হয় তো এইরূপ প্রতিভার পক্ষে অনুকূল নয়।

"আমার পূর্ব নিবাস মৈমনসিংহ জেলা। অতি শৈশবে বিগত ১৩৩৮ সালে বনবিহারীবাবুর সংস্পর্শে একবার আসিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তিনি তখন সেখানকার লিটন মেডিকাল স্কুলের শিক্ষক ও সূর্যকান্ত হাসপাতালের ডাক্তার। মেডিসিন ও সার্জারি—চিকিৎসা শাস্ত্রের উভয় শাখাতেই তাঁহার সমান দক্ষতা ও সুনাম ছিল। তাঁহার লেখন-খ্যাতিও বয়স্কদের মুখে শুনিতে পাইতাম। ঐ ১৩৩৮ সালের শীতকালে অন্য একটি

বালকের সঙ্গে খেলিতে খেলিতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া আমার ডান হাতখানা ভাঙিয়া যায়। সেই ভাঙা হাতের চিকিৎসার জন্যই আমাকে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুঠাম চেহারা ও সরস কথাবার্তা আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই।

"পরবর্তীকালে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা তারাশঙ্কর, বনফুল, সজনীকান্ত ও আপনার লেখা হইতে জানিতে পারি। বোধ হয় সজনীকান্তেরই লেখা হইতে ইহাও জানিতে পারি যে, বনবিহারী সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থান করিতেছেন।

"এক্ষণে আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে। দয়া করিয়া আমার এ প্রশ্নের উত্তর যদি দেন তাহা হইলে সদ্য পরলোকগত বনবিহারীর একজন অকৃত্রিম অনুরাগী অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

"বনবিহারী সর্বমোহমুক্ত বাস্তববাদী দৃঢ়চেতা পুরুষ। কোন প্রকার ন্যাকামি বা ভণ্ডামি তাঁহার কাছে কখনও প্রশ্রয় পায় নাই। বিশ্বাসের সঙ্গে আচরণের সামঞ্জস্য এইরূপ। চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আস্তিক নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী অথবা অন্য কি ছিলেন, জানি না। তবে তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে কোনও ধারণা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে নাস্তিক না বলিলেও অজ্ঞেয়বাদীর উপরে বোধহয় আর কিছুই বলা চলে না। কিন্তু তাহাই যদি হইবে, তবে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া একটা ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেই বা যাইবেন কিরূপে?...বনবিহারীর মৃত্যু সংবাদ কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিস্মৃতির অন্ধকারে তিনি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। কিন্তু তাঁহার অসামান্য চরিত-কথা বাঙ্গালীকে শুনাইবার প্রয়োজন আছে। আপনাকে সেই মহৎ কার্যে অগ্রণী হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই। তাঁহার রচনাবলীর একখানা সঙ্কলন গ্রন্থও প্রকাশিত হওয়া উচিত।"

আমি এ চিঠির ব্যক্তিগত উত্তরে জানিয়েছিলাম যে তিনি আশ্রমে চাকরি করতে গিয়েছিলেন, বেতন নিতেন অবশ্য নামমাত্র। (শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা পরবর্তী পত্র দ্রষ্টব্য।) তবু এ চিঠির প্রশ্নগুলি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সন্ন্যাসজীবন তিনি বিশেষভাবে কোথাও অল্পদিনের জন্য গ্রহণ করেন নি—তিনি যৌবনকাল থেকেই প্রায় সন্ন্যাসজীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। বিজনবিহারীর লেখা থেকে তা এতক্ষণ অবশ্যই জানা হয়ে

গেছে। এতএব পত্রলেখক যা আগে বুঝেছিলেন তা সত্য। পরবর্তী সংবাদটাই সত্য নয়।

কোনো যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই এ কথা কখনো বলা সম্ভব হয় না যে, 'আমি শেষ সত্য জানি।' অতএব এটা ধরেই নিতে হবে যে, তিনি ধর্মবিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে কোনো দলে ভেড়েন নি, এবং ভক্তি নামক কোনো মানসিক রস যুক্তিবাদীর মনে আশ্রয় পায় না। বরং ভক্তির বিরুদ্ধেই বনবিহারী কলম ধরেছিলেন।

সম্প্রতিকালে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকের মধ্যেও দেখা যায় একদল বলেন, "জান, আমি ঈশ্বর মানি না?" আর একদল ঠিক একই দাম্ভিকতার সঙ্গে বলেন "জান, আমি ঈশ্বর মানি?" যুক্তিবাদী এর কোনো দলেই নেই। তিনি এ সব বাদ দিয়েও শ্রেষ্ঠ ধার্মিক হতে পারেন, কারণ মাত্র পাঁচ-ছয়টি অতি সরল এবং সাধারণ নিয়ম মেনে চললেই ধার্মিক হওয়া যায়। ভদ্রলোক হতেও আটকায় না। এ বিষয়ে বনবিহারীর মত অনেকটা পাওয়া যাবে তাঁর 'দশচক্র' নামক উপন্যাসে। বারট্রাণ্ড রাসেল যাকে বলেছেন 'কালেকটিভ ইনস্যানিটি'—বনবিহারী সেই কালেকটিভ ইনস্যানিটির বাইরে ছিলেন।

আমি তাঁর জীবনের ছোট্ট একটি কাহিনীর সাহায্যে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করছি। কাহিনীটি সম্প্রতি জানিয়েছেন বনবিহারীর ছাত্র, ডাক্তার ধীরেন্দ্র চৌধুরী, ক্রিস্টোফার রোড সি-আই-টি বিল্ডিং থেকে। তিনি জানাচ্ছেন, "বনবিহারী যখন মৈমনসিংহে, তখন সুসং রাজবাড়িতে একটি কল পান। জায়গাটা দূরে, আসা যাওয়া বাদে তাঁকে এ জন্য তাঁরা পাঁচ শত টাকা ফী দেবেন স্থির হয়। যাবার কিছু পূর্বে দূর পল্লী থেকে এক অত্যন্ত গরিব ব্রাহ্মণ এসে কেঁদে পড়েন তাঁর পুত্রের টাইফয়েড, বাঁচবার কোনো আশা নেই, তবু শেষবারের জন্য বনবিহারীবাবু যদি একবার তাকে দেখেন, তবে তাঁর নিজের আর কোনো অনুতাপ থাকবে না। বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আপনার ছেলেকে দেখব। তিনি সুসং-এর ডাক বাতিল করে দিলেন, এবং নিজের খরচে দূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ছেলেটিকে দেখলেন।"

এই যে কাজ তিনি করলেন, এটা শোনার পরেও কি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় বনবিহারী কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা তাঁর ধর্মবিশ্বাস কি ছিল?

তিনি সমস্ত জীবন এ কাজ করেছেন। 'দশচক্র' নামক উপন্যাসের একটুখানি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি—

"কিন্তু ধর্ম ত এত উপেক্ষার বস্তু নয়। আমি যাহা বুঝি না তাহাই সত্য।' ইহাই ধর্মের মূল কথা। আমার বুদ্ধিতে গলদ থাকিতে পারে, অতএব 'নিজের বুদ্ধিতে না চলিয়া হরি-নরির বুদ্ধি লইয়া চলিব' এ কথা যে না বলিতে পারে তাহার কোন স্থিরতা নাই।"

আর একটা উদ্ধৃতি (দশচক্র)—

"একজনকে ডুবিতে দেখিলে আর একজন জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য। যে সাঁতার জানে না সেও ঝাঁপাইয়া পড়ে, এমন ঘটনা প্রায় শোনা যায়। ধর্ম-প্রচারকেরা বলেন, মানুষের মনে এই প্রবৃত্তি দিয়াছে ধর্ম। হইতে পারে বিশ্বচরাচরে এমন মহা-পুরুষ কেহ আছেন যিনি ধর্মপ্রণোদিত হইয়া আর্তত্রাণ করেন—স্বর্গের আশায়, ভাল অপ্সরার পাশে বসিবার লোভে, বা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ-কার কামনায় পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধারণ লোক যে অনেক সময় নিজেদের বিপন্ন করিয়া পরকে বাঁচাইতে যায়, সে শুধু পরের দুঃখে তাহাদের প্রাণ কাঁদে বলিয়া।...পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে, এমন সময় যদি দেখি একজন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বাছিয়া বাছিয়া শুধু হিন্দু বা মুসলমানের ঘর বাঁচাইবার জন্য—তবে বুঝিতে পারি ইনি সহজ লোক নন! ইনি ধার্মিক।"

বিশুদ্ধ মানবতার জয়গান, অথবা মনুষ্যত্বের জয়গান, এর চেয়ে বেশি আর কি করা যাবে? ধর্মই যে বিকারগ্রস্ত হয়ে মনুষ্যত্বকে চেপে রাখে, এই বিশ্বাসের আরও দৃষ্টান্ত ঐ বইতেই সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আমি আরও কিছু উদ্ধৃত করি—

"এত বড় দেশেব মধ্যে এই ছোট মানুষটির দাঁড়াইবার স্থান কি কোথাও নাই? নিশি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকল সমাজের লোকের সহিত......আলোচনা করিয়া এটুকু বুঝিয়াছে যে, সে যদি আজ মুখে বলে যে, খ্রীষ্ট বা মহম্মদ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন, আর কেহ পারেন না, তবে হাজার হাজার লোক পাওয়া যাইবে, যাহারা ছুটিয়া আসিয়া ইহাকে কোলে তুলিয়া লইবে। কিন্তু সে মানুষ বিপদে পড়িয়াছে—কেবল এই কারণে কেহ তাহাকে আশ্রয় দিবে না। সে যদি আজ দেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, ত ক্রয় করিবার লোকের

অভাব হইবে না। সমাজের শিরোমণিরাও তখন দলে দলে আসিবেন, টং করিয়া টাকা ফেলিবেন, ইহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া যাইবেন। ইহাকে মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া শ্রাদ্ধসভার বুকের উপর নাচাইবেন। ইহার রাঁধা ভাত⋯নিরুদ্বেগে উদরসাৎ করিবেন। কিন্তু এ যে দেহটাকে অস্পৃষ্ট রাখিতে চাহিতেছে। ভোগ্যবস্তুর এ স্পর্ধা সমাজ সহ্য করিবে কেন?⋯"

এই যে প্রশ্ন, এর মধ্যে বেদনা কি পরিমাণ ফুটেছে তা অতি স্পষ্ট। বনবিহারী এ দেশের মেয়েদের অসহায়তায় যে তীব্র বেদনা বোধ করেছেন, তার প্রমাণ তাঁর বহু রচনায়, কারটুন ছবিতে। 'দশচক্র' উপন্যাসেও ঐ একই বেদনা এবং পুরুষের কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তীব্র পরিহাস। আরও একটি অতি নির্মম পরিহাসের ছবি দেখা যাবে তাঁর 'সিরাজির পেয়ালা' নামক ছোট উপন্যাসে। (বঙ্গবাণী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৩ আশ্বিন) মেয়েদের অসহায়ত্বের এমন বিপ্লবাত্মক ছবি বাংলাভাষায় এ পর্যন্ত রচিত হয় নি।

কিন্তু সিরাজির পেয়ালার কথা বলবার আগে সুবিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর একখানি চিঠি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করছি। চিঠিখানা এই—

"আপনার প্রবন্ধে (যুগান্তর সাময়িকী ১১-৭-৬৫) জানতে পারলাম, প্রায় ৪০ বছর আগে আমাদের সেকেলেদের সমসাময়িক লেখক বনবিহারী মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। আপনার ঐ লেখাটি না বেরুলে তাঁর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা বন্ধুরা কেউই তৎকালীন বিশিষ্ট এবং এখনকার বিস্মৃত এই একটি লেখকের লোকান্তরের খবর জানতে পারতেন না। কোন না কোনো কাগজের একটি কোণেও মনে হচ্ছে এ খবর বেরোয় নি। সম্ভবত সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁকে মনে করার মত আর কেউ নেই।

"কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অনুরাগী ভক্ত পাঠক-পাঠিকা কম ছিলেন না। যাঁরা মাসের পর মাস বঙ্গবাণীতে দশচক্র পড়ার জন্য উৎসুক থাকতেন।⋯ কোন এক সময়ে 'নরকের কীট' পড়েছেন শনিবারের চিঠিতে। 'সিরাজির পেয়ালা'র কঠিন শাণিত ব্যঙ্গ পড়ে বিধবা-সধবা মেয়েরা কঠিন পাথর হয়ে গেছেন, ভাবনা আর বেশী এগোতে পারেনি তাঁদের ভীরু মনে। এবং আজও ভুলে যান নি তাঁর কঠিন উক্তিময় রচনা। তা হলে কি মাত্র আমরা দু-একজন মাত্র বেঁচে আছি?⋯আপনি তাঁর স্যাটায়ারধর্মী রচনার কথা নিয়ে তাঁকে স্মরণ করেছেন সেটাই তো তাঁর 'তিনিত্ব'। দশচক্রের শশী,

নিশি, তাদের পিতৃমাতৃপরায়ণতা, আবার তাদের নিজস্ব ব্যক্তিমতবাদ পড়তে পড়তে লেখকের দুধারে কাটা শাণিত উক্তি ও যুক্তি, আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বাচনভঙ্গিতে ও আজকালকার সমস্যামূলক গল্প-উপন্যাসের কথাবার্তার ভঙ্গিতে যে কত পার্থক্য তা বলে শেষ করা যায় না। দশচক্রে তীক্ষ্ণ সমাজদর্শনও যেমন আছে, তেমনি স্নিগ্ধ উক্তিও উঁকি দিয়ে যায়···

"তাঁর গল্প উপন্যাস নাটকের যে ভাবসঙ্ঘাত, তা বেশীর ভাগই শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে ফুটে উঠলেও সমস্ত বক্তব্য, ও দেখার অন্তরে অন্তরে, তাঁর সহৃদয় মানবসত্য দর্শনই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। নিন্দা ধিক্কার দিতে গিয়েও সহসা আর এক দিক দেখতে পেয়ে থেমে গেছেন যেন! সিরাজির পেয়ালা আর নরকের কীট দুটি গল্পে ছত্রে ছত্রে লেখকের মন আলোর মত দেখা যায়। ভণ্ডামি ভানের আড়ালে মানবমনের কি বেদনাময় দর্শন।

বছর চৌদ্দ আগে (১৯৫১) একবার হরিদ্বার গিয়েছিলাম। কনখলে রামকৃষ্ণ মিশনে অতিথি হয়েছিলাম। সেখানে সহসা এক পরিচিত সাধু মহারাজ আমাকে বললেন, "মা, আমরা ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদের ডাক্তার করে পেয়েছি এই ক' মাস হল। খুব চমৎকার লোক।"—তিনি জানতেন আমি একটু বাংলা সাহিত্য পড়ি। আমি খুব খুশি হয়ে বললাম, 'নিয়ে যাবেন তাঁর বাড়িতে?"

"সন্ধ্যা বেলা। গেলাম মহারাজের সঙ্গে।···তিনি আমাকে চিনতেন না, চেনবার কথা নয়।···বললাম তাঁর লেখার একজন ভক্ত পাঠিকা ছিলাম আমি। কোথায় গেছে কোন্ লেখা। কোনো মোহই আর তাঁর নেই। আমি তাঁর দু-একটি বইয়ের নাম করলাম। বললেন, 'নরকের কীট' পড়েছেন?'···

"কোথায় কোনখানে একটু মোহ বোধহয় তখনও লুকনো ছিল দু-একটি লেখার জন্য। কিংবা আমার আগ্রহ দেখে বললেন।

"আপনার প্রবন্ধে দেখছি তিনি মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন লেখাসঞ্চয়ের মোহ থেকে।···সেই সময়েই কয়েকদিন পূর্বে তাঁর পুত্রের বিবাহ ঠিক হয়েছিল—তাঁর এই মিশনের কর্মভার গ্রহণের সময়েই। কিন্তু তিনি তা ছেড়ে এখানেই চলে এলেন। পঞ্চাশ টাকা বেতন এবং বাসস্থান! "চলে এলেন পুত্রের শুভবিবাহের সময়?" "সে সেখানের সবাই দেখবেন, অথবা যারা বিয়ে করবে, তারাই ব্যবস্থা করবে।" জ্ঞান মহারাজের কাছে শুনলাম ছেলে নতুন বৌকে নিয়ে পিতার কাছে এসেছিলেন, প্রণাম করে গেলেন।···

"আগে তাঁকে দেখি নি। তাঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। দেখলাম চমৎকার সুন্দর দীর্ঘ ঋজুদেহ, তীক্ষ্ণ নাক মুখ চোখ। তখনো চুল কালো। পরিপূর্ণ কর্মক্ষম শিক্ষিত মানুষটিকে পেয়ে শিক্ষিত সাহিত্যরসিক সাধু-মণ্ডলীর মধ্যে নতুন আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।..."

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর চিঠিতে একটি প্রশ্ন আছে—"তাহলে তাঁকে স্মরণ করবার মতো কি আমরা দু-একজন মাত্র বেঁচে আছি?" এ প্রশ্ন নিয়ে পরে আলোচনা করব।

১৯২৫-এর পর বহুকাল তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তাঁর সম্পর্কে খবর শুনতাম মাঝে মাঝে, আজ এখানে কাল সেখানে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে "স্কলার জিপসি" ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি নি। কেউ তাঁকে সম্পূর্ণ পায় না, তিনি কোথাও স্থায়ী বাসস্থান গড়েন না, দেখা দিয়েই মিলিয়ে যান। তাই দেখা হওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। এমন সময় ঠিকানা মিলে গেল।

তাঁকে পেলাম ত্রিশ বছর পরে। সে চেহারার বদল ঘটেছে, শুধু কণ্ঠস্বরটি তেমনি স্পষ্ট মধুর সঙ্গীতধর্মী। শুধু তা শুনলেও এতদিন পরে সেটি কার কণ্ঠ চিনে নিতে দেরি হত না। কৈলাস বসু স্ট্রীটে তখন থাকি, সেখানেই তিনি আসতেন, সঙ্গে থাকতেন তাঁর ভাই বঙ্কুবিহারী।

আমার 'স্মৃতিচিত্রণে' তাঁর কথা একটুখানি লিখেছিলাম। সেই প্রথম পরিচয়ের কথা বিষয়ে। 'দ্বিতীয় স্মৃতি'তে লিখলাম একটি অধ্যায়। যখন লিখছি তখন 'স্কলার জিপসি' পালিয়ে গেছেন আন্দামানে। সেখানে গিয়ে চিঠি লিখেছেন। আবার ফিরে এসেই চলে এসেছেন আমার কাছে।

একখানি ব্যঙ্গ সংকলন গ্রন্থে (ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী) তাঁর নরকের কীট নামক ব্যঙ্গ গল্পটিকে বিস্মৃতির নরক থেকে উদ্ধার করে পুনর্মুদ্রিত করলাম। সেই হল কোনো সাহিত্য গ্রন্থে তাঁর প্রথম স্বীকৃতি। ভূমিকায় লিখেছিলাম (২য় সং ১৯৫৯) "যদি ইউরোপের রোজার বেকন বা এমন কি ভোলতেয়রের যুগেও আমাদের দেশের আধুনিক যুগের ব্যঙ্গ রচয়িতারা জন্মাতেন, তা হলে সংখ্যাগুরুর সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণের দরুন বাংলা দেশে প্রথম শহীদ হতেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

বনবিহারীর যত অপ্রকাশিত লেখা ছিল, (অন্যত্র যা ছিল তা তিনি উদ্ধার করতে পারেন নি, ছাপাও হয় নি) সমস্ত আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, একখানা চিঠি লিখে জানালেন আমাকে। লিখলেন—'তোমার

যেমন ইচ্ছা এগুলির ব্যবস্থা করবে।' আমি অনেক জায়গাতেই সেগুলি ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু এখনও অপ্রকাশিত কিছু আছে। এই লেখাগুলির মধ্যে 'কর্মফল' নামক একটি রচনা আছে, তার প্রথম দিকটা আমি উদ্ধৃত করছি। এটি তাঁর ধারালো ব্যঙ্গের অন্যতম একটি নিদর্শন মাত্র।—

"কর্মফলে বিশ্বাস করেন? এ প্রশ্ন প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। রাম ঢিল ছুড়িল, এবং তাহাতে শ্যামের মাথা ফাটিল। রামের কর্মের ফল শ্যাম ভোগ করিতেছে। এ কথা কে না বিশ্বাস করে? কিন্তু এ বিশ্বাসে চলিবে না। বিশ্বাস করিতে হইবে শ্যামের মাথা ফাটা শ্যামেরই কর্মফল। ইহজন্মের না হউক পূর্ব জন্মের!

"ধরিয়া লওয়া যাক, ফল দিতেছেন একজন বিধাতা পুরুষ। তিনি রামকে নিমিত্ত করিয়া শ্যামের মাথা ফাটাইলেন, কোন্ অপরাধের দণ্ড হিসাবে ফাটাইলেন তাহা বুঝিতে দিলেন না। অর্থাৎ দণ্ড দিয়া কাহারও সংশোধন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু নিজের হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা।"...

পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যের এটি আরম্ভ মাত্র। এটুকু আমি উদ্ধৃত করলাম আরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমার মনে হয়, এর মধ্যে স্যাটায়ারিস্টের ভূমিকা কি, তারও নিশ্চয় আভাস পাওয়া যাবে। তা হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য নয়, শিক্ষা দেবার জন্য। হিন্দুর বিধাতা-পুরুষ স্যাটায়ারিস্ট নন।

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ অপাংক্তেয় বলেই মনে হয়। কিংবা এর শক্তি সম্পর্কে পণ্ডিতেরা সচেতন নন। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে স্যাটায়ার বিশেষভাবে স্থান ও মর্যাদা পায়, অনেক সময় সাহিত্যের না হলেও ঐতিহাসিক মর্যাদা পায়। কিন্তু বনবিহারীর রচনা শুধু ব্যঙ্গ নয়, তা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য এবং বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে তার যথাস্থান নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল, এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বনবিহারী তাঁর 'দশচক্র' 'যোগভ্রষ্ট,' অথবা 'সিরাজির পেয়ালা'য় যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তেমন স্পষ্ট এবং পূর্ণ মানবিক চরিত্র বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি আছে বলে বোধ হয় না। এ সব উপন্যাস, উপন্যাসরূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার শ্রেষ্ঠ গৌরবলাভ করতে পারত।

মৃত্যু সংবাদও কোনো কাগজে ছাপা হল না। ৬-৭-৬৫ তারিখের স্টেটসম্যানে ব্যক্তিগত কলমে মৃত্যু শিরোনামার নিচে টাকা দিয়ে সংবাদ ছাপানো হল—

On July 5, 1965 at 6-25 A.M. in Calcutta, peacefully Dr. Banabihari, M.B. retired Civil Surgeon aged 80. "Rest in peace".

এতবড় দুর্ভাগ্য সবার চোখের সামনেই ঘটল। তিনি কোথাও সভাপতিত্ব করেন নি, প্রধান অতিথি হন নি, জন্মদিন করেন নি, কিন্তু সে তাঁর অপরাধ নয়। তাঁর দান সাহিত্যজগতে রেখে গেছেন, তাঁর নিজের সম্পর্কে সাহিত্য ইতিহাসের অধ্যায় লেখা তাঁর কর্তব্য নয়, সে কর্তব্য ইতিহাস লেখকের।

ধর্মাচার বিষয়ে বা সমাজ বিষয়ে চরম রক্ষণশীলরা তাঁর লেখায় স্বভাবতই আহত হতে পারেন, সব ব্যঙ্গই কোনো না কোনো সম্প্রদায়কে আহত করে, ব্যঙ্গ সাহিত্যের উদ্ভবই এই উদ্দেশ্যে। উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ সাহিত্য সে জন্য সভ্য দেশে আদৃত। বিদেশী ব্যঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই তা বোঝা যাবে।

অতএব কোনো রক্ষণশীল সম্প্রদায় বা ব্যক্তি, বনবিহারীর সাহিত্যকে পচ্ছন্দ না করতে পারেন, এবং না করলে বলবার কিছু নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের মূল্য বিচারে তাঁর দশচক্র, যোগভ্রষ্ট বা সিরাজির পেয়ালা নামক যে সব উপন্যাস উচ্চমূল্য পেতে পারত সেই উপন্যাসগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে অস্পৃশ্য হল কেন? সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকেরা ইতিহাসের এই শূন্যতা মেনে নিলেন কেন?

'দশচক্র' সব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। শুধু সফল ব্যঙ্গ সাহিত্য বলে নয়, সফল উপন্যাস বলে। এর পরিবেশ বাস্তব। যে যুগের পটে গল্পটি সাজানো হয়েছে সে যুগের যথার্থ চরিত্র এতে প্রকাশিত। যে জীবনচিত্র এতে আঁকা হয়েছে তা বাস্তব। প্রত্যেকটি মানুষ জীবন্ত, এবং শুধু জীবন্ত নয়, তারা প্রত্যেকেই এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে তাদের ভোলা যায় না। তদুপরি তারা হিউম্যান। মানবীয় পূর্ণতা তাদের আছে, সবলতা দুর্বলতা মিলিয়ে তাদের চরিত্র হিউম্যান। তার পরে প্লট। প্লট এমনই চিত্তাকর্ষক যে শেষ পর্যন্ত প্রবল একটা আকর্ষণ পাঠককে টেনে নিতে থাকে। তারপর এর ভাষা। রসসমৃদ্ধ ভাষা যদি সাহিত্যের অন্যতম বড় পরিচয় হয়, তা হলে এরকম চরিত্রানুগ সরস জীবন্ত এবং ধারালো ভাষা অন্যত্র দুর্লভ মনে হবে। এর পাতায় পাতায় এমন চমৎকার সব উপমা এবং এপিগ্রাম আছে যা গল্পকে গভীরতার দিকে অতি সহজে বিস্তার

করে দিয়েছে। এর ভাষা ন্যাকামি-বর্জিত, কিন্তু সেন্টিমেন্টবর্জিত নয়। সর্বকালীন যুক্তিবাদী অথচ অতি সহৃদয় একটি স্রষ্টা মন আছে এর পিছনে, প্রতি পদে তার স্পর্শ বিস্মিত করে, চমকিত করে। এতে প্রচার আছে, কিন্তু কোথাও তা উপন্যাসের মূল বাঁধন থেকে পৃথক হয়ে যায় নি। পিছনে যুক্তিবাদী আধুনিক মন, কিন্তু ভাষায় ক্ল্যাসিক্যাল ঔজ্জ্বল্য। এর মধ্যে শিল্পীর একটি মেসেজ বা বাণী আছে। এই মেসেজ, সকল প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসেই থাকে। বাঙ্গ লেখকের সে মেসেজ-এর সঙ্গে কিছু গুঁতো থাকে।

পড়তে আরম্ভ করলে মনের মধ্যে সব সময় এ চেতনা জাগতে থাকে যে একখানি খাপে ঢাকা ধারালো ছোরা এর পাশাপাশি চলছে। এ ছোরা যে-কোন মুহূর্তে খাপ থেকে বেরিয়ে এসে আঘাত হেনে আবার খাপে গিয়ে ঢুকবে।

বনবিহারী ভাল সংস্কৃত জানতেন, সংস্কৃতে শাস্ত্রাদি সবই ভাল পড়া ছিল, লেখবার সময় তিনি তার সদ্ব্যবহার করেছেন।

তাঁর সমস্ত লেখায় সুন্দর সুন্দর উপমার ফুলঝুরি, এপিগ্রাম, সমাজচিন্তা ধর্মচিন্তা এবং ধারযুক্ত অথচ সংবেদনশীল ভাষায় মনের কথা প্রকাশের দৃষ্টান্ত প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ঠাসা। সমাজচিন্তার শিকড় তাঁর মনের গভীরে হাজার শাখা মেলেছে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'দশচক্র' প্রথমে বিজয়চন্দ্র মজুমদারেব সম্পাদনায় বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তকাকারে, শনিরঞ্জন প্রেস থেকে। এই বঙ্গবাণীতেই তাঁর সিরাজির পেয়ালা নামক ২৬ পৃষ্ঠার বড় গল্প (অথবা ছোট উপন্যাস) ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হয়। সিরাজির পেয়ালা পড়তে গিয়ে মেয়েদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার আভাস জ্যোতির্ময়ী দেবীর চিঠিতেই পাওয়া গেছে।

এই গল্পটিতে সমাজ নিগৃহীত দুটি মেয়ের মনের প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তিনি সমস্ত নারী সমাজের অন্তরের বেদনা প্রকাশ করেছেন। এ গল্প (যেমন দশচক্র) সহ্য করবার মত পাঠক খুব বেশি ছিলেন বলে মনে হয় না।

বদ্ধ জীর্ণ ফসিল হয়ে যাওয়া মনের ভিতর এমন নির্মম অথচ স্বাস্থ্যকর ল্যান্‌সেট চালানো, ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিল কি না কল্পনা করতে কষ্ট হয়।

আমি সিরাজির পেয়ালা গল্পের আশ্চর্য সুন্দর ভাষা, উপমা, এপিগ্রাম

ইত্যাদির উদ্ধৃতি থেকে বিরত রইলাম। এমন একটি অখণ্ড জিনিসকে কোনো ভাবেই খণ্ডিত করার ইচ্ছা আমার নেই।

বনবিহারীর লেখা পড়তে বসলে মনে হবে একজন প্রকৃত শিক্ষিত উচ্চ-রুচিসম্পন্ন এবং অতি গভীরে প্রসারিত চিন্তার অধিকারী ব্যক্তির সম্মুখে বসে আছি।

কারটুন ছবি, ছন্দোরচনা এবং গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ রচনা—এই তিনটি বিভাগেই অসাধারণ শক্তির অধিকারী বনবিহারী। এবং এই তিনটি শক্তির সাহায্যেই তিনি সমাজের ইষ্ট করতে চেয়েছেন। বাঙালীর চিন্তার দুর্বলতা ভেঙে দেওয়া এবং সামাজিক অন্যায় অন্ধকারের স্থানে প্রখর আলোকপাতন, এই ছিল তাঁর সমস্ত শিল্প প্রেরণায় মূলে। তিনি কৌতুক সৃষ্টিতে হাসানোর চেষ্টা করেন নি, ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে ভাবাতে ও কাঁদাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর আঁকা কারটুন ছবি যদি কেউ দেখে থাকেন, তবে এ ব্যাপারেও তিনি যে অদ্বিতীয় ছিলেন তা বোঝা যাবে। বাংলা দেশে দুজন মাত্র শক্তিশালী কারটুনিস্টের আবির্ভাব ঘটেছিল গত যুগে—বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথের বিরূপবজ্র বই-আকারে প্রচারিত হয়েছিল, যদিও তার প্রতিও গোঁড়া মহলের বিরূপতা প্রসিদ্ধ। তখন তা অর্ধদগ্ধ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতোই এসে পড়েছিল সমাজের মাথায়। বনবিহারীর কারটুনও বজ্র, কিন্তু লাইটনিং অর্থে। মাথার উপর কয়েক হাজার কোটি ভোল্টের আঘাত এসে লাগে। বনবিহারীর কারটুনগুলি নানা মাসিকপত্রের পাতায় ছড়িয়ে পড়ে আছে। কোনো সদাশয় ব্যক্তি যদি কারটুন ছবির মূল্য কখনো বোঝেন, তবে তিনি হয় তো তা সংগ্রহ করবেন। কারটুন ছবির বর্ণনা ভাল হয় না, দেখতে হয়।

বাংলার মেয়েদের অসহায়তা স্মরণ করে তিনি বেদনা বোধ করেছেন, তাঁর অনেক স্যাটায়ারের প্রেরণাই এই বেদনা থেকে, এ কথা আগে বলেছি।

বনবিহারী ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বেপরোয়া' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। বেপরোয়ার একটি দল ছিল। দলের পরিচয়—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য। বিষ্ণুচরণ ছিলেন সম্পাদক। এই কাগজে বনবিহারীই সবচেয়ে বেশি স্থান অধিকার করে আছেন। তাতে সন্দেহ থাকে না যে, এর পরিকল্পনা তাঁরই। বিজয়চন্দ্র মজুমদার তখন ছিলেন বঙ্গবাণীর সম্পাদক। বঙ্গবাণী ৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড থেকে স্বত্বাধিকারী রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হত,

এ কাগজেরও একজন প্রধান লেখক ছিলেন বনবিহারী।

বেপরোয়াতেও বনবিহারী মেয়েদের অসহায়তার কাহিনী নির্মম ব্যঙ্গের ভিতর ফুটিয়ে তুলেছেন। (বেপরোয়া. ১৩২৯, ইং ১৯২৩ তৃতীয় সংখ্যা) এই সময় প্রবাসীতে একটি খবর বেরোয়—বাঁকুড়ায় দুটি হিন্দু বালিকাকে কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে তারা আত্মহত্যা করে।

এই ঘটনায় বিচলিত বনবিহারী 'কলির ফের' নামক ব্যঙ্গ কবিতা লিখলেন। এটি গল্পের আকারে পদ্যে লেখা। প্লটটা এই—এক মেয়ে নাকখসা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে আপত্তি করেছিল, তাতে মেয়ের বাবা তার উপর চটে গিয়ে বলল—

নাক নিয়ে কি ধুয়ে খাবে ?
কর্তা বললেন চটে।
শালগ্রাম যে দেবতা, তার ত
নাক নেই ক মোটে।

বিয়ে ঠেকানো গেল না। কিন্তু মেয়ে স্বামীর ঘরে থাকতে অস্বীকার করল, তখন পিসি-মাসিরা এসে বোঝাতে লাগল—

পতিই হলেন দেবতা
নারীর পরম তীর্থ, পতি···
পতি পরম গুরু, এমন
চিরুণীতেও লেখে !
পতিভক্তি শিখলি না ক
আজও এ সব দেখে !

বনবিহারী ৫-১২-৫৯ তারিখে আমাকে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, "···আমি কিছু সঞ্চয় রাখি না। রাখবার আধারও নেই। অফিশিয়াল খামের পিছনে অর্ডিনারি কালি কলম দিয়ে ছবি এঁকে ছড়িয়ে দিয়েছি। পয়সা চাই নি, অ্যাপ্রিসিয়েশনও ভরসা করি নি।" এর এক সপ্তাহ পরে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে লিখছেন—"তোমার লেখা পড়ে তোমাকে আমার সগোত্র বলে মনে হয়েছে। তোমার মতামতকে আমি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি। আমার সমস্ত লেখা (অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ) তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। এদের সম্বন্ধে তুমি যা করবার ক'রো। কোন্‌টা ছাপবে কোন্‌টা ফেলবে তা তোমার বিচারের উপর ছেড়ে দিলুম।"

আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না বলেই আমাদের

পরস্পরের অন্তরঙ্গতা এতখানি গাঢ় হওয়া সম্ভব হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এই একমাত্র ব্যঙ্গ রচয়িতাকে কাছে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। আমার কাছে তাঁর মনের কথা সবই বলতেন। একবার লিখেছিলেন, "আমার বিশ্বাস, আমার মত করে আর কেউ বলে নি—নিছক সংসারের মঙ্গল-কামনায়।"

যাকে সাধারণত আমরা এদেশে ব্যঙ্গ রচনা বলি, তাতে ব্যঙ্গ অংশ কম, হিউমার অংশ বেশি। কিন্তু প্রকৃত ব্যঙ্গ স্রষ্টা, এবং ব্যঙ্গই যাঁর ধর্ম, তিনি বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। এই তাঁর নিজস্ব প্রকাশ রূপ। এরই ভিতর দিয়ে তিনি কৃত্রিমতার মুখোশ উন্মোচনকারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। ব্যঙ্গও যে উচ্চ সাহিত্য হতে পারে, তার অন্যতম প্রমাণ তিনি। তিনি নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনধারণের সামঞ্জস্য করেছিলেন বলে তিনি পপুলার ছিলেন না, এবং নিজের বিশ্বাস ও মত ব্যঙ্গ সাহিত্যে বা চিত্রে ফুটিয়েছেন বলে তাঁর রচনাও পপুলার নয়। কারণ সভ্য দেশের তুলনায় এদিক থেকে আমাদের এখনও কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। আশা করি এতক্ষণে জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

এই চিরসন্ন্যাসী পরম স্নেহশীল দুর্দান্ত মানুষটির কথা বলতে বিস্তৃততর জায়গা প্রয়োজন।

তবে আমার একটি গর্ব এই আছে যে, এই মোহমুক্ত মানুষটিকে আমি আন্তরিকতা দিয়ে পরাজিত করেছিলাম। আমি তাঁর লেখা, বা তাঁকে, পুনরায় পাঠকসমাজে আনায় রাজি করিয়েছিলাম। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এতে তিনি আনন্দ পেয়েছেন, আমার কাছে ঋণী হয়েছেন। প্রথমে তাঁকে না জানিয়ে তাঁর নরকের কীট পুনর্মুদ্রিত করি, এবং তাঁর লেখা প্রচার যে অন্তত সমাজের কল্যাণের জন্য দরকার এ কথা শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করে নেন। তিনি বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন মাঝপথে। কিন্তু এজন্য তাঁকে চোখের জল ফেলতে হয়েছিল, সে কথা তিনি লিখে জানিয়েছিলেন।

তিনি হলিডে'স ইন, কারাবাইন'স কোভ ম্যারিন ড্রাইভ, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৩-৪-৬১ তারিখে লিখেছেন—

"পরিমল,[1] ঠিকানা বদলেছি। এবার ফেরার। তুমি ইদানীং আমার জন্য যা করেছ তার জন্য অত্যন্ত ঋণী আছি। ঋণী লোকের ফেরার হওয়া দেখতে খারাপ। তাই ঠিকানা জানালুম।

"ঠিকানা জমকালো। জমকালো ছিল হয় তো পঞ্চাশ বছর আগে। এখন যা অবশিষ্ট আছে তা হচ্ছে একটি টিলার ওপরে একটি পোড়া কাঠের বাড়ি। ঘর ও বারাণ্ডায় দরাজ space, তবে সকালে চোখ খুলেই সামনে সমুদ্রের ওপর সূর্যোদয় দেখি। ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়। আর চারপাশে নারকেল গাছের দল "stand at ease"-এ দাঁড়িয়ে আছে।

"আমি কুনো মানুষ। মনের মত কোণ পেয়েছি।

"উত্তর দেবার চেষ্টা কোরো না। কারণ উত্তর আমার হাতে পৌঁছবে কি না, সন্দেহ।

"আমিও সহজে চিঠি লিখছি না। তোমার মঙ্গলকামনা করি। আশীর্বাদক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

কিন্তু আরও একবার দুঃখ প্রকাশ করতেই হবে যে, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বহু অভাজনের কথা আছে। এমন কি যাঁদের কোনো কৃতিত্বের দাবি নেই, এবং স্বভাবতই বিস্মৃত, তাঁরা শুধু প্রাচীন বলেই কবর থেকে তাঁদের নাম টেনে বার করে সাহিত্যের ইতিহাসে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বনবিহারীর মতো এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী সাহিত্য স্রষ্টা এবং ব্যঙ্গ সাহিত্য স্রষ্টা, সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি।

মোহিতলাল মজুমদার

(১৮৮৮—১৯৫২)

মোহিতলাল ও নীরদচন্দ্র চৌধুরী দুজনের চরিত্রে কিছু মিল আছে। দুজনেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অন্য সবার মধ্যে থেকেও পৃথক। দুজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধিধারী। দুজনেই চরিত্র-দৃঢ়তায়, আপন মতবাদের বিশ্বাসে, অনমনীয়। আবার দুজনের মধ্যে অমিলও তেমনি স্পষ্ট। মোহিতলাল ভাবপ্রধান, নীরদচন্দ্র বুদ্ধিপ্রধান।

কিন্তু তুলনা বেশিদূর টেনে লাভ নেই।

মোহিতলাল সাহিত্য বিষয়ে নিজের একটি বিশেষ মত গঠন করেছিলেন এবং তা তাঁর সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর চিন্তার গভীরতা স্তরের পর স্তর বিস্তার লাভ করেছে, এবং তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সাহিত্যের যে মূল্য নির্ধারণ করেছেন, তার রূপ অতুলনীয়। সাহিত্য বিশ্লেষণে যে ভাবগম্ভীর অথচ সুখপাঠ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন, সে রকম ভাষা সাহিত্য সমালোচকের ঈর্ষার বস্তু। এবং মোহিতলাল কবি ছিলেন বলে তাঁর ভাষা স্বভাবতই কিছু ভাবাবেগপূর্ণ, কিন্তু তবু তাঁর অপরূপ বিশ্লেষণ তাতে ক্ষুণ্ন হয় নি। তাঁর প্রবন্ধের ভাষাও অনেকক্ষেত্রে কাব্য হয়ে উঠেছে। তা বার বার পড়তে ইচ্ছা হয়। তিনি বাংলা ভাষা, বাঙালী, ও বাংলা দেশ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছেন, এবং নিজের মনে এই তিনকে আশ্রয় করে যে আদর্শ, যে ছবি, গড়ে তুলেছেন, তা দুর্গের মতো দৃঢ়। সেখানে কারো সঙ্গে তাঁর কোনো রফার প্রশ্ন নেই। তিনি সাহিত্য সমালোচকরূপে নিজেকে অপরাজেয় মনে করেছেন, কারণ বাংলা কথা-সাহিত্য অথবা কাব্য-সাহিত্য কতখানি জীবনের সঙ্গে যুক্ত এবং তাকে ভিত্তি করে কতখানি কল্পনার দিকে প্রসারিত, অথবা প্রেমের চিত্র কতখানি দেহ সম্পর্কিত এবং কতখানি দেহ সম্পর্ক বজায় রেখে দেহাতীত, এ সবই তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। তিনি কাব্যের কল্পলোকে যেখানে ছুটির নিমন্ত্রণ, সে কল্পলোককে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন, এবং যে কামনা জীবনাশ্রয়ী তাকেও তিনি চরম স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু কাব্যরুচিহীন দেহসর্বস্বতা আদৌ স্বীকার করেন নি।

তিনি কবি ছিলেন, প্রবন্ধ লেখক ছিলেন, সমালোচক ছিলেন, শিক্ষক ছিলেন, এবং প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন। চট করে রেগে যাওয়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। ব্যক্তিগতভাবে এই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেত তাঁর কথায়। প্রতিপক্ষকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতেন। সজনীকান্তকে নানা বিষয়ে উত্তেজিত করার মূলে ছিলেন তিনি (যদিও একা তিনি নন)। শনিবারের চিঠির যে পূর্ব গোষ্ঠী রবীন্দ্রবিরোধিতার মূলে, সে গোষ্ঠীর পূর্ণ বৈঠকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। আমি যখন এঁদের সঙ্গে পরিচিত হই (১৯৩২), তখন শনিবারের চিঠির গোষ্ঠী ভেঙে গেছে।

রবীন্দ্রবিরোধিতার যে আভাস বা পরিচয় এঁদের কাছাকাছি এসে অনুভব করলাম, তার দুটি দিক। একটি দিকে নীতিগত এবং মতবাদের বিরোধ, আর একটি তারই জের স্বরূপ ব্যক্তিগত আক্রমণ, যা বেশির ভাগ মুখেই উচ্চারিত হয়েছে, ছাপার অক্ষরেও মাঝে মাঝে বেরিয়েছে। কিন্তু সেও সাময়িক মতভেদের জন্য। অথচ রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রতি প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করতেও দেখেছি। আবার শেষের কবিতা পড়ে সম্পূর্ণ অভিভূত হতেও দেখেছি। এমন সুন্দর ভাষায় রবীন্দ্রপ্রশস্তি আর কেউ করেছেন কি না আমার জানা নেই।

মোহিতলালের প্রতি আমি নানা বিষয়ে কৃতজ্ঞ। আমার সম্পাদনা কালে শনিবারের চিঠির পূর্বতন লেখকদের সহযোগিতা পেয়েছি প্রচুর, কিন্তু মোহিতলাল অনেকবার আমাকে সহানুভূতির সঙ্গে অগ্রজের মতো উপদেশ দিয়েছেন। এবং তাঁর স্মরগরল যখন প্রথম (১৯৩৬) প্রকাশিত হয়, তখন তার একখণ্ড আমাকে উপহার দেবার সময় (১৪ই পৌষ, ১৩৪৩) তিনি নিজ হাতে যা লিখলেন, তাতে আমি কিছু বিব্রত বোধই করেছি। তিনি আমার নামের আগে "শ্রদ্ধেয় বন্ধু" বিশেষণ প্রয়োগ করলেন। তাঁর চেয়ে আমি প্রায় দশ বছরের ছোট, এবং তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণের মতো কিছু করেছি কি না তা ভেবে পাই নি। এটি তাঁর চরিত্রের উদারতার দিক।

ভাষা বিষয়েও মোহিতলালের নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। তিনি "সাথে" শব্দটি বাংলা গদ্যে অতি সঙ্গতভাবেই পরিত্যাজ্য মনে করেছেন। ওটি বিশেষভাবে কবিতায় ব্যবহার্য। সেজন্য তিনি গদ্যে "সাথে" ব্যবহারে ভীষণ রুষ্ট হতেন। ভাষার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার দিকে তাঁর এমনই ঝোঁক ছিল যে এটিকে তিনি ধর্ম বলে মানতেন।

শনিবারের চিঠিতে, আমার সম্পাদনাকাল ২২ মাস অতিক্রান্ত হলে, মোহিতলাল সালতামামি লিখলেন (কার্তিক, ১৩৪১), প্রথম প্রবন্ধরূপে ছাপা হল সেটি। তাতে শনিবারের চিঠির তৎকালীন অবস্থা কিছু জানা যাবে। মোহিতলাল লিখলেন—

"..গত কিছুকাল যাবং 'চিঠি'র সম্পাদন ও পরিচালনভার যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি পত্রখানিকে বহু পরিশ্রমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।. চিঠির লেখকগোষ্ঠী এখন আর কোনও coterie নহে—যেখানে যে কেহ সত্যসন্ধ শক্তিমান লেখক আছেন তাঁহারই সুচিন্তিত সারবান রচনা.. প্রকাশিত হইতেছে ও হইবে।..."

সাহিত্যজগৎ ভিন্ন অন্য কোনো জগতে তিনি শান্তিতে বাস করতেন কি না সন্দেহ। তাই তিনি নিজে যা রচনা করতেন তা সর্বদা অন্যকে পড়ে শোনাতেন। অথবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে নিজে শুনতেন। আমিও তাঁর অনুরোধে এ কার্য করেছি অনেক বার। কিন্তু তাঁর লেখা শোনবার সময় তিনি তার ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যেতেন যে, তখন তাঁর যেন বাইরের কোনো চেতনা থাকত না। চোখ মুখ এক অপূর্ব আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। চেহারায় কণ্ঠস্বরে এবং অনমনীয় মেরুদণ্ডের জোরালো ভঙ্গির চালচলনে তিনি যেখানেই উপস্থিত থাকতেন, সেখানেই তিনি সবার কেন্দ্র হয়ে উঠতেন। তাঁর চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্য সবার মনোযোগ তিনি তাঁর দিকেই আকর্ষণ করে রাখতেন। তার আরো কারণ হয় তো এই যে, তিনি আবেগপ্রবণ ছিলেন বলে, তাঁর মনে কারো আঘাত দিতে সঙ্কোচ হত। এবং দেবার ক্ষমতাও সবার ছিল না। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল খুব প্রচণ্ড, যদিও এ বিষয়েও দু-এক ক্ষেত্রে তাঁর মনকে দ্বিধাবিভক্ত হতে দেখেছি। তাঁর সাহিত্য বিচারের সীমা ছিল নির্দিষ্ট, কিন্তু কদাপি সঙ্কীর্ণ নয়। সেই সীমার মধ্যে তিনি ছিলেন প্রায় অপরাজেয়। বিশ্বাসের অবিশ্বাসের জোর প্রবল, ভাষায় শিথিলতা নেই, চিন্তাধারা স্বচ্ছ, এবং তা বহু স্তর পর্যন্ত গভীরে বিস্তৃত. তাঁর গদ্যভঙ্গি এবং কাব্যের বাঁধন মূলতঃ ক্ল্যাসিক্যাল, এবং অন্যের রচনাতেও এ সবের অভাব তাঁকে কিছু পীড়া দিত। অথচ মনের আর একটা দিক ছিল উদার, নবাগত অনেককেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাগতম্ জানিয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশান্বিত হয়ে উঠেছেন। আবার, সজনীকান্তকে যথেষ্ট ভালবাসা সত্ত্বেও তাঁকে তিনি কবিরূপে কদাচিৎ স্বীকৃতি দিয়েছেন। মাত্র একবার সজনীকান্তের পঞ্চাশত্তম বার্ষিক জন্মদিন

উপলক্ষে ঢাকা থেকে যে ছয় ছত্রের আশীর্বাদ (৭ ভাদ্র ১৩৫০) পাঠিয়েছেন, সেইটি দেখেছি, তাতে লিখেছিলেন, "সম্পাদক, সাহিত্যিক ও কবি সজনীকান্ত।" অন্যত্র কোথাও বলেছেন কি না আমার জানা নেই।



১৯৩৬ সনের শীতকালে, কোনো একদিন আমরা গিয়েছিলাম ব্যারাকপুরে মোহিতলালের বাড়িতে। এ ফোটোগ্রাফ খানা গঙ্গার ধারে সন্ধ্যার পূর্বে তোলা। এতে উপস্থিত আছেন (বাঁদিক থেকে) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস ও মনোজ বসু

ঐ জন্মদিনের কথাতেই মনে পড়ল, এর আগের এক জন্মদিন (বৎসর মনে পড়ছে না, সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সনের জন্মদিন উৎসব) সম্পর্কে ধর্মতলার প্রকাশকের ঘরে বসে তিনি বহুক্ষণ ধরে আমার কাছে অনেক কথাই বলেছিলেন। (যে সব কথা আরও বিস্তারিতভাবে তিনি প্রবন্ধাকারে লিখে রেখেছিলেন, এবং তা তাঁর মৃত্যুর পরে একখানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।) সে সব দুঃখের কথা, বেদনার কথা। তাঁর মোট বক্তব্য ছিল এই

যে, বয়স্কদের সম্মাননার কথা ভুলে কনিষ্ঠদের সম্মান কুড়নোর ইচ্ছা তাঁর ভাল লাগছে না। তিনি যে শনিবারের চিঠিকে এত কাল কিভাবে সেবা করেছেন, কোনো কিছুর লাভে নয়, শুধু ভালবাসার জন্য, বাংলাদেশের মঙ্গলের জন্য, সে কথা সজনীকান্ত আর স্মরণ করেন না কেন। আজ তিনি অবহেলিত। এ কথাগুলো এভাবে লিখলে স্বভাবতই শুনতে খারাপ লাগবে তবু সসঙ্কোচে লিখলাম। মোহিতলাল যেভাবে বলেছিলেন তার মধ্যে একটা সৌন্দর্য ছিল, যার স্মৃতিমাত্র লিখতে গেলে তা আর বজায় থাকবে না, তাই শুধু খবরটাই লিখলাম। তিনি নিজে লিখেও সেই ভাষা বজায় রাখতে পারেন নি। কারণ মুখে যা বলেছিলেন তার পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়, কারণ তা ছিল তরল ভাবসর্বস্ব এবং ইঙ্গিতধর্মী।

মোহিতলাল শনিবারের চিঠির একটি প্রধান স্তম্ভ ছিলেন, এবং 'চিঠি'র প্রতি আকর্ষণ আমার আমলেও সমান ছিল। কিন্তু পরে কি কারণে সজনীকান্ত ও তাঁর মধ্যে মৌখিক সম্পর্ক থাকলেও, আন্তরিক প্রীতির কিছু অভাব ঘটেছিল, তা জানি না। সজনীকান্তের নিজের প্রতি দুর্বলতা ছিল একটু বেশি পরিমাণেই, কিন্তু তাঁর গুরুরও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিল না, যদিও দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেকখানি। তিনি অনেক বেদনা বহন করেছেন মৃত্যুর পূর্বে।

মোহিতলাল কবি, তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন, এবং তিনি সমালোচক, অতএব যাতে তিনি আনন্দ পেয়েছেন, তার কথা প্রাণখুলে স্বীকার করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটি একটি সনেট, শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'সীতা' দর্শনান্তে লেখা। এখানে শিশিরকুমারকে তিনি কবিরূপে স্বীকার করেছেন। কবিতাটির শিরোনাম "নট-কবি শিশিরকুমারের উদ্দেশে"—

"বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তোমা হেরিনু যেদিন,
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মুকুর!
চমকি চাহিনু ঊর্ধ্বে—নিশার চিকুর
দিগন্তের অন্তরালে হয় যে বিলীন!
হেরিলাম কলালক্ষ্মী আজি এ নবীন
নেপথ্য-লীলায় ধরি' নবতন সুর,
নয়নমোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর
বাজাইতে বঙ্গে আর নহে উদাসীন।
ছন্দ হেথা শরীরী যে! বাক্য হতমান।



মোহিতলাল মজুমদার

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৪০

শব্দ অর্থ প্রাণ পায় মূর্ত রসরাগে।
হৃদয়ের রসাতলে যার অধিষ্ঠান—
নরকণ্ঠস্বরে তার কি আকৃতি জাগে।
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা সমান
শ্রোত্র চেয়ে নেত্র যেন কাব্যসুধা মাগে !"

এই কবিতাটি ১৯২৫ সনে নাচঘর (৩রা মাঘ, ১৩৩১, ৩৪শ সংখ্যা) পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। শিশির-সুহৃৎ শ্রীঅমল মিত্রের সৌজন্যে এটি আমার হস্তগত হয়েছে। কবিতাটি অল্পপ্রচারিত, সেদিক থেকেও এর পুনর্মুদ্রণ সার্থক মনে হবে। অভিনয়-শিল্পীকে নবকাব্যের স্রষ্টারূপে স্বীকৃতি অভিনব মনে হয়।

বাংলা গদ্যে ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গির অনুসরণ মোহিতলালে এসে শেষ হয়েছে। এখন বাংলায় যে গদ্যরীতি চলছে, এবং আমরা যে চলতি ভাষায় লিখছি তা প্রায় আসরে বসে আলাপের ভাষা। অনেকের হাতে এর ব্যবহারও প্রশংসাযোগ্য হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যই হবে, যদি চিন্তার ক্ষেত্রে এবং তারও গোড়ার কথা—শিক্ষার ক্ষেত্রে, ফাঁকি না থাকে। মোহিতলালকে স্মরণ করতে গেলে বার বার তাঁর গদ্যরীতির কথা মনে পড়ে।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১৮৮৮—১৯৬৩

কালের স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলেছি। এই ভেসে চলার পথে কত মানুষের দেখা মিলল, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একে একে সরাইখানার অতিথির মতো সাময়িকভাবে একটুখানি মিলনের পরেই তাঁদের মাপা সময় ফুরিয়ে যায়—কাউকে ধরে রাখা যায় না।

একখানি জাহাজের উপরের ডেকে বসে মন হঠাৎ এই জাতীয় স্মৃতি-চিন্তায় মেতে উঠেছিল।

জাহাজখানা নানা জাতীয় শিল্প নিদর্শনে বোঝাই। কত কিউরিও—অদ্ভুত সব মূর্তি, পেন্টিং, চাইনীজ স্ক্রোল, যেখানে যা মিলেছে কিউরিও সংগ্রাহক তা সংগ্রহ করে এনে জাহাজ বোঝাই করেছেন।

কোন্ দূর কালে যাত্রা করেছি জাহাজে, তা আর মনেই পড়ে না। সন্ধ্যা নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। জলের উপর আকাশ থেকে প্রতি-ফলিত একটুখানি আলো তখনও চিকচিক করছে।

দূর দিগন্তে জলের ওপারের জনপদে, জলের উপরের নানা জাহাজে, নৌকায়, আলো জ্বলে উঠছে একে একে। জাহাজ বিপরীত মুখে চলছে, তাদের কড়া আলোর প্রতিফলন কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে ঢেউ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে।

চলেছি কোথায়? চারিদিকে সুপ্ত পৃথিবীর স্তব্ধতা।

এ রাত্রির পারে আবার কি দিনের আলোয় জেগে উঠবে সমস্ত প্রাণী? এ চলার কি কোনো দিন শেষ হবে?

কেমন একটা মূক আনন্দ, মূক অনুভূতি এবং একটা অস্পষ্ট চিন্তার হঠাৎ মাথা তোলা এবং হঠাৎ ডুবে যাওয়া। একটা অবর্ণনীয় শিহরণ। মন লঘু পাখা বিস্তার করে ঐ আকাশের অন্ধকারে উড়ে গেল, মিলিয়ে গেল। একটা নির্বিকল্প সমাধিতে বাইরের জ্ঞান লুপ্ত :

ভেসে চলার মধ্যে এই মোহ আছে। শক্ত মাটিতে এর অস্তিত্ব থাকে না। এমনি অবস্থায় কি যে মনে জাগে তা বলা যায় না, তবে এর আরম্ভের দিকে যে একটুখানি দার্শনিক তত্ত্ব জেগেছিল, মুহূর্ত পরে তা আর ছিল না।

হঠাৎ সমাধি ভেঙে গেল।

আমার পাশে হেমেন্দ্রকুমার রায় আমার সঙ্গী বন্ধুর সঙ্গে আলাপে রত। আমি তাঁদের পাশে রেলিঙে ভর রেখে তাঁর বাড়ির তেতলায় বসে নিচের প্রশস্ত গঙ্গা দেখছি। বাড়িখানার এই জায়গাটায় বসলে জাহাজে বসার ভ্রান্তি ঘটায়। বিপরীতগামী স্টীমার নৌকা প্রভৃতির গতিতে মনে হয় বাড়ির জাহাজখানাও চলছে। অপরূপ সুন্দর জায়গাটি। সমুদ্রের ভ্রান্তি।

শহরের কর্মব্যস্ত জনসমুদ্রে বাস করে এমন অভিজ্ঞতা সহজে হয় না বলেই এই ভ্রান্তি। কিন্তু সেদিন হেমেন্দ্রকুমারের এই সৌভাগ্য স্মরণ করে তাঁর প্রতি ঈর্ষা হচ্ছিল।

কিন্তু সেও বেশিক্ষণের জন্য নয়। কারণ তখনই মনে হল, তাঁর নিজের কাছে বোধ হয় এ স্থানটির অভিনবত্ব আর নেই। এ কথা স্মরণ হতে তাঁর প্রতি যে ঈর্ষা হচ্ছিল তা দূর হল কিন্তু বাড়িখানার প্রতি বাড়ল।

হেমেন্দ্রকুমারের যে এই তেতলার আনন্দ অনেক দিন হল দূর হয়েছে তার প্রমাণও তো আমরা অনেক দিন ধরেই পাচ্ছিলাম। কারণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁকে প্রথমেই পাওয়া যেত তাঁর বাড়ি থেকে যে সরু গলি বেরিয়ে চিৎপুর রোডে পড়েছে, (তাঁর নিজের ঠিকানা ২৩০।১, আপার চিৎপুর রোড) সেই আসল চিৎপুর রোডে অন্য লোকের বাড়ির রকে বসা অবস্থায়। তিনি এখানে একা বসে গঙ্গার স্রোতের বদলে ধূলো ওড়ানো লরি, ট্রাক, মোটর, সাইকেল, বাস, ট্রাম, গোরুর গাড়ি প্রভৃতির স্রোত দেখতেন। অথবা তাঁকে পাওয়া যেত বিপরীত দিকের একটি চায়ের দোকানে। মাঝে মাঝে এসব স্থানে না পেলে তাঁর বাড়ির দরজায় গিয়ে চেঁচাতে হয়েছে।

হেমেন্দ্রকুমার চিৎপুর রোডের রকে বসে যে আনন্দ পেতেন, সম্ভবত আমরা তাঁর তেতলার বারান্দায় বসে তার চেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম না। আনন্দ ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য—বস্তুনির্ভর ততটা নয়, যতটা মনোনির্ভর।

হেমেন্দ্রকুমার কিছুদিন একা থাকতেন এ প্রকাণ্ড রহস্যময় ত্রিতল বাড়িতে। অদ্ভুত জীবন। ঘর প্রায় সমস্তই নানা জাতীয় শিল্প সংগ্রহে বোঝাই। সিঁড়িতে সিঁড়িতে নানা মূর্তি। ঘরে নানা শিল্পীর পেনটিং, নিজের আঁকা ছবিও আছে। এই পরিবেশে ছিল তাঁর প্রকৃত আনন্দ, তাঁর পরিচয়ও ছিল তারই মধ্যে। কি গভীর প্রেম ছিল এদের

প্রতি তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত। শিল্পের সকল বিভাগে ছিল তাঁর সহজ প্রবেশ। তিনি আর্ট স্কুলে চিত্রাঙ্কন শিখেছিলেন। রাধিকামোহন গোস্বামীর অন্যতম প্রধান শিষ্য মহীন মুখোপাধ্যায়ের কাছে কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। নিজে গান লিখেছেন হাজারের বেশি, তার অনেকগুলির সুর তাঁর নিজেরই দেওয়া। চিত্রশিল্প বিষয়েও পড়াশোনা তাঁর যথেষ্ট। অনেক রচনাই লিখেছেন এ বিষয়ে। উপরন্তু তাঁর "যাঁদের দেখেছি" এবং "এখন যাঁদের দেখছি" এই দুখানা বইতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে দু-তিনটি রচনা পড়লে চিত্রশিল্প বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে অবাক হতে হয়। আমি নিজেও তাঁর চিত্রশিল্পে "দাদাইজম" বিষয়ে একটি রচনা ছেপেছি।

নিজে যত্ন করে নাচ শিখেছিলেন, এবং নৃত্যপরিকল্পনা ও নৃত্যশিক্ষা দুইয়েতেই তিনি ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ির সীতার প্রযোজনা এক যুগপ্রবর্তনকারী অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় হেমেন্দ্রকুমারের রচিত গান ও রচিত নৃত্যছন্দ ও নৃত্যপরিকল্পনা অনেকখানি সাহায্য করেছিল। অভিনয় এবং গান ও নাচ 'সীতা'য় এমন অঙ্গাঙ্গি মিলে গিয়েছিল যে, তা নাটক থেকে কখনো পৃথক মনে হয় নি। এ কাজে তাঁর এমনই আকর্ষণ ছিল যে, থিয়েটারে তিনি এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক নেন নি, অথবা এ কাজ তিনি বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন নি। নাচগানে তাঁর এই আকর্ষণ দুর্বার বলা চলে। নাচঘর নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশ করেছিলেন ১৯২৪ সনে—সীতা নাটকের খ্যাতি যখন তুঙ্গ অবস্থায়, তখন। অন্যান্য কাগজের সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন, এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

এর সঙ্গে কবিতা লেখা, গল্পউপন্যাস লেখা, যোগ করলে হেমেন্দ্রকুমারের বহুমুখী প্রতিভা বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

চতুর বুদ্ধিও ছিল। ১৯৪১ সনে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশনের ডাইরেক্টর ভিক্টর পরাণজ্যোতির ব্যবস্থাপনায় পনেরো জন লেখকের বারোয়ারি উপন্যাসের পর পর অধ্যায়গুলি ব্রডকাস্ট করার ব্যবস্থা করা হয়। এর উদ্যোক্তা ছিল আমার অনুজোপম বন্ধু শ্রীমনোমোহন ঘোষ—তৎকালীন প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টান্ট। এই উপন্যাস পরিকল্পনাও তারই। সে ছিল গুণী এবং উৎসাহী যুবক।

উপন্যাসের নাম হয় পঞ্চদশী—পঞ্চদশ লেখকের রচনা, তাই। লেখকদের

নাম পর পর ছিল এই রকম—হেমেন্দ্রকুমার রায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, পরিমল গোস্বামী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

এই উপন্যাসের প্রস্তাব শুনেই হেমেন্দ্রকুমার বলে বসলেন তিনি প্রথম অধ্যায় লিখবেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "তা যদি না হয়, তা হলে আর আমি এর মধ্যে নেই।'

তাই ঠিক হল।

হেমেন্দ্রকুমার এই প্রস্তাব করে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। কারণ, বারোয়ারি উপন্যাসে যিনি প্রথম অধ্যায় লেখেন, তাঁর দায়িত্ব সবচেয়ে কম, এবং যিনি সব শেষের অধ্যায় লেখেন তাঁর দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। এই সবচেয়ে বেশি দায়িত্বটির ভার পড়ল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপর। প্রথমে পর পর তিন বেত্তা (হেমেন্দ্রকুমার, সরোজকুমার ও কেশবচন্দ্র, তিনজনেই বেত্তা) পঞ্চদশীকে আলোর মুখ দেখালেন, এবং সবশেষে গল্পটিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন এক প্রবীণ বৈদ্য—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। মাঝখানে আর বৈদ্য ডাকতে হয় নি।

প্রথম অধ্যায় লেখার দায়িত্ব যেমন সবচেয়ে কম, সম্মান তেমনি সবচেয়ে বেশি। হেমেন্দ্রকুমার এই সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন হাসতে হাসতে। আসলে বড্ড অমায়িক এবং ভাল মানুষ ছিলেন। সহজ সরল ভঙ্গির জ্ঞানগর্ভ রচনা লিখে সে যুগে যাঁরা খ্যাত হয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার তাঁদের অন্যতম। ছোটদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি এখনও খুব বেশি। অনেক বই তিনি লিখেছেন তাদের জন্য। রচনার সরলতা তাঁর প্রধান আকর্ষণ। এই সরলতা এবং মাধুর্য তাঁর চরিত্রেরই প্রতিফলন। একটি শিশুমন তিনি বয়ে বেড়াতেন বয়স্ক মগজের মধ্যে। সে পরিচয় বেশি পাওয়া যাবে তিনি আমাকে যেসব চিঠি লিখেছেন তার মধ্যে। সে চিঠির কথা পরে বলছি।

হেমেন্দ্রকুমার সম্পর্কে আমার একটি দূরকালের স্মৃতি—আমি যখন ১০নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের দোতলায় বাস করি (মেট্রোপলিটান ইনসটিটুশনের মেস্) সে সময় আমার আবাল্য পরিচিত বরেন্দ্র লাইব্রেরির মালিক বরেন্দ্র ঘোষ নতুন বই বেরুলেই মাসে তিন-চারখানা করে পাঠিয়ে দিতেন। আমি সব

পড়ে পছন্দমতো দু-একখানা কিনতাম, কখনো বা সবই ফেরৎ দিতাম। বেশ মনে আছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের জলের আল্পনা ও কালবৈশাখী নামক দুখানা উপন্যাসই আমি কিনেছিলাম। তাঁর সরল বর্ণনার ভঙ্গি এবং গল্প জমাবার ক্ষমতা আমার সেই প্রথম উপন্যাস পড়া বয়সে খুব ভাল লেগেছিল। এই দুখানা বইয়ের কাহিনী এখন আর আমার কিছু মনে পড়ে না।

রেডিওর ১নং গারসটিন প্লেসের বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই, কারণ সে সময় (১৯৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১) আমাদের প্রায় সকল কথিকা প্রচারকের বৈকালিক বাসর বসত সেখানে।

১৯৪৫ সালে যখন আমি যুগান্তর ম্যাগাজিন সেকশনের সম্পাদনার ভার পাই, তখন গুণীদের ডেকেছিলাম আমাকে সাহায্য করতে। প্রমথ চৌধুরীর কথা তাঁর সম্পর্কিত রচনায় বলেছি। অতঃপর হেমেন্দ্রকুমার রায়কে ধারাবাহিক লেখার জন্য একটি পরিকল্পনা করে দিয়েছিলাম। অনেকদিন ধরেই বলছিলাম, যাঁদের দেখেছেন তাঁদের স্মৃতিকথা লিখতে আরম্ভ করুন। প্রথমে হয় তো ঠিক বুঝতে পারেন নি কেমন হবে, কিন্তু লেখা আরম্ভ করতেই পর পর অনেক লিখতে লাগলেন।

এই প্রসঙ্গে বলি, আমি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, ডক্টর তারকমোহন দাস, অজিতকৃষ্ণ বসুকে এই ভাবেই ধারাবাহিক লেখার পরিকল্পনা ও উৎসাহ দিয়েছিলাম। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের 'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত' নলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' ও 'হাসির অন্তরালে', তারকমোহন দাসের 'আমার ঘরের আশেপাশে' ও অজিতকৃষ্ণ বসুর 'যাদুকাহিনী'। এই শেষের দুটি পর্যায়ের লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়েছে। নলিনীকান্তের 'দাদাঠাকুর' সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যাঁদের দেখেছি' (নিউ এজ ১৯৫১) অতি উচ্চাঙ্গের বই হয়েছে, এবং তাতে উৎসাহিত হয়ে তিনি 'এখন যাঁদের দেখছি' পর্যায়ে তৎকালীন জীবিতদের নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন, এবং প্রথমখানি যুগান্তরের লেখার, এবং দ্বিতীয়খানি দৈনিক বসুমতীর লেখার সঙ্কলনরূপে প্রকাশিত হয়। নলিনীকান্ত তাঁর প্রথম দুখানির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' নামক চরিত্র স্মৃতির বই লেখেন। এই পর্যায়ের লেখাগুলি দেশ সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

হেমেন্দ্রকুমার যাঁদের দেখেছি পর্যায়ে যাঁদের নিয়ে পর পর লিখলেন

তাঁদের নামের তালিকা এই—মনোমোহন বসু, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, করমতুল্লা খাঁ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রমথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাসুন্দরী, দীনেশচন্দ্র সেন, শিবদাস ভাদুড়ী, জলধর সেন, জমীরুদ্দীন খাঁ, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এঁদের মধ্যে নয়জনকে আমি দেখেছি (শুধু দেখা) এবং দু-এক জনের সঙ্গে সামান্য আলাপও করেছি, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতর আলাপের সুযোগ পেয়েছি একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। হেমেন্দ্রকুমারের এই লেখাগুলি আশ্চর্য রকমের সরল এবং সুন্দর। অল্প কথায় এক একটি ব্যক্তির চরিত্র বেশ ফুটে উঠেছে। সমসাময়িক কাল এ জাতীয় বইয়ের হয় তো যথার্থ মূল্য দেয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতের লেখকদের অবশ্যই এ বই একবার খুলতে হবে। শুধু একটি ত্রুটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারিখের অভাব। ইতিহাস নয় ভেবেই হয় তো তারিখ উল্লেখের দরকার মনে করেন নি।

এই বইখানা তিনি আমার নামে উৎসর্গ করে আমাকে গৌরব দান করেছেন।

পরবর্তী বই "এখন যাঁদের দেখছি" (ইণ্ডিয়ান খ্যাঃ ১৯৫৫) -এখানাও খুব ভাল বই। এবং "এখন" আর অনেকের ক্ষেত্রেই "এখন" নেই। এ বই ছাপা হবার সময়েই কয়েকজন মারা গিয়েছিলেন, এবং এখন (১৯৬৬) লেখকসহ অন্তত চৌদ্দজন মৃত। বাকিরা অর্ধমৃত।

হেমেন্দ্রকুমারকে যতবার দেখেছি, সব সময়ই হাসিমুখ। মনটা খুব উদার ছিল। আমি কখনো তাঁর মুখে কারো নিন্দা শুনি নি।

একবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের বাড়িতে প্রায় আসতেন। একদিন হেমেন্দ্রকুমারের "এখন যাঁদের দেখছি"তে কোনো একজনের সম্পর্কে যে প্রশংসা করা হয়েছিল, সে প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়, এমন এক অভিযোগ নিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন আমার কাছে এসে হাজির। আমি বললাম, তাঁকে আমি চিনি না, অতএব প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য কি না তা আমার পক্ষে বোঝা কঠিন। আপনি এসব কথা হেমেন্দ্রকুমারকেই বলুন, কারণ তিনি

যা লিখেছেন তার জন্য তিনিই দায়ী।

হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বলেছিলাম সে কথা। সৌরীনদা অভিযোগ করেছেন আপনি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বাড়িয়ে বলেছেন। হেমেন্দ্রকুমার সে কথা শুনে একটু হাসলেন। এর পর সৌরীন্দ্রমোহন হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা করেন। তার ফলে যা দাঁড়াল তা স্মরণীয়।

হেমেন্দ্রকুমারের 'এখন যাঁদের দেখছি' পর্যায়ে এর পর সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বেরোল। আগাগোড়াই তাঁর প্রশংসা। এর পর সৌরীন্দ্রমোহন নিজে এসে আমাকে বলে গেলেন, হেমেন্দ্রকুমারের উপর তাঁর আর রাগ নেই। তিনি ভুল বুঝেছিলেন। 'ওর স্বভাবটাই ঐ রকম, কারো দোষ দেখতে পায় না।'

হেমেন্দ্রকুমার সৌরীন্দ্রমোহন সম্পর্কে যে রচনাটি লিখেছিলেন তাতে এ প্রসঙ্গের আভাস আছে। সেইটুকু উদ্ধৃত করি "সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়" নামক রচনা থেকে। হেমেন্দ্রকুমার লিখছেন—

> "সৌরীন আজ প্রাচীন। বয়সে আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়। কিন্তু এখনও বালকোচিত স্বভাব ছাড়তে পারেন নি। থেকে থেকে কেন যে তিনি অভিমান করবেন, তার হদিস পাওয়া কঠিন। হঠাৎ রাগেন আবার হঠাৎ ঠাণ্ডা হন। বৈশাখের চড়া রোদ, আবার আষাঢ়ের মেদুর ছায়া। শেষ যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেদিন তিনি বৈশাখী তপ্ততার দ্বারা আক্রান্ত। আমি বলেছিলুম, 'ভাই, আমরা দুজনেই আজ জীবনের প্রান্তদেশে এসে পড়েছি। যা অকিঞ্চিৎকর, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার বয়স কি আর আছে?" (এখন যাঁদের দেখছি, ১৯৫৫)।

হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যাঁদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁদের সঙ্গে আমিও ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছি। শিশিরকুমার ভাদুড়ি, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে এখন বেঁচে আছেন শুধু প্রভাতচন্দ্র।

প্রভাতচন্দ্র সামাজিক ইতিহাসের গবেষণামূলক কাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার এখন প্রায় নিয়মিত দেখা হয়। রবিবারে প্রাতর্ভ্রমণ অথবা সান্ধ্যভ্রমণে বেরুলে আমার কাছে আসেন। হাঁটার ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি শক্তি রাখেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ও প্রভাতচন্দ্রের সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমারের তরুণ বয়সের সাহিত্যবিষয়ক তর্কের কথা



হেমেন্দ্রকুমার রায়

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৫২

প্রেমাঙ্কুর প্রসঙ্গে বলেছি। প্রভাতচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হই। পুরানো দিনের কথা অবলীলাক্রমে বলে যেতে পারেন।

হেমেন্দ্রকুমারের সম্পর্কে আর একটি ঘটনা বলবার আগে আমার নিজের লেখা একটি ছোট গল্প যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে বলে নিই। কারণ এই গল্পের সঙ্গে আমার বক্তব্যের কিছু সম্পর্ক আছে।

এক রায়বাহাদুর অবসরপ্রাপ্ত জীবন কাটানোর জন্য ভাবলেন বাংলা বই পড়লে কেমন হয়। তিনি দোকানে গিয়ে জানতে পারলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় যে বই তখনকার পাঠকেরা পড়ছে তার নাম কলকাতার পাতাল। কিন্তু বাড়িতে এসে সে বই পড়তে গিয়ে দেখেন কলকাতার নানাজাতীয় অপরাধীদের নিয়ে লেখা বইখানা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট। অবশ্য তাঁর এ বিষয়ে জ্ঞান অতি সামান্যই ছিল। কিন্তু তিনি বই পড়ে প্রায় ক্ষেপে গেলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন কলকাতার মাটির নিচেকার জলের পাইপ ইত্যাদি নিয়ে লেখা মজার বই হবে। কিন্তু ভুল যখন ভাঙল, তখন তিনি উত্তেজিত।

এমন বই বাংলার ছেলেমেয়েরা পড়ে?

বইখানা তিনি একটু একটু করে পড়েন, এবং পড়বার পর খুব সাবধানে চাবি বন্ধ করে রাখেন, পাছে এ বই স্ত্রী কিংবা পুত্র যতীশের হাতে পড়ে।

বই পড়া শেষ হল, আবার পড়লেন, আবার। এবং সেই সঙ্গে আপত্তিকর অংশগুলো দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে রাখলেন। কারণ এই বই পুলিস অফিসে পাঠাতে হবে। মাঝে মাঝে পড়ায় ডুবে যাচ্ছেন, আবার চমকে উঠে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছেন কেউ দেখে ফেলল কি না। দরজা বন্ধ করে তিনি এ বই পড়েন। এক সময় স্ত্রী বাইরে থেকে বললেন দরজা বন্ধ করে সারাদিন কি করছ তুমি?......ভাবলেন স্ত্রীকে সব খুলে বলাই ভাল। সব বললেন তাঁকে, এবং এ বই যে তিনি পুলিসে পাঠাবেন সে ইচ্ছার কথাও প্রকাশ করলেন। স্ত্রী পুলিসের নামে চমকে উঠলেন। বললেন ওগো, আবার পুলিস-টুলিস কেন? ও বই খারাপ আছে তো আছে, তাতে তোমার কি?

রায়বাহাদুর ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর মাথায় তখন ঊনবিংশ শতকের নীতির আগুন জ্বলছে। বললেন, তাঁকে এ কাজ করতেই হবে। স্ত্রী বললেন, ও বইতে এমন কি আছে—

রায়বাহাদুর ক্ষিপ্ত হলেন। পড়েছ তা হলে এ বই?

পড়েছি তো পড়েছি, কিন্তু তাতে এমন কিছু সর্বনাশ হয় নি। কিন্তু

রায়বাহাদুর নাছোড়। তিনি যাবেনই লালবাজার। স্ত্রী পথ আগলে দাঁড়ালেন। রায়বাহাদুর বললেন একটি সৎকাজ করতে যাচ্ছি, তুমি তাতে বাধা দেবে স্বপ্নেও ভাবি নি। অসৎ সাহিত্য পড়ে তোমার এই সর্বনাশ হয়েছে। স্ত্রী বললেন, কিছুই হয় নি, তুমি সাহিত্যের কি বোঝ?

তারপর যখন তিনি রায়বাহাদুরকে বললেন, ও বই তাঁদেরই পুত্রের লেখা, এবং যতীশই "নিশাচর." এবং সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়ায় প্রথম পাওয়া দশ হাজার টাকা সে এনে দিয়েছে তার মায়ের হাতে। তখন তার কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল রায়বাহাদুরের দেহেমনে, তাই নিয়েই গল্প।

এই গল্পের কথা এতটা বলবার উদ্দেশ্য এই যে হেমেন্দ্রকুমারের কাছ থেকেই এর প্লটটি পেয়েছিলাম। তিনি প্লট বলেন নি, কিন্তু এটি প্রায় তাঁর নিজেরই ঘটনা। অর্থাৎ এর মূল অংশ। হেমেন্দ্রকুমার 'রাতের কলকাতা' নামক একখানি বই লিখেছিলেন মেঘনাদ গুপ্ত ছদ্মনামে। এই বই আমি বইয়ের দোকানে অনেক বিক্রি হতে দেখেছি। বইখানা আমার পড়বার সুযোগ ঘটে নি কখনো। কিন্তু তখন শুনেছিলাম ঐ বইতে কলকাতা শহরের নৈশ জীবনের বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছে। তখন হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে নি। সে আমার ছাত্রজীবনের সময়ের কথা। তা ছাড়া ঐ ছদ্মনাম কার তাও জানতাম না। কথাটা হেমেন্দ্রকুমারের মুখেই প্রথম শুনি। তিনি বলেছিলেন, এ বই তাঁর লেখা, কিন্তু তাঁর অভিভাবকেরা কেউ সে কথা জানতেন না। এ কাহিনী শোনামাত্র ঐ ছোট গল্পের প্লটটি মনের মধ্যে চকিতে এসে গিয়েছিল।

প্রেমাঙ্কুরের মতো ভবঘুরে জীবন না হলেও হেমেন্দ্রকুমার রাতের কলকাতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাতের কলকাতার লেখকরূপে মেঘনাদ গুপ্ত নাম নিলেও তাঁর হেমেন্দ্রকুমার নামটিও যে ছদ্মনাম এ কথা হয়তো অনেকের জানা নেই। তাঁর আসল নাম প্রসাদ রায়।

হেমেন্দ্রকুমারের জনৈক আত্মীয় রবীন্দ্রবিরোধী বই লেখেন একখানা। বইয়ের নাম রবিয়ানা। লেখক অমরেন্দ্র রায়। এ থেকে বোঝা যায় তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ রবীন্দ্রবিরোধী ছিল। সেজন্য হেমেন্দ্রকুমারও ঘোর রবীন্দ্রবিরোধী ছিলেন প্রথম জীবনে। নাম সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর তখন গুরুদেব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তারপর প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও প্রভাতচন্দ্রের সঙ্গে দিনের পর দিন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তর্ক করার ফলে শেষকালে হেমেন্দ্রকুমারের মন থেকে রবীন্দ্রবিরোধ সম্পূর্ণ দূর

হয়ে যায় এবং এমন হয় যে তার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কাউকে গুরু বলে মানেন নি। হেমেন্দ্রকুমার একস্থানে লিখছেন—

"শরৎচন্দ্রের একটি মজার শখ ছিল। তিনি যেসব লেখককে নিজের শিষ্যস্থানীয় বলে মনে করতেন, তাঁদের প্রত্যেককে উপহার দিতেন একটি করে ভাল ফাউন্টেন পেন।......যমুনা কার্যালয়ে একদিন আমাকে বললেন, 'হেমেন্দ্র, তুমি যদি আমাকে গুরু বলে মানো, তা হলে তোমাকেও একটা ফাউন্টেন পেন দেব।'......বললুম, 'আপনি আমার শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু আমার গুরু রবীন্দ্রনাথ। আর কারুকে তো গুরু বলে মানতে পারব না।" ('এখন যাঁদের দেখছি,' ১৫১ পৃঃ)

বহুদিন তর্কের ফলে হেমেন্দ্রকুমারের এই পরিবর্তন ঘটেছিল। এ সবই অবশ্য তরুণ বয়সের ব্যাপার।

গত যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব দেশে দারুণ আলোড়ন তুলেছিল। বড় প্রতিভার আবির্ভাবকে সমকালের সকলে ঠিকমতো স্বাগত জানাতে পারে না, তার কারণ এমন আবির্ভাব সব সময়েই প্রায় যথাসময়ের অনেক আগে ঘটে। সবাই প্রস্তুত থাকে না এর জন্য। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও তাই ঘটেছিল। তবে রবীন্দ্রসমর্থক দল ও রবীন্দ্রবিরোধী দল নামক দলের কল্পনা করতে এ যুগে অবশ্যই হাস্যকর মনে হবে। তখনকার ঐ দুই দলের কোনো দলই অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে এগিয়েও দেন নি, টেনেও ধরে রাখেন নি—রবীন্দ্রনাথ নিজের পথে নিজের শক্তিতেই এগিয়ে গেছেন—সকল বড় প্রতিভারই ঐ একই ইতিহাস। প্রথম যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন, এবং তাঁর অভিযোগ ছিল রবিবাবু অশ্লীল কবিতা লিখে দেশের অনিষ্ট করছেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ির মৃত্যু হয় ৩০শে জুন ১৯৫৯। তিনি হেমেন্দ্র-কুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, সীতানাটকের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে হেমেন্দ্রকুমারের কতখানি দান ছিল সে কথা আগে বলেছি। তাই শিশিরকুমারের মৃত্যুর খবর শুনে সেই দিনই হেমেন্দ্রকুমার আমাকে লিখলেন,

সুহৃত্তম, সূর্যোপাসনা সমাপ্ত: জীবন মহীরুহ থেকে আর একটি ভাস্বর শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ল ধরার মৃত্তিকায়। নিয়তির এই অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বৃথা। ব্যাধি আমাকে শয্যাগৃহেই আবদ্ধ করে রেখেছে।

তৈরি করে রেখেছি ভাই মনটা
সাড়া দেব বাজলে পরেই ঘণ্টা।

হেমেন্দ্রকুমারেরও শেষের দিন এলো ১৯৬৩ সনের ১৮ই এপ্রিল। আমি খবর পাওয়ামাত্র সন্ধ্যায় গেলাম তাঁর ২৩০।১ নম্বরের বাড়িতে। দেহটি মেঝের উপর শায়িত, আত্মীয় স্বজনেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পৃথিবী তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। জীবন-মৃত্যুর মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে নানা মানুষ নানা ভাবে চিন্তা করে গেছেন, অতএব এ নিয়ে আমি আর কোনো দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করব না।

তবে সেখানে যাবার আগে হেমেন্দ্রকুমারের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রেমাঙ্কুর অতর্থীকে টেলিফোন করে সংবাদটা জানিয়ে দিলাম। তিনি শোনামাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করলেন, "হেমেন চলে গেল?"

তার পর একদিন প্রেমাঙ্কুরেরও চলে যাবার দিন এলো। তারিখ ১৩ই অক্টোবর ১৯৬৪। টেলিফোনে মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরোয় নি।

মৃত্যু যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, এবং সৃষ্টির অগ্রগতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং অনিবার্য ঘটনা, এ কথাটা সব সময়ে মনে রাখলে দুঃখ খুব বেশি হবে না। অবশ্য অকাল মৃত্যু শোচনীয়। কিন্তু পরিণত বয়সে যাঁরা মারা যান, তাঁদের মৃত্যুর পর "মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হল" এ কথা অর্থহীন। কোনো ক্ষতিই অপূরণীয় নয়। এবং যদি অপূরণীয় ক্ষতিই হয়, তবে সেই ক্ষতি প্রকৃতির অভিপ্রেত। আর যে ক্ষতি পূরণীয় তাও তো দেখা গেল কয়েক হাজার বছর ধরে। মানুষের এতে কি উপকার হয়েছে কেউ বলতে পারে না।

হেমেন্দ্রকুমার শিশিরকুমার ভাদুড়িকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, এবং সে কথা তিনি কতভাবে যে লিখেছেন এবং আমাকে বলেছেন। আমরা দুজনে বসে শিশিরকুমারের অসামান্য নাট্য-প্রতিভা বিষয়ে কত আলোচনা করেছি। সে সবই তিনি অবশ্য লিখে প্রকাশ করেছেন, নইলে তার প্রমাণ থাকত না। "বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার" নামক তাঁর লেখা একখানা সুন্দর বই (ওরিয়েণ্ট বুক কোঃ) ১৯৫৫ সনে আমাকে দিয়েছিলেন। সে বই পড়ে থিয়েটার সম্পর্কে বহু তথ্য আমি জানতে পারি এবং এর পাতায় পাতায় শিশিরকুমারের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে

তা যেমন যুক্তিসঙ্গত তেমনি সুখপাঠ্য। শিশিরকুমার নাট্য-শিক্ষকরূপে যে কত ধৈর্যশীল এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন এবং অভিনয়ক্ষেত্রে নবাগতদের নিজহাতে কিভাবে গড়ে নিয়েছিলেন তা এতে বিস্তারিতভাবে জানা যাবে। আমি নিজেও কিছু কিছু দেখেছি শিশিরকুমারের শিক্ষণকৌশল, এবং সে কথা 'শিশিরকুমার ভাদুড়ি' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।

হেমেন্দ্রকুমারের লেখা চিঠির কথা আগে বলেছি, সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমাকে তিনি যে কখানা চিঠি দিয়েছিলেন, তার লিখনভঙ্গির মধ্যে যে মধুর উদার স্বভাবটি প্রকাশিত হয়েছে তা সবারই ভাল লাগবে। সাধারণ বক্তব্য, কিন্তু তা তাঁর মনের রঙে রঞ্জিত। চিঠি পদ্যে লেখা!

প্রকাশিত লেখার জন্য দক্ষিণা কবে পাওয়া যাবে এই ছিল প্রশ্ন। লেখা ছেপেছিলম যুগান্তর ম্যাগাজিন সেকশনে। তারই জন্য কাব্য—

প্রিয়ংবদ পরিমল গোস্বামী
করকমলেষু,

বলিতে পার কি বন্ধু, করিয়া বিনতি—
মাস গেলে আশা কবে হবে ফলবতী?
গুহ্য কথা জান সখা নহি ধনপতি
টাকার দুর্ভিক্ষে সদা দুর্দম্য দুর্গতি।
মাঝে মাঝে হয় ভাই হেন মতি গতি
এক ছুটে বনে ঢুকে হয়ে পড়ি যতী।
কিন্তু সে শকতি কোথা? এবে বৃদ্ধ অতি!
(এবং দুর্ভক্ষ্য তৃণ পাব না ফুরতি!)
বিমনায়মান হয়ে চাহি তব প্রতি,
ঠারে ঠোরে বুঝে নাও নিঃস্বের কাকতি।
একটা জবাব দিলে হবে কিছু ক্ষতি?
আমি জানি হবেনাকো তুমি যে সুমতি।
ব্যাধির প্রমোদ গৃহ এ দেহ সম্প্রতি,
চতুর্দশ পদ লিখে এবার বিরতি।

হেমেন্দ্রকুমার
৩-৮-৫৯

আর একখানি চিঠির (৭-১২-৬০) আরম্ভ—

"মন এগিয়ে যাচ্ছে চির অন্ধকারের দিকে, এবং দেহ এগিয়ে যাচ্ছে

চিতাগ্নিশিখার দিকে—এই হচ্ছে আমার বর্তমান অবস্থার সঠিক বর্ণনা।"

চিঠি আরও অনেক আছে, সবই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখা।

এমন চিঠি লেখার যুগ বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। চিঠিলেখা যে একটি বিশিষ্ট আর্ট তা আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রথম জানতে পারি—তাঁর চিঠি থেকে—ছিন্নপত্র থেকে। সে ধারা যে অল্পসংখ্যক সাহিত্যিক একাল পর্যন্ত বহন করে এসেছেন তাঁদের অন্যতম হেমেন্দ্রকুমার রায়।

হেমেন্দ্রকুমারের এই যে শিল্পপ্রেম, এই যে দুঃখকে নিয়ে রসসৃষ্টি, এই যে বন্ধুদের প্রতি উদার মনোভাব, এ বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমার প্রিয়।

১৪-৭-৬৬

নলিনীকান্ত সরকার

(১৮৮৯)

স্বদেশী অগ্নিযুগের দ্বিতীয় পর্বের গুপ্ত কর্মী, বিজলী সম্পাদক, বেতার জগৎ সম্পাদক, শিশিরকুমার ভাদুড়ির নাটকের সহ-অভিনেতা, কবি, গল্পলেখক, কলমলেখক, গায়ক, সঙ্গীতশিক্ষক, শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জীবনীকার, ব্যঙ্গ নিপুণ, হাস্যরসিক নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে সম্ভবত ১৯৩২ থেকে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। তার বারো বছর আগে তাঁকে প্রথম দেখি কাজি নজরুল ইসলামের সঙ্গে ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের মেসে, সে কথা নজরুল প্রসঙ্গে বলেছি। আমাদের পরিচয়ের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না কিছু, এমন কি আমরা একত্র দেশ ভ্রমণও করেছি—লিলুয়া পর্যন্ত।

কিন্তু এ সব ঘটনাকেও ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ১৯৩৪ সনের একটি ঘটনা। নলিনীকান্ত সরকার সেই সময় আমার সঙ্গে একটি বড় রকমের প্রতারণা করেন।

দোলের দিন। তখন আমি মোহনবাগান রো-এর বাসিন্দা। কীর্তি মিত্র লেন বাসী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি দল সর্বাঙ্গে আবির মাখা অবস্থায় এসে আমাকে আক্রমণ করে বসল। তখন বাধ্য হয়ে আমাকেও ওঁদের দলে নাম লেখাতে হল। আমরা স্থির করলাম সবচেয়ে এখন যিনি কাছে বাস করছেন তাঁকে দলে টানি। মোহনলাল স্ট্রীটের মোড়ের বড় বাড়িটার দোতলার ফ্ল্যাটে নলিনীকান্ত থাকেন।

কড়া নেড়ে ডাকতেই সেই দারুণ গ্রীষ্মে মোটা এক কম্বলে আপাদ-মস্তক জড়িয়ে এক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চাকর দরজা খুলে দিয়ে জ্বরের ঘোরে গোঙাতে গোঙাতে বলল, আজ্ঞে বাবু তো বাড়িতে নেই। চাকরের তখন কথা বলতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। আমরা হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যাবেলা স্তম্ভিত হলাম শুনে যে, বাবু বাড়িতেই ছিলেন এবং বাবুর সংবাদবাহী ম্যালেরিয়ায় বেপমান চাকর-ব্যক্তিটিই বাবু স্বয়ং। নলিনীকান্তই কম্বল মোড়া অবস্থায় দিনের বেলা আমাদের চোখের সামনে বেরিয়ে এসে আমাদের ঠকিয়ে গেলেন, অথচ সে সময় পাল্টা কিছু করে প্রতিশোধ নেবার উপায় নেই ভেবে আরও দমে গেলাম।

এ ঘটনা আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি এবং নলিনীকান্তও তাঁর হাসির অন্তরালে নামক বইতে (ইণ্ডিয়ান অ্যাঃ) উল্লেখ করেছেন। এই রচনাটি যখন আমি যুগান্তরে ছাপি তখন আমার নাম বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। নলিনীকান্ত পরে সব নামই বাদ দিয়েছেন। কিন্তু এই জাতীয় 'প্র্যাকটিক্যাল জোক' যে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সংসর্গের ফলে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অসৎ সংসর্গে যা হয়। নলিনীকান্ত নিজে রসিক ব্যক্তি, কিন্তু হাতেকলমে রসিকতার অনেক টেকনীক তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে শিখেছেন। যে শরৎ পণ্ডিত রাত দুটোয় নলিনীকান্তের ঘুম ভাঙিয়ে বলতে পারেন, ওরে, নলিনী পণ্ডিতের সকল সম্পত্তির মালিক তুই আর আমি, কারণ তুই নলিনী. আর আমি পণ্ডিত, সেই শরৎচন্দ্রের অনুগত তিনি হয়েছিলেন দুজনেই ভাষার খেলার রসিকতায় এবং বালকোচিত ব্যবহারে সমধর্মী বলে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নলিনীকান্ত যা করেছিলেন তা পরে বলছি।

গুণী ব্যক্তি হয়েও নলিনীকান্ত যে বৈষয়িক উন্নতির দিকে নজর দিতে পারেন নি, তার হেতু তাঁর নিজের মধ্যেই আছে। অর্থাৎ তিনি মনের গভীরে একটি আদর্শবাদ বয়ে বেড়িয়েছেন সমস্ত জীবন। এবং আর এক বাধা তাঁর কৌতুকপ্রবণতা, এবং সে প্রবণতা পুরোদস্তুর ক্ল্যাসিক্যাল। অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ, এবং সুনির্দিষ্টভাবে বাছাইকরা, শব্দ প্রয়োগের সাহায্যে কৌতুক সৃষ্টি। প্যারডি-প্রিয়তা, ছন্দঃপ্রিয়তা, সঙ্গীতপ্রিয়তা, এই সবের সাহায্যে তিনি নিজের দিকে তাকাবার অবসর কম পেয়েছেন, এবং অপরের মনোরঞ্জনের দিকে নজর দিয়েছেন বেশি। এ তৃপ্তি কোনো শিল্পীর পক্ষে কম মূল্যবান নয়, যদি শিল্পের প্রতি যথার্থ প্রেম থাকে। পাঁচজনকে খুশি করার মধ্যেই সমস্ত আনন্দ নিঃশেষ। তাই তো এর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ সত্ত্বেও তিনি যথার্থ ব্যবসা করতে পারলেন না। সে জন্য নিজে দুঃখ ভোগ করেছেন, এবং আমার বিশ্বাস, এ দিকটাতেও তাঁর জীবনে অনেকখানি শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নলিনীকান্তের রচনাক্ষমতা শুধু ছন্দেই আবদ্ধ নেই। তাঁর তিনখানি বড় বইয়ের মধ্যে যেখানায় তিনি সবচেয়ে রচনাকৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন, সেখানার নাম, হাসির অন্তরালে। অন্য দুখানা—দাদাঠাকুর ও শ্রদ্ধাস্পদেষু।

হাসির অন্তরালে নামেই অনেকখানি পরিচয়। এতে তিনি নিজেরই জীবনের কঠিন দুঃখ বেদনার কথা হাসির আবরণে মুড়ে পরিবেশন করেছেন।



নলিনীকান্ত সরকার
(বেতার জগৎ সম্পাদক রূপে)

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৪০

সেই সব ট্র্যাজিডির চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তি মনকে ধাক্কা মেরে যায়, যদিও তখনও পাঠকের হাসি থামে না। এই রচনাগুলি দুদিক থেকে তাঁর রচনানৈপুণ্য প্রকাশ করছে। প্রথম—নিজের দুঃখকে তিনি হাসতে হাসতে বর্ণনা করতে পেরেছেন। আর দ্বিতীয়—এবং যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সে হচ্ছে তাঁর সংযত প্রকাশ। কোথায় থামতে হবে তার সুনির্দিষ্ট বোধ। সঙ্গীতশিল্পে যাঁর অধিকার আছে তাঁর কাছে সমে এসে থামা অপেক্ষিত, কিন্তু যেখানে আত্মকথা বলছেন, সেখানে এই মাত্রাজ্ঞান পরিণত কথাশিল্পী ছাড়া অন্য কারো থাকা সম্ভব নয়। এর কাহিনীগুলি প্রায় সবই ছোটগল্পের চেহারা পেয়েছে। এর সঙ্গে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এতে বর্ণিত পটভূমি যে-সব মানুষ রচনা করেছে, তারা সবাই অখ্যাত মানুষ। এর দু একটি কাহিনীর নমুনা পরে দেব, নইলে এর সম্বন্ধে ঠিক ধারণা হবে না। মোট কথা এগুলি আত্মকথা, বেদনার কথা, হাসির কথা, এবং এগুলি ছোট-গল্প। অর্থাৎ সত্য অথচ গল্প। নিবিড়ানন্দ নকলনবীশ ছদ্মনামে তাঁর অন্যত্র লেখা ছোটগল্পও আমি দেখেছি এবং আনন্দ পেয়েছি। ছোটগল্প (ব্যঙ্গপ্রধান) লেখার হাত পাকা।

পূর্ববর্তী শরৎচন্দ্র পণ্ডিত নামক রচনায় (৯০ পৃঃ দ্রঃ) আমি নলিনীকান্ত সরকারের বাংলা ক্রসওয়ার্ড রচনার বৈশিষ্ট্য একটুখানি বলেছি। এ বিষয়ে বাংলাদেশে তাঁর আর দ্বিতীয় নেই। নমুনা সামান্যই সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমি নিজে তাঁর কাছ থেকে কিছুকাল ধারাবাহিকভাবে ক্রসওয়ার্ড রচনা করিয়ে নিয়ে যুগান্তর 'সাময়িকী'তে ছেপেছিলাম। এগুলি পুরস্কারের জন্যও নয়, সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ছাপার জন্যও নয়। ইংরেজী যে সব কাগজে শুধু পাঠকের নিজের কাছে নিজের বুদ্ধি পরীক্ষা ও সময় কাটানোর জন্য ক্রসওয়ার্ড নিয়মিত ছাপা হয়, তারই অনুকরণে করা হয়েছিল এগুলি।

একবার অন্য একখানা কাগজে তিনি সাহিত্যিকদের নিয়ে ক্রসওয়ার্ড রচনা করেন। তার অনেকগুলিতে বুদ্ধির প্রখর চাতুর্যের পরিচয় আছে। যথা, সন্ধানসূত্র ছিল, 'রাজা রাধাকান্ত দেব।' এর সমাধান হল, নরেন্দ্র দেব। কেমন করে হল বলি। চাতুরিটি সহজ নয়। অথচ খামখেয়ালিও মোটেই নয়। ইঙ্গিত সবই যথাযথ দেওয়া আছে। যেমন—

১। রাজা অর্থে নরেন্দ্র।

২। রাধা এখানে রাধা (রাণী দেবী)।

৩। কান্ত অর্থে স্বামী।

৪। রাধাকান্ত অর্থে রাধার (রাধারাণী দেবীর) স্বামী।

৫। দেব পদবীটি ঠিকই থাকবে। অতএব "রাজা রাধাকান্ত দেব"-এর সমাধান, নরেন্দ্র দেব। মনে রাখাতে হবে, সবই সাহিত্যিকদের নিয়ে রচিত। বিভ্রান্ত হবার কারণ নেই।

অন্য একটি সন্ধানসূত্র ছিল—স্বামী বিবেকানন্দের শ্বশুর। এর উত্তর হচ্ছে—পবিত্র (গঙ্গোপাধ্যায়)। বিবাহিত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ।

আরও একটি—

প্রথমে রয়েছে দেখ আধশিশি মাল,
প্রথমে দ্বিতীয়ে তার শুভ চিরকাল।
বিপরীত শব্দরাশি প্রথমে তৃতীয়ে,
প্রথমে চতুর্থে রাঁধো ব্যঞ্জনেতে দিয়ে।
অর্ধেক দেবতা তার অপরার্ধ নর,
দুইটি পুরুষে জোড় লেগেছে সুন্দর।

সমাধান—শিবরাম (চক্রবর্তী।) ব্যাখ্যা—আধ শিশি অর্থাৎ শি। বিপরীত শব্দ-রাশি প্রথমে তৃতীয়ে। ব্যাখ্যা—প্রথম শি, তৃতীয় রা। এ দুটির বৈপরীত্য ঘটিয়ে হল রাশি (শি রা ওল্টালে রাশি)।

আরও এক কবির নাম এই সন্ধানসূত্রে—

আস্ত একটা মনিষ্যিকে ঢাকলো উইয়ের ঢিবি,
আজগুবি দুনিয়ার খেলা নলের মধ্যে বিবি।

এর সমাধান নজরুল। নলের মধ্যে জরু = নজরুল। দুনিয়ার খেলাই এমনি—উইয়ের ঢিবির মধ্যে আস্ত মানুষ বাল্মীকিকে পাওয়া যায়—নলের মধ্যে বিবি পাওয়া যায়। জরু = বিবি।

এতে নলিনীকান্তের শব্দচাতুর্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় অবশ্যই হবে। একটি সন্ধানসূত্র বেশ মজার ছিল। যথা—

	বা		ত

এই রকম ছকে শুধু ঐ দুটি অক্ষর দেওয়া ছিল এবং সন্ধানসূত্র ছিল, "স্ত্রীকে আঘাত করার ফলে এখানে পিতার মৃত্যু হয়েছে।" চারিটি ঘরে

দুটি অক্ষর দেওয়া আছে। এর সমাধান হচ্ছে বাবাহত। ব্যাখ্যা—বৌ+আহত সন্ধি করলে হয় বাবাহত। অর্থাৎ বৌকে আহত করায় বাবা হত হয়েছেন।

হাতেকলমে কৌতুকের আর একটি দৃষ্টান্ত—একদিন নলিনীকান্ত তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে পথে চলছিলেন। বন্ধু পানের দোকানের সামনে গিয়ে পান কিনছিলেন, একটি আনি মাত্র তাঁর সম্বল। দুষ্টবুদ্ধি জাগল নলিনীকান্তের মগজে। তিনি বন্ধুকে আনিটি বার করতে দেখেই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে পানওয়ালাকে শুনিয়ে শুধু উচ্চারণ করলেন—"সেই আনিটা, না ?"—বাস্ পানওয়ালার মনে সন্দেহ ঢুকল। সে নেড়েচেড়ে আনিটা ফেরৎ দিয়ে বলল, এটা আর আমাকে দেবেন না বাবু।

আর একটি কৌতুকের দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি। এ কাহিনী নলিনীকান্তের মুখে শুনেছি, এবং পরে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' নামক বইতেও পড়েছি। ঘটনাটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ঘটেছিল।

বিজলীর জন্য লেখা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নালিনীকান্ত যতবার শরৎচন্দ্রের প্রতিশ্রুত সময়ে কলকাতা থেকে বাজে-শিবপুরে যান, ততবারই শরৎচন্দ্র তাঁকে হতাশ করেন এবং নতুন করে কথা দেন এবারে নিশ্চয়। এইভাবে ছয়টি মাস ঘুরিয়ে শেষকালে একখানা চিঠি দিলেন লেখা দিতে পারলেন না বলে। চিঠিতে অক্ষমতা জানিয়ে অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখলেন, "ভরসা এই যে, তোমাদের কাগজও বন্ধ হবে না, আমিও হয় তো মারা যাব না। দেহটা একটু সুস্থ হলেই লিখতে শুরু কোরব।"…

এই চিঠিই শেষ পর্যন্ত ছাপা হল ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের পূজা সংখ্যা বিজলীতে।

এর পরের বছর পূজা সংখ্যার জন্য আবার অনুরোধ। কিন্তু এবারে অন্য উপায়। অর্থাৎ এবারে আর প্রতিশ্রুতি আদায় নয়। নলিনীকান্ত শরৎচন্দ্রকে ধাপ্পা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে এনে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করলেন এবং অস্পষ্ট নানা কথা বলে সোজা কলকাতা নিয়ে এলেন তাঁকে। এসে পটুয়াটোলা লেনের মেসে উঠলেন। সেইখানে নলিনীকান্ত বাস করতেন। তারপর নলিনীকান্তের ভাষাতেই বলি—

"ট্যাক্সিকে বিদায় করে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে উঠলাম দ্বিতলের উপরে আমার কক্ষটিতে। কিছুক্ষণ পরে চাকর নিয়ে এল চা ও আনুষঙ্গিক আহার্য দ্রব্যাদি। এক পেয়ালা চা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য টেবিলে সাজিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি দেশলাই রাখলাম টেবিলটির উপরে। তারপরে

একখানি রাইটিং প্যাড ও একটি ফাউন্টেন পেন সেখানে রেখে বললাম, দাদা, চা খেয়ে দয়া করে আমার লেখাটি লিখুন। লেখা না দিলে আপনার নিষ্কৃতি নেই। আমি দরজা বন্ধ করে আর একটি ঘরে রইলাম। লেখা শেষ হলে আমাকে ডাকবেন, দরজা খুলে দেব।”

এর পর সে ঘরে শিকল এঁটে দেওয়া হল। শরৎচন্দ্র সব দেখেশুনে অবাক। সমস্ত মেসে সাড়া পড়ে গেল শরৎচন্দ্র ঐ মেসে বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। ঘণ্টাতিনেক পরে শরৎচন্দ্র চিৎকার করে নলিনীকান্তকে ডাকলেন।

লেখা সত্যিই লিখেছেন তিনি। লেখার নাম—‘দিনকয়েকের ভ্রমণ কাহিনী।’

‘শ্রদ্ধাস্পদেষু’ বইতে সবই প্রায় খ্যাতনামাদের সঙ্গ স্মৃতি। এর মধ্যে শরৎ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও কয়েকটি খুবই উপভোগ্য চিত্র আছে। যেমন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে একটি ঘটনা এখানে বিবৃত করি।

বিজলী কাগজের সম্পাদক হবার জন্য বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লালগোলা-রাজের পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান নলিনীকান্ত সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। সম্মানজনক কাজ, সম্পাদক হওয়া। চলে এলেন তিনি কাজ ছেড়ে কলকাতায়। মানিকতলা বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ১৯২০ সনের গোড়াতে দেশে ফিরে এসে কাগজ চালানোর মতলব করে নলিনীকান্তকে ডেকেছিলেন। নলিনীকান্ত লিখছেন—

> “লালগোলার কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় এলাম। এখানে এসে মিলিত হলাম বারীনদার সঙ্গে। এসে দেখি উপেন্দ্রনাথও রয়েছেন, এঁদের সঙ্গে একগোষ্ঠীভুক্ত হয়ে।
>
> “উপেনদা বেশ গম্ভীর হয়ে আমাকে বললেন, ‘চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলে ?’
>
> “‘হাঁ।’
>
> “‘কাজটি ভাল করো নি, ভাই। কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে এলেই পারতে।’
>
> “আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, ‘কেন বলুন তো ?’
>
> “‘কারণ নিশ্চয়ই আছে। আচ্ছা, তোমাকে একটু পরীক্ষা করে দেখি। একটিমাত্র প্রশ্ন ক’রবো। এ প্রশ্নের জবাবে যদি আমাকে খুশি

করতে পারো তা হলে বুঝবো তুমি এখানে থাকার যোগ্য কি না।'

নলিনীকান্ত দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তারপর—

"উপেনদা প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের বংশে কেউ পাগল ছিল কি, বা আছে?'

"আমি বললাম, 'বংশে ঠিক নয়, আমার দাদামশায় পাগল ছিলেন।

"আমার উত্তর শোনামাত্র উপেনদার সে কী উল্লাস। উচ্চৈঃস্বরে হাঁ ছাড়লেন, 'ও বারীন খুঁজে খুঁজে খাসা লোক যোগাড় করেছ তো? নলিনী বলে, ওর দাদামশায় পাগল ছিলেন।'

"পরে আমাকে বললেন, 'বাস্, তোমার পারমানেন্ট পোস্ট·। একেবারে আমাদের এক-গোত্রের লোক তুমি। আমরা এখানে যারা আছি, তাদের প্রত্যেকের বংশে কেউ-না-কেউ পাগল ছিল। তাই আমাদের কাছে কেউ এলে ঐ কোয়ালিফিকেশনটাই আমরা আগে খুঁজি। থেকে যাও এখানে।"

নজরুল যখন হুগলি জেলে অনশনে কাতর, সেই সময়ের একটি ঘটনা খুব চিত্তাকর্ষক মনে হবে। এতে নলিনীকান্তের চরিত্রের একটি দুঃসাহসিক দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুলের অনশনের জন্য দেশসুদ্ধ সবাই উদ্বিগ্ন। নজরুল কিছুতে অনশন ছাড়েন না। রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি চিঠি বা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু নজরুল অনড়। অনশনের ২৮ দিন পার হয় এমন সময় কয়েক জন নজরুল-অনুরাগী যুবক নলিনীকান্তকে এসে ধরলেন হুগলি জেলে গিয়ে অনুরোধ জানাতে। বিশিষ্ট বন্ধু হিসাবে এঁর কথা হয় তো নজরুল মানতেও পারেন। নলিনীকান্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে সেই যুবকদের সঙ্গে হুগলি চলে গেলেন, কিন্তু জেলের ভিতরে যাবার অনুমতি মিলল না। তখন হতাশভাবে ওঁরা স্টেশনে এসে বসে আছেন এমন সময় দেখা গেল, স্টেশনের গা ঘেঁষে জেলের প্রাচীর। তখন প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের একটা ইচ্ছা জাগল মনে। যদি এই পথে গিয়ে নজরুলের দেখা পাওয়া যায়। ধরা পড়া তো নিশ্চিত, কিন্তু সেটাও কাম্য, কারণ তাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

নলিনীকান্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে বললেন, "তুমি উবু হয়ে বসো, আমি তোমার দুই কাঁধে দুটি পা দিয়ে দাঁড়াই। তারপর তুমি আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করো, তোমার ঘাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে আমি যদি পাঁচিলের ওপর উঠতে পারি তুমি আর এখানে থেকো না।"

সফল পরিকল্পনা ! কিন্তু প্রাচীরের উপর থেকে ভিতরের দিকে এত নিচু যে সেখান থেকে লাফানো দুঃসাধ্য। ততক্ষণে জেলের বন্দীরাও মজা দেখতে ভিড় করেছে। নলিনীকান্ত এক পরিচিত রাজবন্দীকে চেঁচিয়ে বলে দিলেন, নজরুলকে ডেকে দিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুটি ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে নজরুল টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছেন। নলিনীকান্ত ঐখান থেকে তাঁকে ইঙ্গিতে খেতে অনুরোধ জানালেন, নজরুলও জোড়হাতে অক্ষমতা জানালেন।—এর পরে অনেক ঘটনা, তবে বিপদ আর কিছু হয় নি এঁদের।

তাঁর মুখে আর একটি কাহিনী শুনেছি যা শরৎ-পণ্ডিতীয় কৌশলের সমপর্যায়ে উত্তীর্ণ। অনেক দিন আগে শোনা, তাই সমস্ত খুঁটিনাটি মনে নেই। তবে মূল ঘটনাটি এই—নলিনীকান্তের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্য শ্যামবাজারে এক বাড়িতে থাকতেন। এবং প্রতি শনিবারে কিছু কেনাকাটা করে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেশে পাঠাতেন। এই বন্ধু এক শনিবারে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর উল্টো দিকে পরিচিত যাত্রীর অপেক্ষায় বসে আছেন, এমন সময় নলিনীকান্ত সেই পথে যেতে তাঁর মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধির উদয় হল। তিনি একটু চেঁচিয়ে, অন্য পথচারী যাতে শুনতে পায়, এমনিভাবে তাঁর কাছে গিয়ে প্রায় জোড়হাতে বলতে লাগলেন, দাদা, এভাবে বৌদির উপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। চলুন ফিরে বাড়িতে। ছিছি, সামান্য কলহে বৌদিকে এত বড় শাস্তি দেবেন না, দোহাই আপনার। বৌদি কেঁদে আকুল হচ্ছেন।

এমন মধুর বিষয়ের কথা পথচারীদের কানে যেতেই একে একে সবাই সেখানে এগিয়ে এসে নলিনীকান্তকে সমর্থন জানিয়ে উক্ত দাদাকে বাড়ি ফেরার জন্য উপদেশ দিতে লাগলেন। প্রত্যেকেই স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে একমত হয়ে দাদাকে অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগলেন। শেষে বাধ্য হয়ে উক্ত দাদা নলিনীকান্তকে বললেন, 'ভাই, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক', এবং ওখান থেকে উঠে পড়লেন। সেদিন আর তাঁর মেস থেকে কিছু বাড়ি পাঠানো হল না।

১৯৩০-এ নলিনীকান্ত বেতার জগতের সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং চোদ্দ বছর পরে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে অর্থাৎ অবসর গ্রহণের বছরে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মর্মর মূর্তির একখানি ফোটোগ্রাফ নলিনীকান্ত সরকার আমার কাছে চেয়েছিলেন বেতার জগতের মলাটে ছাপার জন্য। পূর্ব

বছর ফেব্রুয়ারির শেষে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষে গিরিশ পার্কে বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল। মর্মর মূর্তিতে ভক্তগণ কর্তৃক অনেক মালা পরানো হয়েছিল। আমি পৃথকভাবে মাল্যভূষিত মূর্তির ছবি তোলার পরেও উপস্থিত ব্যক্তিদের ছবি নিলাম একখানা। তাতে শিশির-কুমার ভাদুড়ি, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল সিংহ, হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত, অশোক শাস্ত্রী, মন্মথ বসু প্রভৃতি ছিলেন। ক্ষেত্র মিত্র, হাঁদুবাবু (মন্মথ পাল) ও ছিলেন। এই আলোকচিত্রখানি অদ্যাবধি আলোর মুখ দেখে নি,আমার কাছে রক্ষিত আছে। যাইহোক আমি বেতার জগতে গিরিশচন্দ্রের ছবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। হঠাৎ পর দিন নলিনীকান্ত আমাকে বললেন, 'এ ছবি চলবে না।' 'কেন?' 'গিরিশচন্দ্রের পরিবার ভীষণ আপত্তি করবেন তাঁর এই খালি গায়ের ছবিতে। জামা পরিয়ে ফোটো তোলা উচিত ছিল।' আমি এ কথায় হাসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নলিনীকান্ত থামিয়ে দিলেন। বললেন, অবাঙালী সহকারী স্টেশন ডাইরেক্টর যা বলেছেন, তাই আপনাকে বললাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, পরিণাম কি হল?

নলিনীকান্ত বললেন, সহকারী স্টেশন ডাইরেক্টরকে শেষে বুঝিয়ে বলতে হল যে, ওটা তাঁর মর্মর মূর্তির ছবি, এবং যাঁর মূর্তি তিনি বহুকাল গত হয়েছেন। এই সব বুঝিয়ে বলাতে তিনি শান্ত হয়েছেন। অবাঙালী হলেও স্টেশন পরিচালকদের কেউ যে একখানি মর্মর মূর্তির ছবি বুঝতে পারেন না, এতে খুব বিস্মিত হই নি, এমন কি সেই ১৯৪৪ সনেও। তবে একটি ভাল পয়েন্ট সেই অবাঙালী কর্তৃপক্ষের সপক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, তিনি ভুল বুঝিয়ে দেবার পর সেটা স্বীকার করেছিলেন।

নলিনীকান্তের ছন্দঃপ্রীতির কথা, প্যারডিপ্রীতি এবং কবিত্বশক্তির কথা বলেছি। তিনি মালদহের গম্ভীরা গানের অনুকরণে 'কাঞ্চনতলার কাপ' নামে যে প্রায় একখানি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, তাতে তিনি তাঁর রচনাক্ষমতা শুধু নয়, গম্ভীরা যুগের ভাষা, ভাব, এবং ভঙ্গি এবং গ্রাম্য সরল চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পূর্ণ আত্মস্থ করার যে নিপুণতা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। কিংবা এ বিষয়ে সম্ভবত একমাত্র সজনীকান্ত দাসকে তাঁর জুড়ি বলা যেতে পারে।

পাকুড় রামপুরহাট সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের ফুটবল টীম কাঞ্চনতলায় যে ম্যাচ খেলেছিল, সেই খেলা একটি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের চোখে

কেমন ঠেকেছিল নলিনীকান্ত সেই বিস্মিত লোকটির জবানিতে তা গম্ভীরার অনুকরণে রচনা করেছেন।

সজনীকান্ত দাসের মাইকেলবধ কাব্য নলিনীকান্ত ও প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে রচনা। (সজনীকান্ত দাস রচনা দ্রষ্টব্য।) আমি নলিনীকান্ত সরকারের অংশের কিছু নমুনা এইখানে উদ্ধৃত করি। মূল ছত্রগুলি পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে—সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি —ইত্যাদি। গম্ভীরায় এটি রূপান্তরিত হল এইভাবে—

শিব সামলা তোর বুঢ়া এঁড়্যা।
ও যে রাক্ষসে আজ সাবড়্যা দিছে
হনুগুলাকে করছে বেঁড়্যা।
তোর এঁড়্যার গুণ হে শিব, কাছে এস্যা শুন্
শিঙের টিঁসে বীরবাহুকে কর‍্যা দিলে খুন,
তখন দেখলে লোকে রামচন্দর
তীরের খোঁচায় দিলে মের‍্যা।
তোর বেটীকে বোল হে যেন মোরে করে ভর,
জুৎ কর‍্যা গান ধরবো আমি দেয় যেন এই বর,
ফের করতে লঢ়াই আবার কাকে
রাবণ রাজা পাঠায় তেড়্যা।
রামের মাগ কর‍্যা গাপ করলো যে পাপ-
মধু বলে যাবেই হের‍্যা।

এর পর সংস্কৃত নানা ছন্দে ঐ একই ছত্রগুলির প্যারডি। দু-একটার নমুনা দিচ্ছি। এতে মোট গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, পজ্ঝটিকা, মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর, শার্দূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী, মালিনী, বসন্ততিলক, শশিকলা, মত্তময়ূর, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, গীতিকা, মৃগী, জয়দেবি, প্রভৃতি প্রাচীনতম থেকে 'আধুনিক' সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যথা,

তোটক

পড়ি সম্মুখ আহব-মাঝ যবে
হত বীর বলী, কহ দেবি! তবে
করি নায়ক রাবণ কোন জনে
পুনরায় পরে দিল ঠেলি রণে?

পজ্‌ঝটিকা

বীর বাহু করি সম্মুখ যুদ্ধ
চলে যমালয়ে শ্বাসনিরুদ্ধ
'কালে কহ গো মাতঃ কারে
সৈনাপত্যে পুন বরিবারে
করিলা পুনরপি আজ্ঞা জারি
রক্ষঃকুলনিধি রঘুনাথারি ?
ইত্যাদি।

ছন্দ ও মিলের প্রতি মমতাবশত নলিনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর একটি বড় উপকার করেছিলেন।

কবির যে দিন মৃত্যু ঘটল, সেই ১৯৪১ সনের ৭ই অগস্ট, তার প্রায় দু' বছর আগে নবপরিকল্পিত ডাকঘর নাটকের শেষ দৃশ্যের জন্য তিনি একটি গান লেখেন। গানটি ঠাকুর্দার গাইবার কথা, সুপ্ত অমলের শিয়রে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ঐ নাটকটি শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হতে পারে নি। কবি সে সময় এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে গানটি যেন তাঁর মৃত্যুর আগে প্রচারিত না হয়। গানের আরম্ভ—"সমুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।" এ গান তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে প্রথম গাওয়া হয়। আমি এ গানটি সে সময় প্রথম শুনি রেডিওতে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায় সুকণ্ঠ সুনীল রায়ের কণ্ঠে। সুনীল এ গান গেয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগীদের আসরে প্রথম ছাড়পত্র পায়।

কিন্তু এই গানের একটি মিল একটুখানি অসঙ্গত ছিল। আরম্ভের ছত্র-গুলি এইভাবে গাওয়া হল—

সমুখে শান্তি পারাবার—
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতির ধ্রুব তারকা।

এই গানের শেষ ছত্রে আছে, "পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার॥"

কিন্তু কিছুদিন পরে নলিনীকান্ত সরকার সন্দেহ প্রকাশ করেন, জ্যোতির

ধ্রুব তারকা স্থলে "জ্যোতি ধ্রুব তারকার" হলে 'পারাবার' 'কর্ণধার' 'অজানার'—এই তিনটি শব্দের সঙ্গে মিল সুসঙ্গত হয় এবং অর্থ আরও সুসঙ্গত হয়। নিশ্চয় এটি ছাপার ভুল। কারণ মিলের রাজা রবীন্দ্রনাথ এ ত্রুটি কখনো ঘটান নি। তিনি যুগান্তরে এ সন্দেহ প্রকাশ করলেন। এবং এর ফলে সে সন্দেহ শান্তিনিকেতনেও প্রবেশ করল, এবং মূল লেখাটিও পাওয়া গেল। দেখা গেল, মূলে ভুল নেই, "জ্যোতি ধ্রুব তারকার" ঠিকই আছে, ওটা নকলকারীর ভুল। অর্থাৎ নলিনীকান্ত যে সন্দেহ করলেন, সে সন্দেহ আর তখন সন্দেহ রইল না। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর নলিনীকান্তের এই অনুমানের জন্য ধন্যবাদ জানালেন।

কবিতার সঙ্গত মিলের দিকে বেশি দৃষ্টি থাকাতে নলিনীকান্ত একবার কিছু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কবিতা লিখতেন। নলিনীকান্ত একদিন বলেন, এখন লেখেন না কেন? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, নাটকের জন্য গান লিখতে হয়, টুকরো কবিতা লেখার সময় পাওয়া যায় না। তবে যদি তাঁর ভাবপ্রবণ অবস্থায় কেউ লিখে নিতে পারে, তবে মুখে মুখে বলতে রাজি। এমনি এক ভাবাক্রান্ত অবস্থায় নলিনীকান্ত কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন। দু-তিন মিনিট চিন্তার পর ক্ষীরোদপ্রসাদ নলিনীকান্তকে লিখতে আদেশ দিয়ে বলতে লাগলেন—

সম্মুখে আঁধার ঘন
সবে সন্ধ্যা, প'ড়ে সারা রাতি,
সম্মুখে ভীষণ বন
দুর্গম, দুর্গম পথ অতি।

এইটুকু লিখেই নলিনীকান্ত ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাধা দিয়ে বললেন, 'রাতি'র সঙ্গে 'অতি'র মিলটা ভাল মনে হচ্ছে না, ওটা একটু বদলে দিন না?—মুদিতচক্ষু ক্ষীরোদপ্রসাদ বললেন, 'বাধা দিও না, যা আসছে লিখে যাও।'

মিল নিয়ে যাঁর দুর্ভাবনা তাঁর পক্ষে এ জাতীয় গরমিল স্বভাবতই অস্বস্তিকর এবং মিল-মালিকদের এই ত্রুটি এঁরা সহজভাবে নিতে পারেন না। আর পারেন না বলেই "ধ্রুব তারকা" তার ধ্রুবত্ব হারাল রবীন্দ্রনাথের গানে। হয় তো না ধরিয়ে দিলে এই ভুলটা আর ধরাই পড়ত না।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের শারদীয় যুগান্তরে আমি নলিনীকান্তের মোহমুদ্গর নামক একটি সমসাময়িক কালের চিত্ররূপী কবিতা ছাপি। কবিতাটি

আমাদের সবারই প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার একটি ক্ল্যাসিক্যাল রূপ। বেদনার কথা সংস্কৃত পজ্‌ঝটিকা ছন্দে লঘু-গুরু ভেদে পড়লে কৌতুক-কবিতা মনে হবে স্বভাবতই। এটাকেও "হাসির অন্তরালে"র অন্তর্ভুক্ত করা চলত, কিন্তু এতে যে বেদনা ব্যক্ত হয়েছে, তা ব্যক্তিগত নয়, সর্বজনীন। কবিতাটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করছি। লঘুগুরু ভেদে সংস্কৃত মোহমুদ্গর পড়বার ভঙ্গিতে পড়তে হবে, অর্থাৎ আ-কার, দীর্ঘ ঈ-কার দীর্ঘ উ-কার, এ-কার, ঐ-কার, ও-কার ও ঔ-কার, অনুস্বর বিসর্গযুক্ত বর্ণ, এবং যে-কোনো যুক্তবর্ণের আগের যে-কোনো বর্ণ, দীর্ঘ। বাংলায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই ছন্দে লেখা "জান না কি কদাচন মূঢ়, কর্ণবিমর্দন মর্ম কি গূঢ়" ইত্যাদি যাঁর পড়া আছে, তাঁর পক্ষে, এবং যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁদের পক্ষে এ ছন্দ পড়া সহজ হবে। কিছু আগে মাইকেল বধ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত পজ্‌ঝটিকা ছন্দে নলিনীকান্তের অন্য একটি কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে।

নলিনীকান্তের মোহমুদ্গর

শুনহে ভ্রাতঃ! সতর্কবাণী—
জীবন-মরণে লহ সম মানি
অস্থিরপঞ্চক জীবন-যাত্রা
নাহিক ছন্দঃ, নাহিক মাত্রা।
নলিনীদলগত জলমতিতরলম্।
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্॥

*

চলি বাজারে প্রত্যহ প্রাতে,
শূন্য থলিটি বহি ফিরি বাসাতে।
সঙ্কুলন যাত্রা ট্রামে বাসে
অফিস-গতাগতি উর্ধ্বশ্বাসে।
পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ
পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ॥

*

মৎস্যে আত্মা খাঁচা ছাড়া,
দর শুনি নেত্রে দরদর ধারা।
অদ্য নিরামিষ তথৈব কল্য,
ভাগ্যে নাহিক রস মাৎস্যল্য।
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।
নাস্তি ততঃ সুখ লেশঃ সত্যম্॥

*

শৃগাল-কন্টক বীজবরিষ্ঠ
সর্ষপ তৈলে ললাট পিষ্ট।
যব-গম-চূর্ণে প্রস্তর চূর্ণ,
ঘৃত মাঝে কত কী যে পূর্ণ।
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্॥

*

কঙ্করকীর্ণা অন্নস্থালী
তদুপরি দাইল পয়ঃপ্রণালী!
বদনে বিস্মিত চর্বণ শক্তি
অশনে খসন্ত দংষ্ট্রাপংক্তি।
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্!
দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।

*

ক্রিকেট-ফুটবল-হকি ময়দানে,
প্রেমোদ্বেল-সিনেমা পানে
ধাবিত সুরসিক-রসিকা-যাত্রী
জোড়া জোড়া পাত্র চ পাত্রী।
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত।
স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ॥

*

গুটিঙে ভার্যা, মিটিঙে পুত্র—
নাহিক গেহে সঙ্গম-সূত্র।
হতভম্বপ্রায় গণ্ডে হস্ত
বিমূঢ় কর্তা চিন্তাগ্রস্ত।
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ॥

*

গর্জে প্রবীণ ঘন রনরনিতে
নখরদশনগত সিংহধ্বনিতে
অপঠিত ভারত-ভগবদ্গীতা,
রামায়ণস্থ রাঘব-সীতা।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ।
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

*

জীবন-যাপন বড়ই অসহ্য
ভেজালীকৃত ভোজ্যাভোজ্য।
মিথ্যা মায়া খলু সংসারে
মিথ্যা আসা বারংবারে।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা।
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

*

খাইনু আফিম—কি করি অগত্যা
আপন হাতে আপন হত্যা।
নিষ্ক্রিয় আফিম—দেখিনু চাহি
মৃত্যু ত নাই-ই—তন্দ্রাও নাহি।
কস্য ত্বংবা কুত আয়াত
স্তত্বং চিন্তয় তদ্দিদং ভ্রাতঃ॥

এই কবিতাটি আজ দশ বছর পরেও সমান সুখকর মনে হবে। এবং সম্ভবত আরো দশ বছর পরেও। গোড়ার স্তবকে অস্থিরপঞ্চক নামক একটি শব্দ আছে, ওর অর্থ, 'কঠিন সমস্যা'। তৃতীয় স্তবকের মাৎস্যাল্য বাৎসল্যের অনুকরণে নতুন গড়া শব্দ। যেমন পঞ্চম স্তবকে, খসন্ত। বুঝতে কষ্ট না হবার কথা। এ রকম আরও নানা জাতীয় নতুনত্ব আছে এ কবিতায়। মোট কথা শঙ্করাচার্য ও সরকারাচার্য এ কবিতায় ধ্বনির দিক থেকে যথেষ্ট এক হয়েছেন। কিন্তু মোহ মুদ্‌গরের সাধ্য কি দৈনিক বাজারে যাওয়ার হাত থেকে আমাদের নিবৃত্ত করে?

নলিনীকান্তের চরিত্রের একটি অনমনীয় দিকের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বেতার জগতের সম্পাদনাকালে। সেটি ১৯৩৯ কিংবা ৪০ সন হবে। উপর থেকে হুকুম এলো ধুতি পাঞ্জাবি পরে রেডিও অফিসে আসা চলবে না, সাহেব সেজে আসতে হবে। এ সরকারী আদেশ অন্য সবাই পালন করলেন শুধু সরকার পালন করলেন না। তিনি চোগাচাপকান চাপিয়ে স্বদেশীই রয়ে গেলেন। সেই সময়ে আমি তাঁর যে একখানি ছবি তুলে-

ছিলাম তা এই সঙ্গে ছাপা হল। যৌবনকালে স্বদেশী করেছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই সেই স্বদেশী মনের বদল ঘটিয়ে তার উপর কোট-প্যাণ্ট আর চাপাতে পারলেন না।

তাঁর বহু লেখার মধ্যে "হাসির অন্তরালে" বইখানিকে আমি নানা দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলেছি কেন, তা আগে বলেছি। তার প্রধান কারণ এতে তিনি নিজেকে এবং নিজের ব্যক্তিগত নানা পরাজয়কেও বাস্তব দৃষ্টিতে কিছু দূর থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এর অনেক কাহিনীতেই কিশোরসুলভ একটি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং মনে হয় এখানেও শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের প্রভাব।

হাসির অন্তরালের একটি কাহিনী এই—নলিনীকান্ত রামপুরহাটে একটি গানের আসরে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। স্কুলের ছেলে থেকে প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি সবাই আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ধর্মপ্রাণ বলে খ্যাত ছিলেন। তিনি নলিনীকান্তকে জিজ্ঞাসা করলেন কি গান তিনি গাইবেন। সাধারণ বাংলা গান গাইবেন শুনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কীর্তন, পদাবলী গাইতে পারেন কি না। তারপর যোগ করলেন—রামপ্রসাদ কমলাকান্ত, নীলকণ্ঠ?—সবই কিছু কিছু জানি বললেন নলিনীকান্ত। এবং বললেন রজনীকান্ত সেনের গান শুনবেন?—ভদ্রলোক খুব উৎসাহী। তারপর হঠাৎ দেওয়ালের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, আপনি এঁর গান জানেন না?

দেয়ালের ঠিক সেইখানে একজন বসে ছিলেন, নলিনীকান্ত তাঁকে চেনেন না, তাই কিছু বিভ্রান্ত হলেন। বললেন, আপনি কার কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক বললেন, বুঝতে পারেন নি? বলে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিকে, অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে তিনি রাজি নন। শুধু রজনী সেনের গান শুনবেন তিনি।

নলিনীকান্ত প্রথম গাইলেন, "যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু", তার পর গাইলেন "ও হে জীবন বল্লভ সাধন দুর্লভ"। ভদ্রলোকের চক্ষু অশ্রুসিক্ত। বললেন, রজনী সেনের গানের তুলনা আছে?

তখন নলিনীকান্ত অপরাধ স্বীকার করে বললেন, যে দুখানা তিনি গাইলেন, সে দুখানাই রবীন্দ্রনাথের গান।

বলেন কি? এ গান রবিবাবুর? আর জানেন? গান তো?

একবার খুবই মজার একটি ঘটনা ঘটেছিল। নলিনীকান্তের অপরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁকে গান গাইবার জন্য নিয়ে গেছেন এক বাগান বাড়িতে। সেখানে সবাই মদ্যপ। নলিনীকান্ত এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। গৃহ-স্বামীর তখন মত্ত অবস্থা। তিনি হুইস্কি গেলাসে ঢেলে নলিনীকান্তের মুখের কাছে ধরলেন। এমন সময় যিনি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর কানে কানে কি যেন বললেন। তখন গৃহস্বামী কোনো রকমে পা দুখানা খাড়া রেখে বলতে আরম্ভ করলেন—হুইস্কি অফার করে আমি নলিনীকান্তের কাছে যে অপরাধ করেছি, এই প্রকাশ্য সভায় তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নলিনীবাবু স্বদেশী আন্দোলনের লোক, দেশকে স্বাধীন করার জন্য ইনি কি না করছেন, বোমা, পিস্তল ছোঁড়া, ডাকাতি করা, জেলে যাওয়া, আন্দামানে যাওয়া, এমন কি ফাঁসিতে পর্যন্ত ঝুলেছেন। বক্তৃতা সহজে থামে না। তাঁকে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি নিরুদ্দেশ। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর আবির্ভাব ঘটল, হাতে গেলাস, ফেনায় ভরা, কলেবর ঘর্মাক্ত। গেলাসটি নলিনীকান্তের সামনে ধরে হাঁসফাঁস করতে করতে তিনি বললেন, "অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি, নলিনীবাবু, বিলিতী বলে আপনি হুইস্কি খেলেন না।"

নলিনীকান্ত এই মাতালের চরিত্রটি সুন্দর ফুটিয়েছেন। এমন অনেক ঘটনাই ঘটেছে তাঁর বিচিত্র জীবনে। এখন তিনি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম বাসী। তাঁর অন্য বন্ধুরা এককালে বাস করেছেন আন্দামানে। দ্বীপান্তরে আর দেশান্তরে যেটুকু তফাৎ। বয়স ৭৭ পার হচ্ছে। মুক্তি-লাভ করে স্বদেশে ফিরতে অনেক বিলম্ব আছে। বিলম্ব হোক। চার্লি চাপলিন, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, ও নলিনীকান্ত সরকার একই বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং আশা করি নলিনীকান্ত চার্লির ধারাটা বেশি পেয়েছেন বলে তিনি তাঁর মতোই দীর্ঘজীবী হবেন।

২৮-৭-৬৬

শিশিরকুমার ভাদুড়ি

১৮৮৯-১৯৫৯

আমি যে কয়েকজন ব্যক্তিকে একটু বেশি নিবিড়ভাবে দেখেছি তাঁরা সবাই আমার চোখে কোনো না কোনো দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। তাঁরা সাধারণের চেয়ে ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগে নি, স্বতন্ত্র এইমাত্র। শিশিরকুমার ভাদুড়িকেও আমি অধ্যাপকরূপে পৃথক চোখে দেখেছিলাম, যখন প্রথম (১৯১৭—১৮) তাঁর সামনে মেট্রোপলিটান ইনস্টিট্যুশন-বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্ররূপে বসি।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন অধ্যাপকের নাম মনে আসে। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে (১৯১৫-১৬) যিনি সংস্কৃত পড়াতেন, তাঁকে স্বতন্ত্র মনে হয়েছে। তিনি তাঁর অধ্যাপনার মধ্যে এমন মত্ত হয়ে পড়তেন যে, তখন তাঁর কাছে পৃথিবীর আর কিছুই যেন সত্য নয়। তাঁর নাম হেমচন্দ্র রায়। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর যে ভালবাসার আবেগ দেখেছি, তা তিনি সমস্ত ছাত্রের মনে সঞ্চারিত করে দিতেন। তাঁর এই অধ্যাপনার চেহারা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

তারপরেই বিদ্যাসাগর কলেজ। এখানে বাংলা ও সংস্কৃতের একজন বিদ্যাসাগরী আমলের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর নাম রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ। তিনি আমার কাছে বড়ই মজার লোক মনে হয়েছিলেন। কারণ তিনি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ক্লাসে পড়াবার সময় আমাদের সমবয়সী হয়ে পড়তেন এবং আমাদের সঙ্গে নানা রকম রসিকতা আরম্ভ করতেন। খুব হাসাতেন সবাইকে। আর স্বতন্ত্র মনে হয়েছে কুঞ্জলাল নাগকে। তিনি নাটক পড়াতেন, কিন্তু অনেক সময় অভিনয় করে দেখিয়ে দিতেন চরিত্রের আসল রূপটি কেমন হওয়া উচিত।

আর যিনি পরবর্তী জীবনে শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে খ্যাত হয়েছিলেন, সেই শিশিরকুমার ক্লাসে পড়াবার সময় কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই পড়াতেন। অবশ্য আমি তাঁর কাছে ভাষাতত্ত্ব পড়েছি, সেখানে কুঞ্জলালকে অনুকরণ করার কোনো স্থান ছিল না। তাঁর কাছে পূর্ববর্তী ছাত্ররা চার্লস ল্যাম-এর 'এসেজ অভ ইলাইয়া' পড়েছেন, কিন্তু ক্লাসে তাঁর ব্যবহার সম্পর্কে কেউ কিছু লিখেছেন কি না আমার জানা নেই। একমাত্র রমেশচন্দ্র সেনের, বিদ্যাসাগর

কলেজের শত স্মরণ বার্ষিকী গ্রন্থে প্রকাশিত একটি ছোট স্মৃতিকথায় (Centenary Souvenir 1859—1959) দেখেছি।

"১৯১৩...ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে মেট্রোপলিটান কলেজে [ইনস্টি-ট্যুশনে] ভর্তি হলাম।... শিশির ভাদুড়ি তখন যুবক। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ও অন্যত্র... অভিনয় করে এর মধ্যেই প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সুপুরুষ, সুবিখ্যাত অভিনেতা। কিন্তু তিনি যে এত বড় পণ্ডিত আমরা তা ভাবতেও পারি নি। তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে অবাক হয়ে গেলুম। তিনি অনার্স ক্লাসে Essays of Elia পড়াতেন।"

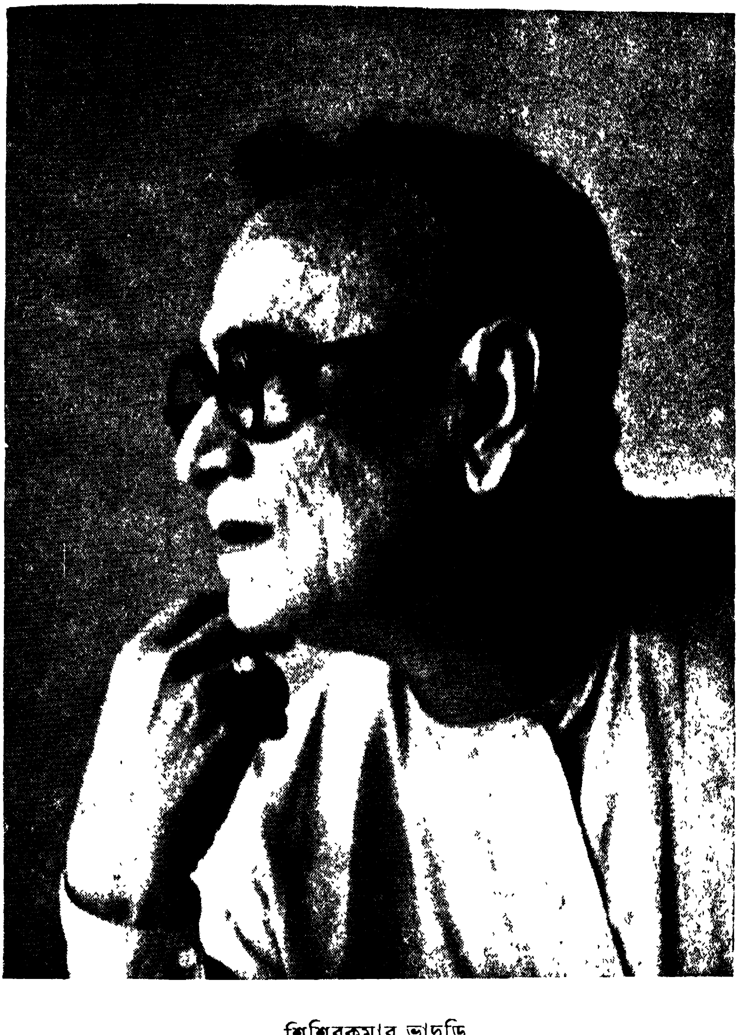
শিশিরকুমারের ছিল শ্রোতা-আকর্ষণী কণ্ঠস্বর, এবং দর্শক-আকর্ষণী রূপ এবং বাচনভঙ্গিতে তিনি সবার চিত্তাকর্ষক ছিলেন। যে বিষয়ই পড়াতেন তা শুনে মন নন্দিত হত। কৌতুক বোধ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুণ। মনে হয়, তা উচ্ছলিত প্রাণধর্ম থেকে জাত। নিজেকে নানাভাবে প্রকাশের একটা দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি ছিল তাঁর সহজাত। অন্তত তখনকার ব্যবহার এবং পরবর্তী কালের ব্যবহার মিলিয়ে চিন্তা করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা যেন তাঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত মধুর ছিল। বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। অজ্ঞতায় বিচলিত হতেন না, সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিয়ে বলতেন। পোষাকবিলাসী ছিলেন, দু-একদিন পর পর নতুন পোষাকে আসতেন। তাঁর প্রাণখোলা কথা, মধুর হাসি এবং বন্ধুজনোচিত ব্যব-হারের ফাঁকে কখনো কোনো ছাত্রের প্রতি শাসনের মনোভাব দেখিনি।

এইসব কারণে তিনি সবার হৃদয় জয় করেছিলেন।

টিউটোরিয়াল ক্লাস নিয়েছিলেন কিছুদিন। আমাদের ইংরেজী রচনা যেন সুপাঠ্য হয় এই ছিল উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি এক অভিনব রীতির প্রচলন করেছিলেন। তিনি ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের কোনো একটা কবিতা দু-তিনবার পড়তেন, এবং সে কবিতা শুনে আমাদের মনে যে অর্থটুকু বা ছবিটুকু জাগল তা সংক্ষেপে ইংরেজীতে লিখে দিতে বলতেন।

শিশিরকুমারের অভিনয় খ্যাতি আমার পক্ষে অতিরিক্ত আকর্ষণ হয়ে-ছিল সম্ভবত এ কারণে যে, ছোটবেলা থেকেই থিয়েটার দেখা ছিল আমার একটা নেশা। পল্লী-গ্রামেও কোনো থিয়েটার দেখা বাদ দিইনি, এবং নিজেও দু-একবার থিয়েটারে অভিনয় করেছি। তা অবশ্য পল্লীদর্শকদের



শিশিরকুমার ভাদুড়ি

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৫১

সামনে। কিন্তু সে কথা বেশি না বলাই ভাল। যাই হোক, ছাত্র-জীবনের স্মৃতির সঙ্গে শিশিরকুমারের অধ্যাপনা-স্মৃতির এইখানেই বিরাম।

বত্রিশ বছরের বিরাম। এই দীর্ঘদিন পরে শিশিরকুমার যে পুনরায় পরম সুহৃদের মতো আমার অত্যন্ত কাছে এসে পড়বেন, তা কল্পনা করাও অসাধ্য ছিল। জীবনস্রোতে কে কোথায় গিয়ে পড়েছিলাম, আবার জীবন-স্রোতেই ভেসে এক সঙ্গে এসে মিললাম, এ এক আশ্চর্য ঘটনা। শিশির-কুমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করলেন। তখন আমি যে তাঁর কাছে এককালে পড়েছি, এইটুকু সম্পর্ক ভিন্ন আর কোনো সম্পর্ক নেই। এই সময় দেখলাম তাঁর সীতা-নাটক অভিনয়। সম্পর্ক তখন সাধারণ দর্শকের। বহু লক্ষের মধ্যে একজন। এরও অনেক দিন পরে—৩০ বছর হবে—আমাকে জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'পরিচয়' নাটক দেখে রেডিওতে সমালোচনা করতে হয়েছিল। নাট্যকার আমার বন্ধু, তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যান ভিতরে। উইংস-এর পাশে স্বল্প বিরামের সময় রায় বাহাদুর শিশিরকুমারের সঙ্গে এক মিনিটের জন্য পরিচিত হয়েছিলাম। অন্যের দ্বারা সেই প্রথম পরিচয় এবং নাটকের নামও পরিচয়। এ নাটকে তিনি রায় বাহাদুরের ভূমিকা নিয়েছিলেন। (পরিচয় নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৯৪৯, ১০ই অগস্ট।)

তারপর, ১৯৫১। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু, অ্যাডভোকেট সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী। তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ শিশির-সুহৃৎ, শিশিরকুমারকে একদিন আমাদের বাড়িতে এনে হাজির।

হঠাৎ আগমন, পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল না।

শিশিরকুমার নিজের অনেক কথা বলবার লোক খুঁজছিলেন। আমার মধ্যে পেলেন তাঁর সবচেয়ে নিষ্ঠাবান শ্রোতা। দু-চার দিন অনিয়মিতভাবে সুরেন্দ্রমোহনের সঙ্গে আসবার পরে নিয়মিত একা আসতে লাগলেন। শেষে সপ্তাহে পাঁচ দিন পর্যন্ত এসেছেন। এই সময় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'তখত-এ-তাউস' নামক নাটক আরম্ভ হয়েছে শ্রীরঙ্গমে।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আমার বাড়ির কাছেই থাকতেন, তিনিও প্রায়ই আসতেন। শিশিরকুমারের অন্তঃকরণ কোমল ছিল, তা কিছু ঘনিষ্ঠ হবার পর ধীরে ধীরে বোঝা গেল। তিনি তাঁর অভিনয়ে বাড়ির সবাইকে যেতে বলতেন, না গেলে বেশ দুঃখিত হতেন। তাঁর পছন্দ মতো তরকারী রান্না করে মাঝে মাঝে পাঠাতেন আমার স্ত্রী। আমাদের বাড়িতেও

একদিন মধ্যাহ্নে ভোজন করেছেন, কিন্তু এত কম খেতেন যে, সেরকম মানুষকে খাইয়ে কারো তৃপ্তি হত না। তাঁর মনখোলা উদার ব্যবহার এবং আলাপ, আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। যে অভিনেতা-শিশিরকুমার ভাদুড়িকে রাম, আলমগীর, শাজাহান, রঘুবীর, মধুসূদন প্রভৃতির ভূমিকায় দেখে বিস্মিত হয়েছি, সেই অভিনেতা ১৯৫১ সনে আমাদের কাছে স্বয়ং শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভূমিকায় অভিনয় করতে আসবেন, এ কথা কল্পনা করা অসম্ভব ছিল।

দুটি জিনিস তাঁর খুব প্রিয় ছিল—ক্রমাগত নানা বিষয়ে আলাপ, থিয়েটার সংক্রান্ত বেশি, এবং বই পড়া। আমার কাছ থেকে নিয়মিত বই নিয়ে যেতেন, এবং প্রতিশ্রুত তারিখে নিয়ে আসতেন। কোনো কারণে নিজে আসতে না পারলে অন্য লোকের হাতে পাঠিয়ে দিতেন। বেশ একটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে শেষ জীবনটা কাটিয়েছেন মনে হয়। পূর্ব যুগের প্রতিক্রিয়া।

১৯৫১ সনের মে মাসের গোড়ার দিকে আমাকে তখত-এ-তাউস দেখতে নিমন্ত্রণ জানান, এবং নাটক বিষয়ে আমার মতামত জানতে চান। আমি নাটক দেখে একখানা চিঠির আকারে দীর্ঘ সমালোচনা লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দিই। এটি আমাদের নব পরিচয়ের অল্প কিছুদিন পরের ব্যাপার। এই নাটকে এক উচ্ছৃঙ্খল সম্রাটের অধঃপতন কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। সম্রাট জাহান্দার শার কাহিনী, ইনি বাহাদুর শার দ্বিতীয় পুত্র। মোগলদের শেষ সময়ের একটি অতি কুৎসিত চিত্র এটি। সিংহাসন নিয়ে ভাইদের মধ্যে হীন ষড়যন্ত্র এবং হত্যাকাণ্ড, উচ্ছিষ্ট নিয়ে পথের কুকুরদের লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সম্রাটের চরিত্রের এই অস্থিরতা, অসংযম এবং বিরোধীপক্ষের নানা ষড়যন্ত্রের পটভূমিতে আত্মরক্ষার চেষ্টার মধ্যে যে বিচিত্র নাটকীয় গুণ ছিল তা শিশিরকুমারের উপযুক্ত অবশ্যই।

আমি যে সমালোচনাটি পাঠিয়েছিলাম, তা এই নাটকের কয়েকটি আঙ্গিকের ত্রুটি বিষয়েই বেশি। সেই লিখনটির নকল এখনো আমার কাছে আছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক চোখে পড়েছিল, আবার অনেক ছোট-খাটো ব্যাপারে ত্রুটি ঘটেছিল সামান্য মনোযোগের অভাবে। এই জিনিসটি কিন্তু আগের যুগে ছিল না। তবে এ নাটক যেমন মোগল রাজত্বের মুমূর্ষু অবস্থার এক বেদনাময় কাহিনী অবলম্বন করেছে, তেমনি এটি নাট্য-সম্রাট শিশিরকুমারেরও অপ্রতিহত রাজত্বের শেষ যুগের নাটক। অর্থা-

ভাবে অনেক প্রত্যাশিত উজ্জ্বলতা ও অপ্রত্যাশিত বিস্ময় যেমন আমরা দেখতে পাইনি, তেমনি অনেক দৃশ্যে জনতা সৃষ্টির জন্য মানুষের অভাবও চোখে লেগেছে। নাটকের দিক থেকে একটি ত্রুটি ছিল এই যে, এতে সমসাময়িক কালের পটভূমি দেখানো হয়নি। শুধুই রাজনৈতিক অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র এবং কূটনীতির অতি পীড়াদায়ক চিত্র। সম্রাটের নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। সাধারণ মানুষের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। এ যুগের বা পূর্ব যুগের সকল বাংলা ঐতিহাসিক নাটকই তাই।

আমার সমস্ত সমালোচনা তিনি মেনে নিয়েছিলেন, এবং সহজে বদলানো যায় এমন কিছু কিছু বদলও করেছিলেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে। বলেছিলেন, দেখ পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ দিতে যে অনেক টাকা চাই, সে টাকা দেবে কে?

বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্যবাহী শিশিরকুমার। যাকে বলে ক্ল্যাসিক্যাল ফিনিশ, সেই দিকে ঝোঁক তাঁর বরাবর। তিনি পুরাতন ধারায় যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তা প্রকাশের পক্ষে প্রধানত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক বেশি উপযোগী। সামাজিক এবং অতি-আধুনিক নাটকও তিনি করেছেন, এবং সে সব ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে সেগুলিতে নতুন জীবন সঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু তবু সে সব অভিনয়ে তিনি তাঁর অভিনয় প্রতিভার বিস্তৃততর প্রকাশের সুযোগ পাননি। এবং তাতে তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাননি। তা ছাড়া রীতিমত নাটকের মতো নিম্ন রুচির নাটকও তিনি যে কেন এত যত্ন করে মঞ্চস্থ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ভাল বিক্রি হয়েছিল এটা অবশ্যই প্রধান কথা নয়।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত থাক। শিশিরকুমারের সঙ্গে পুরো পাঁচ বছর ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পেরে তাঁকে যেভাবে জানতে পেরেছি, বাইরে থেকে অল্প পরিচয়ে তা জানা কখনো সম্ভব হত না। মনে রাখতে হবে তিনি এককালে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন, এবং ইংরেজী সাহিত্য এবং ভাষা দুইয়েতেই তাঁর সহজ প্রবেশ ছিল। কিন্তু অভিনয়ের এবং নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব রুচি এবং কৌশল সম্পর্কে তাঁর আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠেছিল, এবং এদিক থেকে জাতিকে যে বড় করে তোলা যায় এই প্রেরণা থেকেই তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এসে যোগ দিয়েছিলেন। মূল প্রেরণা ছিল এটাই। অধ্যাপকরূপে তাঁর সৃজনমূলক কিছু করবার ছিল না, সে ছিল অল্পপরিসরে নিজেকে বেঁধে রেখে দিনের পর দিন চাকরি

করে যাওয়া। তাঁর মতো সৃজনধর্মী মনের পক্ষে এটা বেশিদিন মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমার সঙ্গে আলাপেও প্রতিদিন এটি অনুভব করেছি যে, তাঁর প্রধান কথা ছিল বাঙালী জাতির একটা বড় পরিচয় হবে তার থিয়েটার, এবং থিয়েটারকে জাতির সম্পদ না করলে চলবে না। এটিকে নিতান্তই পেশাদারি প্রতিষ্ঠান করলে এর আদর্শ কখনো বড হতে পারে না। জাতির কল্যাণে থিয়েটারকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি যেন সর্বদা ছটফট করতেন।

থিয়েটার বিষয়ে তাঁর এই পরিকল্পনা-রচনার যে প্রকৃতই অধিকার ছিল, তার প্রমাণ তিনি ভাল করেই দিয়েছেন। এবং তাঁর সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শেষ পর্যন্ত এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত লোক ছাড়া থিয়েটারের উন্নতি সম্ভব নয়। এবং এ শিক্ষা বিলেতের রয়াল অ্যাকাডেমির আদর্শে শিক্ষা, কঠিন তার পাঠ্যসূচী, শিক্ষাসূচী।

১৯২৩ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার একটি ধারা অনুসরণ করে এসেছে, এবং তারও আগের যুগের নিষ্ঠা এবং কঠোর ডিসিপলিনের ফল স্বরূপ যে থিয়েটার রূপায়িত হয়ে উঠেছে তা বাঙালীর একান্ত প্রিয় ছিল। তা জাতির জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। অখণ্ড বাংলায় এবং বাংলার বাইরে যেখানে বাঙালী সেখানেই সেই ধারা অনুসরণ করে শৌখিন সম্প্রদায় কত যে গড়ে উঠেছিল তাব সংখ্যা নেই। ঢাকাতেও অনেক গুণী শিল্পী কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন থিয়েটারে। এ বিষয়ে ঢাকার টোনা রায় খুব উৎসাহী ছিলেন, তাঁর কাছেই শুনেছি।

এমন যুগে সেই সর্বজনপ্রিয় এবং পরিচিত ধারার পাবলিক থিয়েটারের জীবনে শিশিরকুমার এমন এক চমকপ্রদ অভিনবত্ব যোগ করলেন যা এতদিনের দর্শকদের সমস্ত মনটাকেই যেন ওলটপালট করে দিল। সবাই বলতে লাগল এমনটি তো কখনো দেখি নি। বাঙালী দর্শক বিস্ময়ে আনন্দে চঞ্চল। এ যেন সম্পূর্ণ এক নবযুগের আবির্ভাব ঘটল বাংলাদেশে—বাংলার জাতীয় জীবনে। প্রয়োগকুশলতার এক আশ্চর্য সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'সীতা' দেখে আমার এক বন্ধু সমস্ত রাত ধরে শুধু বলেছিল, "এ কি দেখলাম। এ কি দেখলাম!" ভাবপ্রবণ মনে ভাবোন্মাদনা। আগের যুগে স্টেজের উপর পাঁচজনের উপস্থিতি, দুজন কথা বলছে, বাকি তিনজন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পালা এলে তখন তারা বলবে। কিন্তু শিশিরকুমারের

নাটকে শিল্পীদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পালা উঠে গেল। প্লের সঙ্গে বাই-প্লের অভিনবত্ব যুক্ত হয়ে প্রত্যেকটি দৃশ্য প্রাণস্পন্দিত হয়ে উঠল। এটি বিলেতে প্রথম চালু করেন নাট্যকার-অভিনেতা টমাস উইলিয়াম রবার্টসন (১৮২৯-৭১)। তিনি অভিনয়কে কৃত্রিমতার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, শিশিরকুমারও তাই করলেন। আমাদের থিয়েটারে দৃশ্য-পটের মধ্যে যে সব ম্যাজিক খুব জনপ্রিয় ছিল, তা সাধারণ সামাজিক বা পৌরাণিক নাটক থেকে লুপ্ত হতে লাগল। 'সীতা'য় শুধু সীতার পাতাল প্রবেশ ছাড়া স্টেজম্যাজিক আর কোনো দৃশ্যে ছিল না। সাধারণ দর্শককে টানার এইটাই ছিল আগে একমাত্র উপায়। অন্য থিয়েটারে পৌরাণিক নাটকে এবং কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক নাটকেও ম্যাজিকের আকর্ষণ টিকে রইল। পৌরাণিক নাটকে deus ex machina পুণ্যার্থীদের অবশ্য চাই, দেবতার লীলা যত দেখা যায় তত লাভ।

কিন্তু শিশিরকুমারের আসল কৃতিত্ব, সংলাপের ভঙ্গি-বদলে, এবং নতুন আনাড়ি শিল্পীদের সযত্ন শিক্ষায় নিজের অখণ্ড পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে, মানিয়ে নেওয়ার কৌশলে। এইখানে প্রোফেসর হিগিনস-এর সঙ্গে প্রোফেসর ভাতুড়ির অনেকখানি মিল আছে।

এর অনেক আগে থাকতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয়ে একটি নবধারার প্রবর্তন করেছেন। তা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতোই ভিন্নজাতের। ব্যবসা হিসাবে তার পরীক্ষার সাহস কারো হয় নি, এবং মনে হয় সে ধারা শুধু রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকেরই অঙ্গ। অতএব সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে এখানে।

শিশিরকুমার বাংলাদেশের হৃদয় জয় করেছিলেন আবির্ভাবমাত্র। তাঁর শিক্ষাদান ক্ষমতার যে পরিচয় পাওয়া গেল তা অসামান্য মনে হয়েছে সবারই। একটা 'অর্গ্যানিক ইউনিটি' বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে যে এমন জীবন্তভাবে গড়া যায় তা কে ভাবতে পেরেছিল এর আগে? সবটা মিলে একটা পূর্ণ জীবন্ত মূর্তি। এই মূর্তির মধ্যমণি শিশিরকুমার তাঁর চিত্তাকর্ষক চেহারা, সুমার্জিত বাচনভঙ্গি এবং মোহসৃজনকারী কণ্ঠ নিয়ে মঞ্চে প্রবেশমাত্র দর্শক সম্মোহিত হয়ে যেত। বাংলাদেশে সকল খ্যাতিমান শিল্পী সাহিত্যিক শিক্ষক তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সজ্জা দৃশ্য প্রভৃতি পরিকল্পনায় পণ্ডিত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করেছিলেন। সীতার সঙ্গীত ও নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন কুহেমেন্দ্রমার রায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তাঁর বন্ধুরূপে বহু বিষয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। সে এক আশ্চর্য যুগ এলো এবং চলে গেল।

এই শিশিরকুমার সহজবেশে এলেন আমার কাছে। তবু প্রথম কিছুদিন তিনি যে আমার শিক্ষক ছিলেন, এই বোধটা মাঝখানে এসে দাঁড়াত, কিছু সঙ্কোচ হত। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিজেই সে সঙ্কোচ কাটিয়ে দিলেন আমাকে চুরুট দিয়ে। তখন খেতাম। তাঁর সুরে কিছু নৈরাশ্য এবং 'সিনিসিজম' ফুটে উঠেছিল ইদানীং। শৌখিন এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চের এতদিনের অভিনেতা, অভিনয়ের শেষ মুখোশ খুলে ফেলতে চলেছেন, কিন্তু তবু মনে দুর্দান্ত আশা আমৃত্যু থিয়েটার ছাড়বেন না। এ কথা প্রকাশ করেছিলেন একদিন সুভাষ-স্মরণ উপলক্ষে। থিয়েটারে, প্রতি বছর শিশিরকুমার সুভাষচন্দ্রকে একবার করে স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন রাজনীতিতে ঐ একটি মাত্র খাঁটি মানুষ ছিল বাংলাদেশে। ১৯৫৪ সনের ৩০শে জানুয়ারি অভিনয়ের আগের স্মৃতিসভা। শ্রীরঙ্গমে সেদিন বলিদান অভিনয় হবে। তাঁর ইচ্ছা ছিল পুরানো সব নাটকই মাঝে মাঝে মঞ্চস্থ করবেন। প্রফুল্ল, সধবার একাদশী, বলিদান এবং আরও কয়েকটি নাটকের পরিকল্পনা ছিল। সেগুলি পূর্বে করেছেন সাধারণভাবে, ভবিষ্যতে মাঝে মাঝে পুরাতনকে সবার সামনে মেলে ধরা।

উক্ত ৩০শে জানুয়ারি স্মরণ সভায় পৌরোহিত্য করেন পূর্ণচন্দ্র রায়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন মনে পড়ে। কিন্তু এই প্রাচীন নাটকের পুনরভিনয় সত্ত্বেও ভিড় বেশি হয় নি। এটা সম্ভবত শিশিরকুমারের মনে বেদনা দিয়েছিল। তাই তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, "সামনের বছর থেকে এই রঙ্গালয়ের দরজাটা উন্মুক্ত করে দেব, কারণ অনেকে হয় তো মনে করেছেন টাকা লোটার জন্যই এই ব্যবস্থা।"

নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে বললেন, "বিশ্বাস করুন, সুবিধা পেয়েও রাজনীতি করি নি। ইংরেজের সময় নানা দলের ডাকও পেয়েছিলাম, কিন্তু দেখেছি ওখানে ভণ্ডামিটাই বেশি, তাই ওতে মন ওঠে নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিশেছি এবং অভিজ্ঞতা থেকে বলছি সমস্ত মাটিকে ভালবাসতে এমন আর কাউকে দেখিনি। শুধু এই কারণে আমি প্রতি বৎসর এই অনুষ্ঠান করি। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মৃত্যু আমাকে পীড়িত করেছে। ভীতও করেছে, বলতে পারেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি প্রকৃতিস্থ নই। সর্বক্ষণ ভাবছি আমাকে যেতে হবে। কিন্তু থিয়েটার

চালাব যতদিন থিয়েটার থাকবে।”

এ সমস্তই বেদনার কথা, কিন্তু হতাশার কথা নয়। কি এক দুর্দম আশাবাদ দেখেছি তাঁর মনে। শেখাবার কি উৎসাহ। এক শৌখিন তরুণতরুণীদল ‘তপতী’ নাটক করবেন, তাঁদের স্টেজের উপরে বসে শিক্ষা দেওয়ার অদম্য উৎসাহ দেখেছি শেষ অবস্থাতেও। শিক্ষার্থীর ঠিক হচ্ছে না, তবু বিরক্তি নেই, বার বার দেখিয়ে দিচ্ছেন। কি বিরক্তিহীন প্রয়াস!

তাঁর মতে থিয়েটারে যারা অভিনয় করতে চায়, বর্তমান যুগে তাদের শুধু অভিনয়ের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলেই চলবে না, তাকে পুরোদস্তুর শিক্ষিত হতে হবে। সাহিত্য, ইতিহাস, ভাল পড়া থাকা চাই, ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে জ্ঞান থাকা চাই, ধ্বনিবিজ্ঞান ও উচ্চারণতত্ত্ব ভাল জানা চাই, নইলে তার আর উন্নতি নেই, এরকম লোককে দিয়ে ভবিষ্যৎ থিয়েটারেরও উন্নতি নেই, অন্তত তা দেশের উন্নতির কাজে, সংস্কৃতি বিস্তারের কাজে, অসমর্থ হবে। নাটকের জন্য এই রকম ব্যাপক শিক্ষায়তন গড়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল তিনি এ কাজের কর্ণধার হতে পারবেন একদিন। কিন্তু কি ভাবে যে তা সম্ভব, তাও ভেবে পেতেন না। অর্থাৎ সরকার থেকে এ ব্যবস্থা না হলে যে তা সম্ভব নয়, এ কথা বুঝতে পারতেন। ভার পেলে খুশি হতেন, কিন্তু পরিকল্পনা তাঁর সম্পূর্ণ নিজের হওয়া চাই।

প্রাচীন নাটকের পুনরভিনয় সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ। এটি তিনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও করেছেন। জানতেন, এ শুধুই নাট্য ইতিহাসের বিবর্তন বিষয়ে যাঁদের কুতূহল, তাঁদের কাছেই আদৃত হবে। কিন্তু প্রথম অভিনয়ে তাঁদের সংখ্যাও যতটা আশা করেছিলেন তা হয় নি দেখে বেদনা-বোধ করেছিলেন। বলেছিলেন, দেখ, এটি সরকারী সাহায্য ভিন্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু পথটা দেখানো গেল, নিজের কাছেও এটি একটি পরীক্ষা।

১৯৫৩ সনের ৪ঠা সেপটেম্বর আমাদের বাড়িতে সকালে তাঁকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি কতদিন থেকে অভিনয় করছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি খুব খুশি হয়ে বলতে আরম্ভ করতেই আমি বললাম, তা হলে লিখে রাখি, মনে থাকবে না। তিনি বললেন, আমারও সব ঠিক ঠিক মনে নেই তবে যতটা মনে পড়ে বলছি।

আমি তাঁর কাছ থেকে যেমন শুনেছিলাম তেমনি পর পর লিখেছি। কতকগুলো বছরে তিনি কিছু করেছেন কিনা বলতে পারেন নি। হয় কিছু করেন নি, আর না হয় মনে নেই। যাই হোক, আমি যে তালিকাটি লিখে রেখেছিলাম তা এই—

১৯০৮, স্কটিশ চার্চে থার্ড ইয়ারে পড়বার সময় জুলিয়াস সীজারে ব্রুটাসের ভূমিকা।

১৯০৯, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কুরুক্ষেত্র নাটকে অভিমন্যু।

১৯০৯, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে হ্যামলেটে কিং গোষ্ট।

১৯০৯, স্কটিশে ম্যাকবেথ।

১৯১০ ইনস্টিটিউটে বুদ্ধদেব।

১৯১১, ইনস্টিটিউটে চাণক্য।

১৯১২, ইনস্টিটিউটে জনায় প্রবীর।

১৯১০-১২-র মধ্যে ল কলেজে পুনর্জন্ম নাটকে স্ত্রীভূমিকা—সৌদামিনী। স্ত্রীভূমিকায় একবারই নেমেছেন।

১৯১৩, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অশোক।

১৯১৪? ডালহৌসি ইনস্টিট্যুট, 'ম্যারিগোল্ড লীগ' নামক ক্লাবে চাণক্য। এটি গ্রাজুয়েটদের একটি শৌখিন সম্প্রদায়, এখানে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রযোজনা করেন শিশিরকুমার।

১৯১৪-১৫ রঘুবীর। (রাম চৌধুরী, ধীরেন দাস প্রভৃতি এতে অভিনয় করেছিলেন)।

১৯১৫, ইনস্টিটিউট, ভীষ্ম নাটকে পরশুরাম।

১৯১৬-১৭-১৮ কিছু করেন নি।

১৯১৭, "আওয়ার ডে" যুদ্ধের ফাণ্ডের জন্য ডালহৌসি ইনস্টিটিউটে একটি নাটকে অভিনয় করেন, কিন্তু তার নাম মনে নেই।

১৯২০, ইনস্টিটিউটে শেষ অভিনয় রঘুবীর।

১৯২১, ওল্ড ক্লাবে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে ভীম ও ব্রাহ্মণ।

১৯২১, আলমগীর।

১৯২২, ম্যাডানে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রঘুবীর। তারপর কিছুদিন বাদে।

১৯২৩, ইডেন গার্ডেনে দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা।

এই তালিকা থেকে বোঝা যায় অভিনয়ের ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের প্রেরণা সহজাত। এবং এমনও মনে হতে পারে যে, তিনি যে মাঝখানে কয়েক

বছর কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছিলেন সে বছরগুলি যেন তাঁর জীবনের একটা প্রক্ষিপ্ত অংশ। কিন্তু প্রকৃতই তা নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে আসতে যে বিদ্যা প্রয়োজন ছিল, তা লাভ করেছিলেন বলেই থিয়েটারের ভবিষ্যৎ খসড়া তৈরি করার ক্ষমতা জন্মেছিল তাঁর। এবং সে খসড়ায় অভিনয় শিক্ষার্থীর জন্য ব্যাপক শিক্ষার যে পরিকল্পনা ছিল সেও নিজে শিক্ষিত ছিলেন বলে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে পরিকল্পনায় কাজ হলে কলেজের শিক্ষার চেয়েও উদারতর শিক্ষা পেত অভিনয়ের ছাত্ররা।

আমি "দ্বিতীয় স্মৃতি" থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করছি—

"১৯৫২ সনের ২৯শে নবেম্বর তিনি একদিন বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলাপ করেছিলেন। রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রস্পেকটাস দেখিয়েছিলেন আমাকে। [১৯৫৩ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি তিনি পুনরায় এই প্রসপেকটাস আমাকে একখানি চিঠি সহ পাঠিয়েছিলেন। প্রসপেকটাস খানা Royal Academy of Dramatic Arts-এর।] সহজ পটুত্বের কথা হচ্ছিল। অভিনয় ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে একটি আর্ট, এবং আর্ট সম্পর্কে যার সহজ পটুত্ব আছে, সেই এতে কৃতিত্ব দেখাতে পারে, কিন্তু সে কৃতিত্ব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সভ্যজগতে এযুগে অভিনয় শিল্পী হতে হলে শিল্পীকে এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে হয়, জ্ঞান বাদ দিয়ে শুধু অভ্যাস নয়।"...

১৬-১-৫২-তে একদিন বললেন, "একটা কমিটি গঠন করতে হবে, তার উদ্দেশ্য হবে বাংলাদেশে নাটক ও নাট্যাভিনয় মিলিয়ে থিয়েটারের উন্নতিসাধন।...এর দুজন পৃষ্ঠপোষক থাকবেন, একজন থাকবেন প্রেসিডেন্ট ও একজন অ্যাসোসিয়েট মেম্বার। এঁরা সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপী বক্তৃতার ব্যবস্থা করবেন, শিক্ষায়তন এবং লাইব্রেরি গড়বেন। বাংলা উচ্চারণ শেখার বিশেষ ব্যবস্থা তার অন্তর্ভুক্ত হবে।..."

আমি বলেছি থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর এই উচ্চস্তরের পরিকল্পনা তিনি নিজে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন বলেই করা সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষার স্পৃহা তাঁরপ্রথম বয়স থেকেই এবং একথা পরে জানতে পেরেছি তাঁর অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ অমল মিত্রের একটি লেখা থেকে। তাঁর নিজ মুখেও অনেক শুনেছি। আমি নিজে শিশিরকুমারকে কখনো তাঁর পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোনো কথা জিজ্ঞাসা করি নি। একটিমাত্র ব্যাপার শুধু মনে আছে। আমি

যখন নবনির্মিত বিদ্যাসাগর হস্টেলের (১৯১৮, ১৭নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) একটি ঘরে বাস করি, সে সময় একটি দুঃস্থ ছাত্র আমাকে এসে বলে, সে শিশিরকুমারের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর কাছে কোনো সাহায্য চাইতে সে সাহস করে নি। তাই আমাদের কাছে তার ভিক্ষা। আমি তাকে প্রতি মাসে এক টাকা বা দু' টাকা যখন যা পারি দিতাম, অন্যেরাও কেউ কেউ দিতেন।

আমাদের আলাপ প্রধানত ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে। তাই শিশির প্রতিভার বাল্যকালে কোন্ পরিবেশে উন্মেষ হয়েছিল আজ তারও উত্তর খুঁজতে হল আমাকে অমল মিত্রের ("নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি ১৮৮৯-১৯৫৯" নামক হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের ৮-১০-৬১ তারিখের) প্রবন্ধে। শিশিরকুমার মেদিনীপুরে তাঁর মাতামহ কৃষ্ণকিশোর আচার্যের গৃহে ১৮৮৯ সনের ২রা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকেই প্রধানত তিনি বাল্যকালে সাহিত্যপ্রীতি লাভ করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণকিশোরের নিজের গ্রন্থসংগ্রহ হাতে পেয়েছিলেন বাল্যকালেই, এবং সেই সময়েই গ্রীক সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্য এবং অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর পিতা হরিদাস ভাদুড়ি ছিলেন রুরকি কলেজের পাসকরা এঞ্জিনিয়ার। তিনি ছিলেন দৃঢ় স্বভাবের লোক। কাজেই শিশিরকুমারের পাণ্ডিত্য এবং স্বাধীনতা-প্রিয়তার মনোভাব,—দুইয়েরই উৎসের খবর মিলে যাচ্ছে দুদিক থেকে।

আমি এই দুটি দিকই তাঁর চরিত্রে দেখলাম, এবং সবাই দেখেছেন।

আমি পূর্বে তাঁর অভিনয় জীবনের যে সব তারিখ দিয়েছি তা তাঁর মুখে বলা, তাঁর যেটুকু মনে ছিল তাই। এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়, এবং এর বাইরেও তাঁর অনেক কৃতিত্ব নিশ্চয় আছে, তা তাঁর জীবনী লেখকেরা দেবেন। ঐ তালিকায় দেখা যাবে, তিনি বলছেন ১৯২০ সনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে রঘুবীর, তাঁর শেষ অভিনয়। কিন্তু আমার নিজেরই দেখা আছে—সম্ভবত সেটি ১৯২৫ বা পরে—ঐ ইনস্টিটিউটে তিনি চন্দ্রগুপ্তের নির্বাচিত দৃশ্যে চাণক্যের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। মনে আছে এজন্য যে, স্টেজে অল্পদিন পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত দেখা ছিল। তাই যখন দেখলাম ইনস্টিটিউটের অভিনীত চাণক্য সম্পূর্ণ আর এক রকমের তখন তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এ কি করে সম্ভব হল?" কোন্ স্থানে তাঁর সঙ্গে কিভাবে দেখা হয়েছিল তা এখন আর মনে পড়ে না। কিন্তু একথা স্পষ্ট মনে আছে যে তিনি বলে-ছিলেন, "নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখি, কোনো চরিত্র অভিনয়ের আগে

ভাবতে হয় আরও ভাল করা যায় কি না। যতক্ষণ সুযোগ থাকে বদলাই।”

নির্বাচিত দৃশ্যের চাণক্য অভিনয়ে আত্রেয়ীকে ফিরে পাবার পর যে ভাবে চাণক্যরূপী শিশিরকুমার অতি-আনন্দ সহ্য করতে না পেরে উন্মাদের মতো ব্যবহার করেন, সে দিন দেখলাম সম্পূর্ণ আর এক ভাবের আর এক চাণক্য। এ চাণক্যের চাঞ্চল্য নেই, সমস্ত আবেগ, বিস্ময়, আনন্দ, কেমন একটা চাপা বেদনার মতো প্রকাশ পাচ্ছিল। এ চাণক্য অত্যন্ত সংযত। সমস্ত কথা যেন একটা অস্ফুট সুরে কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। যেন সবটাই স্বগতোক্তি—অন্য কাউকে শোনাবার জন্য নয়। এই চাণক্যকেও অদ্ভুত ভাল লেগেছিল, এবং মনে হয়েছিল অন্যটার চেয়ে বেশি কঠিন, বেশি চমকপ্রদ, এবং বেশি চিত্তহারী।

অল্পদিনের ব্যবধানে একই ভূমিকা সম্পূর্ণ দুই বিপরীত ভঙ্গিতে অভিনয় করতে হলে সেই ভূমিকা সম্পর্কে যে দুঃসাহসিক চিন্তা, কল্পনা, এবং তা অভিনয়ের প্রস্তুতি অভ্যাস করতে হয়, তা যে একমাত্র শিশিরকুমারেরই পক্ষে সম্ভব ছিল এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু সে কোন্ বছর, অনুমান করে ১৯২৫ লিখলাম। প্রকৃতই কোন্ বছর তা জোর করে বলতে পারছি না।

নিজের অভাবের কথা বিশেষ কিছু বলতেন না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত কোনো দুঃখের কথাই নয়। সবই থিয়েটার সংক্রান্ত। একদিন মাত্র (২৯-১১-৫২) আমাদের বাড়িতে এসেই, বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করলেন, “দু তিনজন পাওনাদার ঠেকিয়ে অশোক চটে গেছে তার বাবার উপর, আর তার বাবা যে সমস্ত জীবন পাওনাদার ঠেকিয়ে এলো।”

চরিত্রের দৃঢ়তার কথা বলছিলাম। তা প্রায় অনমনীয়তার কোঠায় গিয়ে পড়ে। তার নানা দৃষ্টান্ত তাঁর নানা সুহৃদের জানা আছে।

১৯৫৩ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সেখানে বক্তৃতা দেন। আবহাওয়া খারাপ ছিল, আকাশ মেঘে ঢাকা, ঝড়ো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। সেখান থেকে ফিরে এসে শুনলাম শিশিরকুমার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, তলব করেছেন। সেদিন আর যেতে পারি নি। পরদিন রাত্রি ৮-৩০-এর সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। এই সময় (তরিখ মনে নেই)

তিনি নৃত্যনাট্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমি থেকে ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন খবর বেরিয়েছে কাগজে। এই সংবাদে শিশিরকুমার প্রায় ক্ষিপ্ত। তাঁকে এ বিষয়ে আগে কিছুই জানানো হয় নি। এ বিষয়ে তিনি কাগজে একটি বিবৃতি দিতে চান। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, বিবৃতিটি আমি লিখে কাগজে দিয়ে দেব।

৩রা ফেব্রুয়ারি শিশিরকুমার বিকেলে আমার বাড়িতে এলেন। আমি বললাম, হেমেন্দ্রকুমার রায় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এখন একটু সুস্থ আছেন, চলুন তাঁকে দেখে আসা যাক। তিনি তাঁর অসুখের কথা শুনে দুঃখিত হলেন এবং বললেন চল। তাঁর গাড়িতে হেমেন্দ্রকুমারকে দেখতে গেলাম। তাঁকে বললাম বিবৃতি লিখছি, কাল দেখাব।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাত ৮-৩০-এর সময় শিশিরকুমারের সঙ্গে দেখা করে আমার ব্যবস্থিত লিখনটি দিলাম। তিনি পড়ে খুশি হলেন। নিজের ক্ষোভ অবিলম্বে পাঁচজনকে না জানাতে পারলে স্বস্তি নেই, তাই এত জরুরি ব্যবস্থা। কিন্তু আগের দিন তিনি যে আমাকে রয়্যাল অ্যাকাডেমির কাগজপত্র পাঠিয়েছিলেন, সেও এই ক্ষোভেরই অঙ্গ। অর্থাৎ সমস্ত নাট্য-আন্দোলন কিভাবে রূপায়িত করতে হবে তার জন্য তিনি যে বেশ কিছু-দিন ধরে চিন্তা করছিলেন, তা প্রচার হওয়া দরকার। সেইজন্যই ঐ কাগজপত্র আমাকে আগে পাঠিয়েছিলেন।

বিবৃতিটি ছাপার পর আমি আর তা উদ্ধার করতে পারি নি এতদিন প.র। পূর্বের রাখা কাগজ হারিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ১১ই ফেব্রুয়ারি বৈকালের দিকে একখানা চিঠি পেলাম লোকমারফৎ—শিশিরকুমার আমাকে লিখেছেন, "আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাতর, দেখা করলে খুশি হব।"—জ্বর সামান্য। আসলে ফেলোশিপের ব্যাপার নিয়ে আরও একটু উত্তেজিত হবার সুযোগ খুঁজছিলেন।

ইতিমধ্যে অ্যাকাডেমি থেকে তাঁর সনন্দ এসে গেছে, এবং তাকে তৎ-ক্ষণাৎ ঘাড় থেকে না নামিয়ে ফেলতে পারলে স্বস্তি নেই। ফেলোশিপ কিছুতে নেবেন না। উত্তেজিতভাবে প্রত্যাখ্যান পত্রটি এমনভাবে লিখেছেন যা 'ফর্ম্যাল' নয়। ভাষা রূঢ়। কিন্তু আমাকে দেখাবার পর আমি সে চিঠি তাঁকে পাঠাতে দিলাম না। বললাম আমি চিঠি তৈরির ভার নিচ্ছি। কিন্তু তার আগে ২৬শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩) লেখা তাঁর চিঠি পাই—

SRIRANGAM

2A Raja Rajkissen Street Phone : Barabazar 556

Calcutta.

বৃহস্পতিবার

পরিমল, রবিবার অভিনয়ের পর থেকে শরীর literally অপটু। তাই যেতে পারি নি। চিঠি ও জবাব তোমার পড়া হয় নি। একবার তুমি দেখে দিলে জবাব পাঠাবো।—একটু সময় করতে পারবে কি, কাজ থেকে ফেরবার পথে ?

তোমাদের

শিশিরকুমার

শিশিরকুমারের চিঠি বাতিল করে নতুন করে লিখে আমি তাঁকে দিয়েছিলাম দুই দিন পরে—২৮শে ফেব্রুয়ারি। সেদিন দোলযাত্রা।

খ্যাতিলাভের শস্তা মোহ আর ছিল না। এখন কেবল দেশের জন্য কিছু করে যাওয়ার বাসনা। সমস্ত মনপ্রাণ ভাবনাচিন্তা একমাত্র ঐ দিকে, —কি করে ন্যাশনাল থিয়েটার গড়া যায়।

খ্যাতি তিনি দেশে-বিদেশে পর্যাপ্ত পেয়েছেন। অ্যামেরিকায় প্রচুর পেয়েছিলেন যদিও সেখানে তাঁকে হাস্যাস্পদ করার জন্য একটা দলের চক্রান্ত ছিল। শিশিরকুমার আমাকে ছাপা কয়েকটি অ্যামেরিকান সমালোচনা দিয়েছিলেন, তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করি—কারণ এ জিনিসটি এখনকার কাল থেকে আড়ালে পড়ে যাচ্ছে একেবারে। এগুলি সবই ১৯৩১ জানুয়ারিতে প্রকাশিত।

দি নিউ ইয়র্ক সানের সমালোচক লিখছেন—

"The Hindu players made a very good impression. Their acting compares favourably with the acting of any foreign troupe I can think of, excepting of course the Moscow Art Theater players who to me at least are the best actors in the world..."

দি নিউ ইয়র্কের সমালোচক লিখছেন—

"Sisirkumar Bhaduri is an actor of the finest rank. Last night's play kept him in two contrasting moods—lyric and emotion. He seemed to excel in the latter, investing

some of his scenes with a poignancy that strongly moved his audience..."

দি ইভনিং ওয়ার্ল্ড' লিখছেন—

"So superb was their pantomime, so illustrative was a shrug of his shoulders, a flash of the eye, and the lifting of the hands or arms, that one could follow the story with little trouble.

"It was a treat to watch Sisirkumar Bhaduri as Rama. His voice was bell-like, his pantomime, which told the story as clearly to the audience which understood not a single word; was so perfect that the words anyway would have been unnecessary..."

এ ছাড়া দি ডেইলি নিউজ, দি ঈভনিং গ্র্যাফিক নামক পত্রিকাগুলিতেও অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়েছে। এর উপর যারা ভাষা বুঝেছে এবং শিশির-কুমারের রাম দেখেছে, সেই বাংলাদেশের লোকেরা কি পরিমাণ উন্মাদ হয়ে উঠেছিল সে কথা আগেই বলেছি।

শিশিরকুমারের পরিকল্পনায় যাঁরা যথার্থ সহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং শিশিরকুমার সত্যই যাঁদের উপর ভরসা করতে পারতেন, তাঁরা একে একে সবাই মারা গেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ এবং কিরণশঙ্কর রায় তাঁর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকে সেদিক থেকে নিঃসহায় ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন।

শেষ সুযোগ একটা এসেছিল বলে তাঁর মনে হয়েছিল, কিন্তু সেও মরীচিকা। বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে ১৯৫৩ সনের নবেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে একটি সভা হয়। সরকারের তরফ থেকে থিয়েটারের উন্নয়ন পরিকল্পনা আলোচিত হয় সেখানে। শিশিরকুমার নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন তার মধ্যে তাঁর স্থান হওয়া অসম্ভব, তাই তিনি আগেই চলে এসেছিলেন।

১৭ই নবেম্বর ১৯৫৩ তারিখে সকাল সাড়ে নটার সময় শিশিরকুমার বেশ উত্তেজিতভাবে আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। হাতে ঐ তারিখের একখানি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড। তিনি বললেন, সেই সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তা আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নয়—অথচ কাগজে

রিপোর্ট বেরিয়েছে, সে পরামর্শ সভায় আমিও নাকি ছিলাম। তারপর অনেক কথা বললেন, যা এখন আর বলে লাভ নেই।

এর প্রায় তিনমাস আগে (৪-৯-৫৩) আমাকে তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের একটি খবর বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক (কোন্ নাটক এবং কোন্ তারিখের কথা, এখন আমার মনে নেই।) শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করার আগে কবি তাঁকে বলেছিলেন, "দেখ শিশির, আমার অনেক শত্রু আছে, এবং তোমারও আছে। তুমি ভেবেচিন্তে আমার নাটক নিও, এবং একটু সতর্ক থেকো।"

এই কথাটির পুনরাবৃত্তি শুনেছিলাম ১৭ই নবেম্বর।

জাতীয় থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর নিজের যে পরিকল্পনা ছিল, তার ইংরেজী খসড়া আমাকে দিয়েছিলেন।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য তাঁর টাকার প্রয়োজন ছিল। ছিল বাংলার থিয়েটারকে একটা স্থায়ী ভিত্তির উপর জীবন্তরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তা সবার জন্য। যে কোনো শর্তে টাকা নেওয়ার হীনতা তাঁর চরিত্রে ছিল না। খ্যাতির মোহ ছিল না। তা দেখা গেল তাঁর ফেলোশিপ প্রত্যাখ্যানে, আর দেখা গেল তাঁর ১৯৫৯ সনের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'পদ্মভূষণ' খেতাব প্রত্যাখ্যানে। (পদ্মভূষণকে বলা চলে ইংরেজ আমলের রায় বাহাদুরের সমপর্যায়ের।)

শিশিরকুমারের এই খেতাব প্রত্যাখ্যান নিয়ে কোনো অভিসন্ধি প্রণোদিত একখানি সাময়িকপত্রে তাঁকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল। তখন তা দেখে বিচলিত এক বন্ধুর চিঠি পাই, চিঠিখানা ভাগলপুর থেকে লেখা। লেখক 'বনফুল'। আমি ১৯৫৯, ২৯শে মার্চ উক্ত চিঠি থেকে সেই পত্রিকার 'শ্রাদ্ধাংশ' বাদ দিয়ে শিল্পীর প্রতি বনফুলের শ্রদ্ধাংশটুকু প্রকাশ করছি। সেই অংশটুকু এই—

> "নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি মহাশয় 'পদ্মভূষণ' ত্যাগ করে আত্ম-সম্মানী শিল্পীমাত্রেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। এ বিষয়ে ইতস্ততঃতে (২২-২-৫৯) শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের লেখার উদ্ধৃতি অনবদ্য। মাসিক বসুমতীতে এ বিষয়ে যে ক্ষুদ্র নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তার লেখককেও আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম! তিনি আমাদের প্রাণের কথাই বলেছেন। ঈর্ষাবিষে জর্জরিত দু' একজন ব্যক্তি ভাদুড়ি মহাশয়ের এই শিল্পীজনোচিত ব্যবহারের যে কুৎসিত ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে আশ্চর্য

হবার কিছুই নেই। এই দেশের মাটিতেই মীরজাফর উমিচাঁদের জন্ম হয়েছিল। আমার বিশ্বাস তাদের পুনর্জন্ম হয়েছে। ভগবান হয় তো তাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু লাঞ্ছিত অপমানিত বাঙালীরা করবে কি ?"

এই চিঠিতে ইতশ্চেতঃতে পুনর্মুদ্রিত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের লেখার যে উল্লেখ আছে সেই লেখাটুকু এইখানে উদ্ধৃত করছি—

"রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যদি দেখা হত বলতাম, সার, আপনি যে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেছেন, শিশিরবাবু তিনশ বৎসর পূর্বেকার সেই দিল্লীর সিংহাসনে বাদশাহ আলমগীর হয়ে কত রাত্রি অভিনয় করেছেন! কত বীরত্বব্যঞ্জক ভাষায় বক্তৃতা করে কত করতালি সহ প্রশংসা অর্জন করেছেন। সে বোধ হয় ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ব্যাপার। তারও আগেকার ত্রেতা যুগের সীতাপতি রামচন্দ্রের ভূমিকায় যে অভিনয় করেছেন তার তুলনা নেই। আমাদের গ্রামে কুবেরের অভিনয় করা যাত্রার দলের অভিনেতার মত ছয় পয়সার মুড়ি আজও বাঁধেন নি। স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে উপাধি বর্জন বা পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান খুব দোষের হবে কি ? (জঙ্গিপুর সংবাদ, ৪-২-৫৯)

ব্যক্তিগত পরিচয়, বন্ধুত্ব, বা স্বার্থ ভুলে গিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাবার মতো মনোবল আছে এমন মানুষের সংখ্যা কম হলেও আছে, সে জন্য ভাল লেগেছিল এসব লেখা।

শিশিরকুমারের জাতীয় নাট্য-প্রতিষ্ঠান বিষয়ে পরিকল্পনা আগে উদ্ধৃত করেছি। তিনি এ বিষয়ে মস্ত বড় আশা পোষণ করতেন। সেই প্রতিষ্ঠানে যে লাইব্রেরি থাকবে তাতে ইংরেজী বই কি কি থাকবে তার তালিকা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। সে তালিকাটি আমি এখানে ছেপে দিচ্ছি, এ থেকে বোঝা যাবে জাতীয় থিয়েটার বিষয়ে তিনি কতখানি চিন্তা করেছিলেন।

1. Shaw—Dramatic Opinion and Essays (Later Victorian Theatre)

2. P. P. Howe—Criticism (Martin Sullar)

3. Ashley Dukes—Youngest Drama (Benn)

4. Granville Barker—The Exemplary Theatre

5. William Archer—The Old Drama and the New (Heinemann)

6. St. John Irvine—The Organised Theatre (Allen and Unwin)

7. R. Balmforth—The Ethical and Religious Value of Drama (Allen and Unwin)

8. John Drinkwater—The Gentle Art of Theatre-going

9. Malcolm Morley—The Theatre (Pitman)

10. L. A. G. Strong—Commonsense about Drama (Nelson)

11. Norman Marshall—Other Theatre

12. Eric Bentley—Modern Theatre

13. J C. Trewin—The English Theatre

14. W. A. Darlington—The Actor and his Audience. (Phoenix House)

শিশিরকুমারের আশাভরা পরিকল্পনার কথা এইভাবে প্রকাশ করা গেল।

তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আমার যেটুকু মনে হয়েছে তাতে সহজেই এ সিদ্ধান্ত করা চলে যে, তিনি কোনো অসম্মানজনক শর্তে কোনো আকর থেকেই টাকা নিতে পারতেন না। অসম্মানের চেয়ে দারিদ্র্য কঠোর নয়। যে কোনো সম্প্রদায়ে বেতনভুক অভিনেতারূপে যোগ দিয়ে অন্যের পরিচালনায় অভিনয় করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি তা করতে পারেন ন। বিদেশ থেকে দুবার নিমন্ত্রণ এসেছিল, কিন্তু বিদেশী সরকারের টাকায় ভ্রমণ প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, যদি কখনো নিজের টাকায় পারি ভ্রমণ করব। এই সব ছোটখাটো ঘটনা থেকেই তাঁর শিল্পচরিত্রের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯৫৪ সনে মাসিক বসুমতীতে "আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি" নামক একটি ছোট্ট রচনা লিখেছিলাম। রচনার শেষের দিকে তাঁর সাম্প্রতিক অনেক কিছু ভুলে যাওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়েছিল। শেষ কয়েকটি লাইনে লিখেছিলাম—"১১ই সেপটেম্বর এই প্রবন্ধ লিখছি। গতকাল শিশিরকুমার এসেছিলেন আমার কাছে। যাবার সময় দরজার বাইরে গিয়ে বললেন, "লাঠি এনেছিলাম কি?"—তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, "না, স্পষ্ট মনে আছে, আনি নি।"

"তাঁকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি তাঁর লাঠিখানা আমার ঘরে পড়ে আছে।"

এই লেখাটি প্রকাশ হওয়ার পরে শিশিরকুমার আমার ঘরে একদিন প্রবেশ করেই হেসে বললেন, "পরিমল, আমার সম্পর্কে তোমার লেখা বৃথা হয়েছে—সবাই ঐ লাঠি ভুলে যাওয়ার কথাই বলছে। বুঝলে, লোকে সীরিয়স কথা পড়ে না। মজার কথা শুনতে চায়।" আমি বলেছিলাম "ঠিক তার উল্টো। খুব সীরিয়াস কথা বললে তবু কিছু কাজ হয়, সত্য কথা সরস করে বললে বাঙালী তা গ্রাহ্য করে না।"



ইন্দু কর্তৃক 'জাহান্দার শা'র মেক-আপ দৃশ্য

ছোটখাটো অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কোনো জিনিসই বেশিদিন একভাবে চলে না। ১৯৫৬ সনে শিশিরকুমারকে মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হল, তিনি টাকার চেয়ে সম্মানরক্ষার আদর্শই শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন, এ জন্য তিনি আমার মনে অসাধারণ বাঙালী রূপে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমি তাঁকে কাছের দৃষ্টিতে দেখেছি, এবং সে জন্যই হয় তো তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য আমাকে বিচার করে আবিষ্কার করতে হয় নি, প্রতিদিন অনুভব করে বুঝতে পেরেছি।

তিনি যে আমাকে কত স্নেহ করতেন তার প্রমাণ, আমার অনুরোধে

তিনি আমার জন্য নানা ভূমিকার সাজ পরে ক্যামেরায় 'পোজ' দিয়েছেন। সকালে তাঁর মেক-আপ ম্যান ইন্দুকে আসতে বলতেন মাঝে মাঝে। এভাবে তাঁর শাজাহান, রাসবিহারী, রায় বাহাদুর, যোগেশ, চাণক্য, চন্দ্রবাবু, বিপ্রদাস বেশে ফোটোগ্রাফ তুলেছি। বাড়িতে সাধারণভাবে অনেক তুলেছি। আলমগীর তুলেছি গ্রীনরুমে অভিনয়ের আগে। জাহান্দার শা তুলেছি স্টেজের আলোয়। এ সবই ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩-র মধ্যে। অনেক ফোটোগ্রাফ তিনি চোখেও দেখেন নি, দেখতে চানও নি। এ শুধুই আমার খেয়াল চরিতার্থতা করা। তিনি খুশি মনে, কষ্ট স্বীকার করেও আমার জন্য এত গুলো সিটিং দিয়েছেন।

২-৬-৬৬

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

১৮৯০—১৯৬৪

সংসারে এক এক সময় এমন এক একটি মানুষের দেখা মেলে, যে মানুষ সহজেই সবার দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন, এবং সেজন্য তাঁকে না দেখে উপায় থাকে না। এবং এটাও শেষ কথা নয়, কারণ এর উপরে আরও একটা গুণের পরিচয় পাওয়া যায় কোনো কোনো মানুষের মধ্যে—সে হচ্ছে তাঁদের আকর্ষণের ক্ষমতা। সে আকর্ষণের প্রভাব এড়ানো শক্ত। একটুখানি পরিচয়েই তা প্রবল ভাবে টানতে থাকে, তখন হঠাৎ যেন তাঁদের মাথা গড-মানুষ থেকে অনেক উর্ধ্বে উঠে যায়। একমাত্র একেই বোধ হয় বলা যায় 'পারসোনাল ম্যাগ্‌নেটিজম।' এই ম্যাগ্‌নেটিজম বা চৌম্বক ধর্মকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। এর মূলে অন্তত দুটি জিনিস থাকতে পারে, স্নেহভালবাসা অথবা অসাধারণ কৃতিগৌরব। দুইই টানে।

আমার দেখা পর্যায়ে এই দুই জাতীয় ব্যক্তিই আছেন। কারো মধ্যে একটা প্রবল, কারো মধ্যে অন্যটা প্রবল। আমাকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাউকে আবিষ্কার করতে হয়নি, সে ক্ষমতা আমার নেই। যাঁরা প্রকৃত কথাশিল্পী, তাঁদের আছে সে ক্ষমতা। আমার কাছে যাঁরা নিজগুণে প্রকাশিত হয়েছেন, শুধু তাঁদেরই আমি দেখেছি। বিচিত্র লোকের হাটে ঠেলাঠেলি করে প্রবেশ করিনি, তবু যা দেখেছি, তা বিচিত্র। এবং 'বিচিত্র লোক' নামক গ্রন্থের লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও আমার সীমাবদ্ধ দেখার ক্ষেত্রে অন্যতম এক বিস্ময়কর মানুষ। এমন বিচিত্র জীবন আমার মতে অন্তত এদেশে একান্তই দুর্লভ।

আমি প্রথমেই এঁর বাল্যজীবনকে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের বিপরীত দিকে একটুখানি তুলে ধরছি। আশা কবি কথাটা শোনামাত্র আমাকে কেউ তাড়া করে আসবেন না।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ শৈশবে ভৃত্যদের অধীন ছিলেন, এবং সে অধীনতা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ঘরে নানা শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ, এবং পিতার সঙ্গে প্রথম বাইরে গিয়ে প্রকৃতির প্রভাব অনুভব, করেন। এটি তাঁর উন্মুক্ত প্রকৃতির হাতের প্রথম পাঠ। বাল্যকালে দক্ষ বেতনভুক অভিভাবক তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন।

কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের বাল্যকালে নিষ্ঠুর পিতার তাড়নায় মন বিগড়ে যায়। তখন থেকেই তিনি কারো কোনো অধীনতা মেনে নেননি, যেখানে সেখানে মারামারিতে যোগ দিয়েছেন। পিতার হাতে বিনা প্রতিবাদে নির্মমভাবে শুধু মার খেয়েছেন। তারপর প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের মতো স্নেহচ্ছায়ায় নয়, একেবারে বিমুখ প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা কেড়ে নেওয়া। বিদেশের কৃপণ পরিবেশে পথে বন্যজন্তুর আসন্ন আক্রমণের ভয় অগ্রাহ্য করে শুয়ে থাকা, অথবা বম্বাইয়ের মতো শহরের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং অপরিচিত পরিবেশে, অগণিত ভিখারীর সঙ্গে, কাড়াকাড়ি করে পথের পাশে তাদের কাছ থেকে একটুখানি রাত কাটানোর মতো স্থান আদায় করে নেওয়া—নিঃসম্বল নিঃসহায় বালক, দুজন সমধর্মী বালকের সঙ্গে বাইরের প্রচণ্ড শীতে ঝড়বৃষ্টিতে ভিজে পথ চলা—এই তো তাঁর প্রকৃতির কাছ থেকে হাতেকলমে শিক্ষা। এক স্থান থেকে তাড়া খেয়ে অন্য স্থানে, এবং সেখান থেকে তাড়া খেয়ে আর এক স্থানে। অর্থাৎ এ প্রকৃতি বাইরের যতটা, ততটা অন্তরের। একবার ভাগ্যের স্রোতে ভেসেছেন, আবার পরমুহূর্তে কূল পেয়ে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমাঙ্কুর দুজনেই স্কুল-পালানো ছেলে। এবং দুজনের শিক্ষাই (বৈপরীত্য যতই থাক) স্কুলের শিক্ষার বাইরে। নিজের জ্ঞান-তৃষ্ণার উগ্রতা থেকে যা কিছু আত্তীকরণ, আত্মস্থকরণ। রবীন্দ্রনাথ কর্ম-বিমুখ আলস্যপ্রিয় আড্ডাধারী বাঙালীকে দেখে গভীর ক্ষোভে কল্পনা করেছেন, "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।" কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের জীবনে এই "যদি" ছিল না, তিনি নিজে আরব বেদুইন হয়েছিলেন, বাঙালী-সুলভ সকল আরাম বিসর্জন দিয়ে।

দুজনের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য—অর্থাৎ দুজনের জীবনপথের মধ্যে। মানসিক আরাম অবশ্য রবীন্দ্রনাথও পাননি, তা পেলে তাঁর কাব্যজীবনের অনেকখানিই ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু প্রেমাঙ্কুর দৈহিক আরাম সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে মনের আরাম পেয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে তিনি নীরব। অন্তত এত সংযত যে, এদিক থেকে তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ করা শক্ত। কারণ তিনি তাঁর মহাস্থবির জাতকে নিজের বাল্যজীবন যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। তা প্রায় নিরপেক্ষ দৃষ্টি। নিজে আবেগপ্রবণ, অথচ প্রকাশে কোথাও আবেগ নেই, বরং সবচেয়ে দুঃখের দিনগুলির কথা তিনি হাসতে হাসতেই বর্ণনা করেছেন। নিজের জীবনকে এমন অকপটে বর্ণনা

করা, অথচ তাকে কোনোমতেই "কনফেশন্‌স্‌"-এর পর্যায়ে ফেলা যায় না, এও এক আশ্চর্য সৃষ্টি। কোথাও জীবনের কোনো কাজের জন্য অনুতাপ নেই!

ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে খেয়ে আপন ভাগ্য গড়তে গড়তে যাওয়ার দৃষ্টান্ত সংসারে অনেক মিলবে, কিন্তু ঘরের মায়া স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে বাংলা-দেশের কোনো স্কুলের বালকের পক্ষে দূর অপরিচিত রাজ্যে গিয়ে দিনের পর দিন পরস্পরবিরোধী, অনভ্যস্ত, এবং অরুচিকর বৃত্তি গ্রহণ করতে করতে চলার দৃষ্টান্ত (তাঁর দু'তিনজন সমধর্মী বালক সঙ্গী সহ) বাংলাদেশের আর কোনো ছেলে দেখিয়েছে কিনা সন্দেহ। একমাত্র কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের কথা মনে পড়ে।

এই বাল্যজীবনে বহু প্রতিকূলতার হাতে মার খেয়েও প্রেমাঙ্কুর একটি জিনিসকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—সেটি তাঁর শিল্পী মন। এরকম অনেকের ক্ষেত্রেই হয় না। অনেক প্রতিভা বাইরের আঘাতে নষ্ট হয়ে যায়, সমস্ত দিন না খেয়ে উপ-নিয়োগকর্তাকে দু আনার মধ্যে দু পয়সা কমিশন দিয়ে ছয় পয়সা মজুরিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে আগাছা নিড়ানো ও ঘাস কাটার কাজ করেও, অথবা শত শত ভিখারীর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে পথে একটুখানি রাত কাটানোর মতো জায়গা দখল করার পরেও, শিল্পপ্রতিভা অক্ষুণ্ণ রাখা খুব সহজ নয়। তা ছাড়া কবির ভাষায় 'দারিদ্র্যদোষোগুণ-রাশিনাশী'—এ কথাও তো সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। প্রেমাঙ্কুরের ক্ষেত্রে গুণরাশি নষ্ট হয়নি। তবে এমনও মনে হয় ভাগ্যের হাতে এমন মার না খেলে তাঁর প্রতিভা হয় তো আরও বেশি স্ফুরিত হতে পারত। কিন্তু এও আমার অনুমান মাত্র। যা হয়েছে অন্যভাবে তার অন্য কি চেহারা হতে পারত, তা হিসাবের বাইরে। এবং যা হয়েছে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের অন্ত নেই।

বাল্যকাল থেকেই প্রেমাঙ্কুরের বেদুইন জীবন। কোনো কবি, কোনো বাঙালী স্কুলের ছাত্রের এমন অবিশ্বাস্য রকমের ভয়ঙ্কর এবং দুঃসাহসিক ভবঘুরে জীবনের কথা কল্পনাও করতে পারবেন না। শুধু বাড়ি থেকে দূরে পালাবার উৎসাহে এবং প্রতিমুহূর্তে শত রকমের অনিশ্চয়তা এবং বিপদ-সঙ্কুল জীবনের আকর্ষণে কোনো বালকের পক্ষে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত—কখনও বিনা টিকিটে, কখনো পায়ে হেঁটে, ঘুরে বেড়ানোর দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে আর নেই। তাঁর এই জাতীয় চমকপ্রদ

কাহিনীগুলি পুনরুক্তি হওয়া সত্ত্বেও বার বার বলতে ইচ্ছা হয়। অনাহারে, ছিন্নবস্ত্রে, শুধু ভবিষ্যতে একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবে এ বিষয়ে মিক'বারের চেয়েও এক অদম্য আশা বুকে নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত মাটিতে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ঝড়ঝঞ্ঝাকে বুকে ঠেলে, কখনো বা অগ্নিবর্ষী সূর্যতাপে, বিমুখ দরজায় একের পর এক ঘা মেরে যে-কোনো কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি, সমধর্মীদের সঙ্গে। কখনো আকস্মিকভাবে আশাতীত সৌভাগ্যলাভ, এবং পরক্ষণেই তা থেকে বঞ্চিত হয়ে কখনো পথে, কখনো ধরমশালায়, কখনো গুণ্ডার ছুরির ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত হবার আশঙ্কায়, কখনো রাজার বন্ধু হয়ে, কখনো তিনজনে ছপয়সা ভাড়াকে দরকষাকষি করে তিন পয়সায় রফা করে ভাঙা ঘরে রাতের পর রাত কাটানো। কখনো ধনীর ঘরে ঝাড়ুদারের কাজ করে, কখনো নবাবগৃহে গৃহশিক্ষক হয়ে, পরক্ষণেই পথে নামা।—কিন্তু শুধু কি তাই? এরকম অনেক অনেক কাহিনী।

ঘরের কি পরিমাণ নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচার জন্য এমন জীবনকেও মুক্তি মনে করা সম্ভব, তার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি। এটি পিতার নিষ্ঠুরতার নমুনা—

> "দশ-পনরোজন প্রতিবেশী সদর দরজা ভেঙে সন্ধ্যেবেলা যখন আমাদের দুই ভাইকে বাবার হাত থেকে উদ্ধার করলে, তখন আমি অর্ধমৃত, [ভাইয়ের] মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত উঠছে।" (মহাস্থবির জাতক, প্রথম পর্ব)

যখন তখন ঠিক এই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বার বার শাসনকারী নিষ্ঠুর পিতার হাতের নির্মম আঘাতে পিষ্ট, জর্জরিত দেহমনের পক্ষে তবু যেন এই ভবঘুরে জীবনের দুঃখ বরণ একটা মস্ত বড় মুক্তি। কারণ এ দুঃখ ভোগে তাঁর স্বাধীনতা ছিল।

এই অত্যাচারের জন্যই প্রেমাঙ্কুর সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন ঠিক করে ফেলেছিলেন। এ কাজে স্কুলের সঙ্গীও জুটেছিল, কিন্তু প্রথমবারের সন্ন্যাস-যাত্রাটি একটি গাধার অভাবে পণ্ড হয়ে গেল। সন্ন্যাসজীবনের মোট বইবার জন্য একটি গাধার দরকার ছিল।

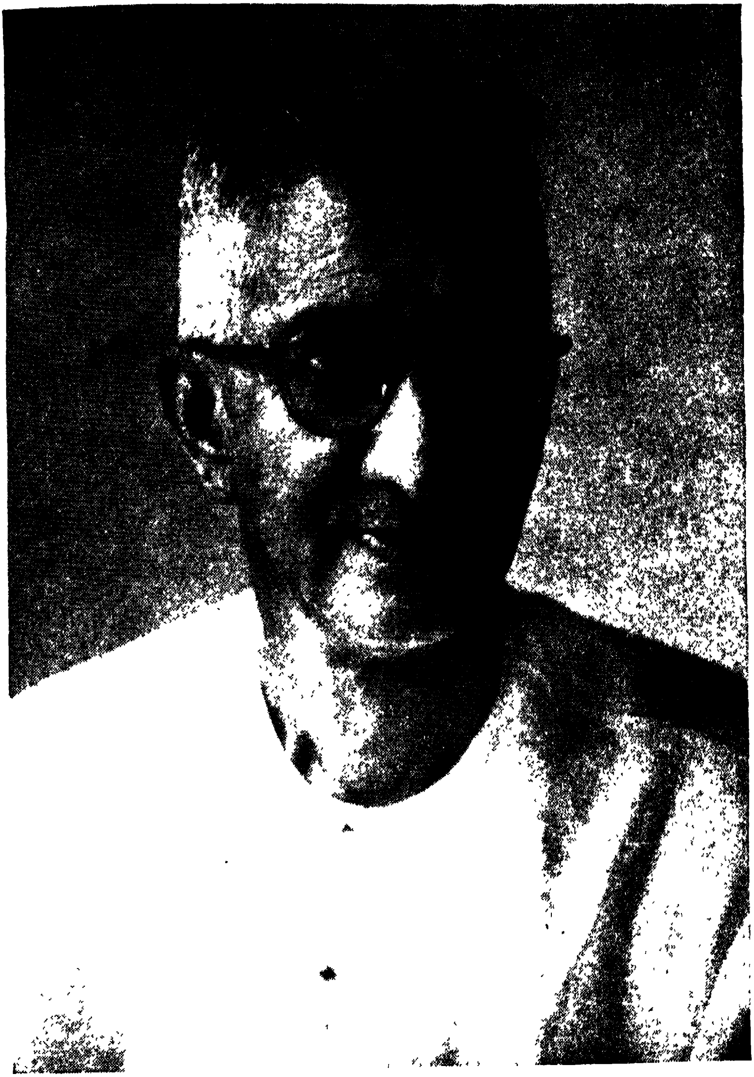
মনে পড়ে কবি কোলরিজের বাল্যকালের কথা। তিনিও বালককালে দেশান্তরে যেতে চেয়েছিলেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সমাজকে পুনর্গঠন করা। পরবর্তী যুগের কবি রবার্ট সাদির সঙ্গে পরামর্শ হয়েছিল, তাঁরা কয়েকজন বালক অ্যামেরিকায় পালিয়ে

গিয়ে কোনো অরণ্য প্রদেশ আশ্রয় করবেন, এবং সেখানে এক নতুন সমাজ গড়বেন—যার নাম হবে প্যান্‌টিসোক্রাসি। কিন্তু তাঁদেরও এই মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল আমেরিকায় যাবার খরচের অভাবে।

প্রেমাঙ্কুর কিশোর বয়সে এক প্রতিবেশী সত্তর বছরের বৃদ্ধকে আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর কাছে শেলীর কাব্যের প্রথম পাঠ গ্রহণ। তাঁকে সবাই পাগলাসন্ন্যাসী বলে ডাকত। ঘরে প্রচুর বই, গাঁজা টানতেন (পরে তিনি তাঁর সন্ন্যাসী-পুত্রের কাছে মদ খাওয়াও শিখেছিলেন) এবং প্রেমাঙ্কুর আর তাঁর ভাইকে কাব্যের স্বাদ দিতেন। ঐ কিশোর বয়সেই 'অ্যালাস্টর'-এর ভাল ভাল কাব্যাংশগুলি মুখস্থ হয়ে গেল এবং তার ভাবার্থ মনে গাঁথা পড়ল। ইতিমধ্যে বাইরের অনেক বিষয়ের বই পড়ে তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। ঠিক কোলরিজের মতোই। কোলরিজ স্কুলজীবনে মদ্যপান শুরু করেন, প্রেমাঙ্কুরকেও ঐ পাগলাসন্ন্যাসী পানে দীক্ষা দেন। কোলরিজ আর একটু বেশি বয়সে আফিঙ খেতে শেখেন, প্রেমাঙ্কুর এক মহিলার কাছ থেকে ভাং খেতে শেখেন, ও পরে এক ছাগলওয়ালার কাছে গাঁজা খান। কোলরিজ (ও রবার্ট সাদি) প্যান্‌টিসোক্রাসি স্থাপনের পূর্বে দুটি বোনকে বিয়ে করেছিলেন, প্রেমাঙ্কুরও স্কুলজীবনে একটি মেয়েকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেছিলেন। অবশ্য কোলরিজের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বমানবের হিতসাধন, আর প্রেমাঙ্কুরের উদ্দেশ্য ছিল স্বপদনির্ভরতা। প্রথম জনের আমেরিকায় পালাবার কল্পনার পিছনে বাইরের কোনো চাপ ছিল না, প্রেমাঙ্কুরের দেশত্যাগ ছিল প্রাণের দায়ে। কিন্তু তবু সন্দেহ থাকে—শুধুই কি তাই?

কোলরিজ বাল্যকালে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে এমন আত্মহারা হয়েছিলেন যে সে এক কাহিনী। কিশোর কোলরিজ একদিন লণ্ডনের পথে স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় চলছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—"এই! বাচ্চা চোর, কি হচ্ছে?" এই রূঢ় সম্বোধনে কোলরিজের মধুর স্বপ্ন ভেঙে গেল। তিনি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনার পকেটে আমার দৈবাৎ হাত লেগে গেছে, ইচ্ছে করে লাগাইনি। আমি কল্পনা করছিলাম আমি লিয়েণ্ডার, হেলেসপণ্টে সাঁতার কাটছি।" [লিয়েণ্ডার তার প্রেমিকা হেরোর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হেলেসপণ্ট নামক একটি তিন-চার মাইল প্রশস্ত প্রণালী প্রতি রাত্রে সাঁতার কেটে পার হয়ে যেত। এই প্রণালীর বর্তমান নাম ডার্ডানেল্‌স।]

একটি বালকের পক্ষে কল্পনায় লিয়েণ্ডার হয়ে রাজপথে সাঁতার কাটার



প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৫৩

ভঙ্গিতে চলা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ, এবং কোলরিজের পক্ষেই তা বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ। প্রেমাঙ্কুর তাঁর কিশোর বয়সে পাগলাসন্ন্যাসীর কাছে অ্যালাস্টর ও তার ব্যাখ্যা শুনে কি পরিমাণ মুগ্ধ হয়েছিলেন তা তাঁর ভাষাতেই বলি—

> "কবিতার ভাষা বোঝবার মত বিদ্যা আমাদের ছিল না। শুধু ধ্বনি ও সুর মনের মধ্যে একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। চোখের সামনে যেন দেখতে লাগলুম অ্যালাস্টরের কবি চলেছে দূরে, সুদূরে—তার অন্তরে যে চেতনা জেগেছে তারই সন্ধানে। চলেছে, চলেছে,—কত দেশ, কত মেয়ে এল তার জীবনে, তবুও সে চলেছে বিরামবিহীন। চলতে চলতে জরায় তার দেহ শুকিয়ে গেল। অমন যে সুন্দর কিশোর, তাকে দেখলে তখন ভয় হয়, চেনা যায় না। তার বুকের মধ্যে যে অতৃপ্তি, দুর্লভকে লাভ করবার যে পিপাসা, তারই আগুন শুধু দুই চোখে ধক ধক করে জ্বলছে"।··· (মহাস্থবির জাতক, ১ম পর্ব)

কে জানে হয় তো বা এই কবিতা তাঁর জীবনে দৈবাৎ প্রভাব বিস্তার করে তাঁর অবচেতন মনে তাঁকে ঘর ছাড়ার প্রেরণা দিয়েছিল। এই চলা তাঁর চলার সঙ্গে যে অনেকখানি মেলে। কিন্তু অ্যালাস্টরের নায়কের সঙ্গে প্রেমাঙ্কুরের সর্বৈব মিল নেই। মানবজীবনের অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে আদর্শ বা কল্পনার বিদ্রোহ, অ্যালাস্টরের মূল কথা। কিন্তু এর নায়কের পথ চলার সঙ্গে প্রেমাঙ্কুরের পথ চলার মিল আছে। প্রেমাঙ্কুর স্বেচ্ছাবৃত দুঃখময় জীবনকে মেনে নিয়েছিলেন, সেজন্য মন তাঁর বিদ্রোহ করেনি। বিদ্রোহ করেছিল চাপানো দুঃখের বিরুদ্ধে।

কিন্তু বহু ব্যর্থতা ও কল্পনাতীত দুর্ভোগকে বুকে নিয়ে প্রতিদিনের প্রতিকূলতার আঘাত বার বার দু হাতে ঠেলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর লক্ষ্য স্থির রাখার এই শক্তি কোথা থেকে এলো? এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এবং অদৃশ্য এক শক্তি বারংবার তাঁকে দূর দেশ থেকে স্বগৃহে এনে ফেলেছে, কিন্তু বাঁধতে পারেনি। আবার তিনি ছুটে গেছেন সেই জীবনে, যে জীবনে চরম দুঃখ আছে, কিন্তু বন্ধন নেই। পরাভোগ আছে, কিন্তু পরাজয় নেই।

এ সব কথা তাঁর মুখে অনেকবার শুনেছি, মহাস্থবির জাতকের তিন খণ্ডে পড়েছি, এবং এখনও যে খণ্ড ছাপা হয়নি, তাও পড়েছি। এই বালক-আরব বেদুইনের বা এই স্ট্রীট অ্যারাবের বাস্তব জীবনকথা আরব্য উপন্যাসের কল্পনাকে হার মানায়। শুমস রথেসুখঃদু পালাক্রমিক আবর্তনের মধ্যে,

অবিরাম ঘূর্ণনের মধ্যেও এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এ এক আশ্চর্য মনস্তত্ত্ব।

বাড়ি থেকে পলায়নের খবর তাঁর আগ্রা শহরের অজ্ঞাতবাসে এসে পৌঁছলে সেখান থেকে ভরতপুর পালিয়ে যাবার সময়কার মনের ভাব তাঁর লেখা থেকেই একটুখানি উদ্ধৃত করি—

> "শেষ রাত্রের শীতে আগ্রা নগরী তখনও সুষুপ্তির কোলে পড়ে স্বপ্ন দেখছে, চারিদিক ঘন কুয়াশার জালে আচ্ছন্ন—সেই কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা তিনজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।... জামা কাপড়, বালিশ, শতরঞ্চি ইত্যাদি নিয়ে তিনটি বোঁচকা তিনজনের কাঁধে ঝুলছে।... চল্—চল্, পালা—পালা—পূর্বজন্মের কোন্ খাতক কোথায় আত্ম-গোপন ক'রে আছে, তার কাছ থেকে যতখানি আদায় ক'রে নিতে পারা যায়। কোন্ জন্মের কোন্ মাতৃঋণে বাঁধা আছি, কোন্ নারীর সঙ্গে—কোন্ ভাই, কোন্ দাদা কোন্ বোন কে কোথায় ছড়িয়ে আছে কে জানে, সে বন্ধন অক্ষয়। দৌড়—দৌড়—দৌড়—কোথায় কোন্ সন্তান-শোক-বিধুরা জননী গভীর নিশীথে ব'সে অশ্রুমোচন করছে তার সঙ্গে অশ্রু মেলাতে হবে, চল্—চল্—এরই মধ্যে ধরা পড়লে চলে? জানি, নিশ্চয় জানি, আমার ভাগ্যাকাশে আজ যে মেঘসঞ্চার হয়েছে, সৌভাগ্যের অরুণোদয়ে কালই তা অপসারিত হবে। কন্টকময় অন্ধকার বিপদসঙ্কুল পন্থ বালারুণরশ্মিপাতে আবার ঝলমল করে উঠবে, ভবিষ্যতের আকাশে দিগ্‌বধূরা রামধনুর রঙের ওড়না উড়িয়ে আবার হোরি খেলায় মেতে উঠবে, আবার অতর্কিতে যতদিন না অশনি এসে পড়ে। পালা—পালা—দৌড—দৌড়। অন্ধকারে কখনও মনে হয়, পুলিসে তাড়া করেছে—দূর কোন্ গৃহস্থের ঘরের প্রদীপ আমাদেরই মনের আশার মতন কখনও জ্বলছে, কখনও নিবছে।—"...

এই যে ছুটে চলার বর্ণনার মধ্যে এতগুলি ভয়ের এক একটা বিন্দুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া, এর কোনোটাই কাল্পনিক নয়। কয়েক দিনের জীবনে যে-যে ভয়ের কারণ, বা অভিজ্ঞতা, বা যে-সব সুখের যোগাযোগ ঘটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তির কাল্পনিক ভয়ের কথা ওগুলো। অর্থাৎ যা-সব ছেড়ে এলাম, আবার কি তাই ঘটবে?—তবে পালা—পালা।

এ যে সমস্ত মায়াময়, চলমান, ধাবমান রূপের মধ্যে, কালের মধ্যে, নিজেকে নিক্ষেপ করে সবার সঙ্গে ছুটে চলা।

একটি ঘরছাড়া বাঙালী স্কুলের ছেলের কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রেমাঙ্কুর বিচিত্র মানব সংসারের, আর চরিত্রের, স্তরের পর স্তর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছেন। এতগুলি স্তর একজন পরিণত মানুষের পক্ষে কল্পনাতেও দেখা সম্ভব নয়। অথচ একটি বালকের জীবনে তা দেখা হয়ে গেল! শত স্তরের দুচারটে আমরা বাইরে থেকে দেখি, কেউ বা কিছু বেশি দেখেন ও আরও কিছু বেশি কল্পনায় গড়ে নেন, কেউ বা অভিজ্ঞতা দিয়ে আরও বেশি দেখেন। কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের মতো এত বেশি স্তরের সঙ্গে সহজে কোনো বাঙালীর ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের সঙ্গে হয় তো অনেকটা মিলবে। কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের অভিজ্ঞতা তাঁকেও হার মানিয়েছে। সবভারতীয় "লোয়ার ডেপথ্‌স্‌"-এর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় অবশ্যই দুর্লভ। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্তরের সঙ্গে এই অঙ্গাঙ্গি পরিচয়ের তুলনা হয় না।

আমার সবচেয়ে বিস্ময়কর বোধ হয় এই ভেবে যে, কোনো অভাজনের প্রতিই তিনি ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করেননি। কাউকে নিজের কোনো আদর্শ বা নীতিবোধের সাহায্যে বিচার করেননি। যখন ভিখারীদের অত্যন্ত অভদ্র এবং নোংরা পরিবেশে, পথের পাশে, তাদের মাঝখানে শুয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন, তখনও তাদের প্রতি তাঁর কোনো ঘৃণা জাগেনি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাদের মেনে নিয়েছেন। বম্বাই শহরের বাইরে যেখানে প্রায় বারো ঘণ্টা না খেয়ে দৈনিক ছপয়সা মজুরিতে ক্ষেত নিড়িয়েছেন, ঘাস কেটেছেন, সেখানে আর এক দরিদ্রতম পরিবারের ঘরে বাস করে তাদের সঙ্গে তাদের বরাদ্দ থেকে তাদের হাতে গড়া বাজরার রুটি শুধু একটু মাটি মেশানো নুনের সঙ্গে খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, সেখানেও তাদের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা! যে ছাগলের দুধ বিক্রেতার ভাঙা ঘরে প্রতিদিন তিন পয়সা ভাড়া দিয়ে রাত কাটিয়েছেন, সেই ঘরের মালিক-দম্পতি তাঁদের এক চরম বিপদে নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে সাহায্য করেছেন—তার সকৃতজ্ঞ বর্ণনা পড়লে রোমাঞ্চিত হতে হয়। প্রেমাঙ্কুরের মুখে এর অনেক ঘটনাই আমার আগে শোনা ছিল। আরও অনেক ঘটনা পড়া যাবে তাঁর চতুর্থ পর্বে।

প্রেমাঙ্কুর মুখে যা বলতেন, সবই তাঁর জীবনের কাহিনী। প্রত্যেকটি ঘটনা নতুন করে বেঁচে উঠত তাঁর বর্ণনার গুণে—এবং তিনটি ডাইমেনশন সহ। তা ছাড়া নিজের জীবনের যে সব ঘটনা সাধারণত কেউ প্রকাশ করতে

সঙ্কোচ বোধ করে, তা তিনি নিপুণ শিল্পীর মতো, অম্লানবদনে সবার কাছে বলে যেতেন। এবং এমন অনেক ঘটনা বলতেন যা ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না কোনো দিন। অনেক কথাই তিনি অকপটে বলে গেছেন তাঁর মহাস্থবির জাতকে, যে ভঙ্গি বাংলা ভাষায় আর কারো পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি। কারণ এ জিনিসের অনুকরণ হয় না। জীবনের সমস্ত ঘটনা একমাত্র "কনফেশনস"-এর নামে বলা যায় কিন্তু তা দিয়ে সাহিত্য রচনা করার মতো কঠিন কাজ সবাই পারে না, এবং সবার তা মানায়ও না। বাংলাদেশে একমাত্র প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তা পেরেছেন—এবং পেরেছেন যেমন তাঁর মুখের কথায়, তেমনি পেরেছেন তাঁর লিখিত মহাস্থবির জাতকে। আমাদের সংস্কারে নীতি ও দুর্নীতি নামক দুটি আচরণ-বিভাগ আছে। এই দুটি বিভাগের মাঝখানে প্রাচীর তুলে নীতি-ধর্মী মানুষেরা অন্যের পাপপুণ্য বিচার করেন। অথচ এ দুটির মাঝখানে যে স্থায়ী প্রাচীর গাঁথা যায় না, দেশভেদে, সমাজভেদে, এবং ব্যক্তিভেদে এদের অর্থ আপেক্ষিক হয়ে পড়ে, এবং চিরদিনের জন্য কোনো দেশেই নীতি বা দুর্নীতির কোনোটাই তাদের স্থায়ী এবং চরম অর্থ বহন করে না, একথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই বলেই আচরণক্ষেত্রে এবং শিল্প-ক্ষেত্রে এত দ্বন্দ্ব।

কিন্তু যে মুহূর্তে শৈশবে নীতিবিদ্যালয়ে পড়া প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সাহচর্যে এসেছি, অথবা তাঁর লেখা পড়েছি, তখনই দেখেছি তাঁর বর্ণনায় বা লেখায় সংস্কারের মানদণ্ডে নীতিদুর্নীতি বিচারের কথা একেবারেই মনে আসেনি। এ সমস্তের ঊর্ধ্বে তাঁর যে রসসৃষ্টি এবং শিল্পীজনোচিত প্রকৃত নিস্পৃহতা, তা মনকে বিচারকের আসন থেকে সরিয়ে দিয়ে রসভোক্তার আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

এ এক অসাধারণ ক্ষমতার দৃষ্টান্ত।

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রেমাঙ্কুর সম্পর্কে একটি রচনা লিখেছিলেন প্রেমা-ঙ্কুরের জীবিতকালে। "এখন যাঁদের দেখছি"—এই পর্যায়ের লেখা। তাতে এক জায়গায় প্রভাতচন্দ্র, প্রেমাঙ্কুর ও হেমেন্দ্রকুমারের তর্ক সভার চমৎ-কার বর্ণনা আছে। সভাটি অবশ্য কোনো ঘরে নয়, হেদুয়ার মোড় থেকে বীডন স্ট্রীট চিৎপুরের মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ পথ। সময়, রাত্রি দ্বিপ্রহর কিংবা আরও বেশি।

হেমেন্দ্রকুমার লিখছেন,

"ক্রমে রাত বাড়ে, পথ জনবিরল হয়ে পড়ে, কিন্তু তর্ক থামে না। প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাত থাকেন এক পাড়ায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের আশেপাশে এবং আমি তখন থাকতুম পাথুরিয়াঘাটায় আমাদের পৈতৃক বাড়িতে। আমি যদি হই বাড়িমুখো, অন্য কেউ আমার সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। বিডন স্ট্রীট ধ'রে চিৎপুর রোডের মোড়। তর্ক তখনও প্রবল।...সবাই ঢুকি বিডন গার্ডেনে। আবার বসে তর্ক সভা। মধ্যরাত্রি। বাধ্য হয়ে সবাই উঠে দাঁড়াই। প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাত প্রভৃতি নিজেদের পাড়ার দিকে পদচালনা করেন।...আবার চলি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে...... আবার কর্নওয়ালিস। তবু তর্ক থেকে যায় অমীমাংসিত।"

এ'ও তো দেখছি সেই পথচলারই কাহিনী—দিনরাত শুধু চলা, ক্লান্তি নেই এতটুকু। এবং এখানেও তিনজন। এবং এর'ও নায়ক প্রেমাঙ্কুর। বীডন স্ট্রীটের মতো হ্রস্ব পথকে দীর্ঘ করা হয়েছে বার বার এক প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে এবং ফিরে এসে। কিন্তু তবু তা যতই কম হোক ঘর ছাড়ার আনন্দ এর মধ্যেও আছে, যদিও প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙানোর জন্য গাল খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো দুঃখ নেই।

প্রেমাঙ্কুরের মৃত্যুর (১৩-১০-৬৪) পর একাধিক রচনা লিখেছিলাম তাঁর সম্পর্কে। 'অমৃত' সাপ্তাহিকে (২৩-১০-৬৪) 'প্রেমাঙ্কুর স্মরণে' নামক যে রচনাটি লিখেছিলাম তার এক স্থানে বলেছিলাম—

> বিলিতি প্রবাদ—বিড়ালের নয়টি জীবন। আর এই বিড়ালের মতন যার যত বেশি জীবন থাকবে তার ততই বহু রকম বিপদ থেকে মুক্তির সৌভাগ্য লাভ হবে, এমন একটি বিশ্বাস আছে তাদের। আমার মনে হয় প্রেমাঙ্কুরের জীবনে এটি অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। বিড়ালের মতন তাঁরও নয়টি জীবন, এবং তিনিও বহু বিপদ উত্তীর্ণ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

আরও একদিনের কথা। তিনি বিছানায় শুয়েই থাকতেন শেষ কয়েক বছর। দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু চেহারা দেখে হঠাৎ মনে হল এসে ভাল করিনি। কথা বলতে তাঁর কষ্ট হবে। কিন্তু তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অনর্গল কথা। অনেক গল্প। গল্প করতে করতে অসুখ কোথায় অন্তর্হিত হল, তড়াক করে এক সময় বিছানার উপর উঠে বসলেন। আর ঠিক সেই সময় কোন্ মন্ত্রবলে তাঁর অসুস্থ চেহারাও মিলিয়ে গেল! উৎসবে বিদ্যুতের ছোট ছোট আলোর মালায় যেমন

আলোর প্রবাহ খেলে বেড়ায়, তেমনি দেখলাম তাঁর উচ্ছলতার আলো সর্বাঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। সমস্ত অঙ্গে তাঁর মনের প্রকাশ।

এই ছিল তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি। শিশিরকুমার ভাদুড়ি এবং তিনি যে-দিন আমার ঘরে এসে মিলতেন, সেদিন আমার বয়স হঠাৎ বেড়ে যেত। যে জাতীয় চাপল্য স্কুলকলেজ জীবনে করেছি, আমার সামনে ওঁরা দুজনে ঠিক সেই জাতীয় আচরণ করতেন। দেখে খুব আনন্দ হত, কিন্তু তখন আমাকে ওঁদের চেয়ে বেশি বয়সের মনে হওয়াতে সে স্ফূর্তিতে যোগ দিতে পারতাম না। ছোট ঘরের মধ্যেও প্রেমাঙ্কুর দাঁড়িয়ে উঠে অভিনয়ের ভঙ্গিতে আলাপ আরম্ভ করতেন। তার সঙ্গে শিশিরকুমারের হাসি এবং গলা ছেড়ে কথা বলা—যা বহুদূর পর্যন্ত শোনা যেত।

প্রেমাঙ্কুরের বাল্যকাল থেকেই একটি জিনিসের প্রতি দুর্বলতা দেখা যায়। অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক যেকোনো ব্যাপার বিশ্বাস করতে তিনি যেন একটু বেশি আগ্রহী ছিলেন। প্রেতমূর্তি দেখার কথাও বলেছেন। তাঁর মহাস্থবির জাতকে এ সব বিষয়ে একাধিকবার আলোচনা দেখতে পাওয়া যাবে।

আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে। আমি এ সব বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি। বর্ডারলাইন সায়েন্স নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। এইটুকু জানি যে, মানুষের মন যে কি পদার্থ তা আজও বোঝা যায় নি, এবং এর ক্ষমতার সীমা কতখানি তাও নিশ্চিত নির্ধারিত হয়নি। তবে "আত্মা"কে আমি মোটামুটিভাবে অন্তত মগজজাত একটি গুণ বলে মনে করি, এবং দেহকে বাদ দিলে চেতনা বা আত্মা থাকতে পারে বলে আমার কোনোমতেই বিশ্বাস হয় না।

এ সব আলোচনা মাঝে মাঝে করেছি প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে। মতে মেলেনি এই পর্যন্ত, কিন্তু এ বিষয় নিয়ে কখনো দ্বন্দ্ব হয়নি।

এ সব উপমনস্তত্ত্ব অথবা প্যারাসাইকোলজি আমার বোধের বাইরে, এ বিষয়ে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

প্রেমাঙ্কুরের জীবনে এ সবের প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। দেব-দেবতার প্রতি ভক্তিও তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়—যদিও ব্রাহ্ম সন্তান তিনি। পিতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যা কিছু অব্রাহ্মোচিত, তা মনে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আপনা থেকেই জন্মে গেছে। প্রায় প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যেই কোনো-না-কোনো গুপ্ত স্থান আছে একটি, সেইখানে কোনো একটি দুর্বলতা

লুকিয়ে থাকে।

গল্প বলার আর্টে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন আর এক ওস্তাদ। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সেই অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর (মৃত্যু: ৫-১২-৫১) আমাকে একটি রচনা পাঠান (ছাপা হয় ১৬-১২-৫১, যুগান্তর সাময়িকীতে) তাতে তাঁর গল্প বলার মনোহারিত্বের কথা তিনি এইভাবে লেখেন—

> "অবনীন্দ্রনাথ খুব উঁচুদরের গল্প বলিয়ে ছিলেন। আসর জমানোর আর্টেও বোধ হয় ঠাকুর বাড়ির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই ছিলেন দ্বিতীয়। যখন তিনি কথা বলতেন, বা কোনো গল্প অথবা প্রবন্ধ পড়তেন তখন মনে হত আগাগোড়া সমস্তটাই তিনি অভিনয় করে চলেছেন। পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখের ও হাতের ভঙ্গি চলেছে অবিরাম। নিজে না হেসে অপরকে হাসিয়ে চলেছেন। এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অননুকরণীয়।"

এর প্রায় সবখানি বর্ণনাই প্রেমাঙ্কুরের নিজের বেলাতেও খাটে। এবং তাঁর এই গল্প শোনানোর মধ্য দিয়েই প্রথম তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। ১ নম্বর গারস্টিন প্লেসে এককালে আমাদের বৈকালিক আড্ডা ছিল। সেখানে প্রেমাঙ্কুর যেতেন প্রায় নিয়মিত। তিনি সবার কাছে বুড়োদা নামে পরিচিত। বুড়োদার সবাই সমান আত্মীয়।

যখন আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে সে বোধ হয় ১৯৩৫ কিংবা ৩৬, ঠিক আমার মনে নেই। তার কিছু আগেও হতে পারে। সে সময় তিনি অন্তত দু'শটি জন্ম এবং জন্মান্তর পার হয়ে এসেছেন, কিন্তু তখনও তাঁর সেই বিচিত্র জীবনের ইতিহাস সবটা জানি না, মাঝে মাঝে টুকরো দুএকটি শুনেছি মাত্র। তিনি যেটুকু কথাপ্রসঙ্গে বলতেন, সেইটুকু। তারপর মহাস্থবির জাতক পড়ে বুঝতে পেরেছি সে সব কথা এতে বাদ আছে। কারণ তা তাঁর প্রথম জীবন থেকে তিনি সতেরো আঠারো বছর বয়সের ছবি যে ছকে ফেলে এঁকেছেন, তার মধ্যে আসে না।

আমার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আমি তাঁর অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার এক চতুর্থাংশও ছুঁয়ে যেতে পারিনি, এক এক স্থানে বিস্ময়ে থেমে যেতে হয়েছে কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে, তাঁর মহাস্থবির জাতক তিনখণ্ডের দ্বার সবার কাছেই উন্মুক্ত হয়ে আছে, যাঁরা তা পড়েছেন বা পড়বেন তাঁদের আমার এ বর্ণনা পড়বার দরকার নেই, আমি শুধু আমার বিস্ময় প্রকাশ করেই তৃপ্ত। অপ্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড হয় তো অল্পদিনের মধ্যেই কোথাও

ছাপা হবে।

আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি জীবনের আরো দুএকটি পর্ব প্রায় অতিক্রম করে এসেছেন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সিনেমা পরিচালনা ও সাহিত্য রচনা। বম্বে, কোলাপুর ও বাংলাদেশ—ভারতের এই ত্রিপাদ ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি বাংলা, হিন্দী ও তামিল ভাষার ছবি যা পরিচালনা করেছেন তার মোট সংখ্যা হবে সতেরো। তারপর সাহিত্যসঙ্গ এবং সাহিত্যিক সঙ্গ। উপন্যাস গল্প ইত্যাদিতে প্রায় পনেরো-খানা বই। সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র মিলিয়ে মোট পাঁচখানার, এবং গিরিজা বসুর সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন এক-খানা। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত বইও আছে কয়েকখানা। তা ছাড়া তাঁর তখত-এ-তাউস নাটক অভিনীত হয়েছে শ্রীরঙ্গমে।

জীবনের মস্ত বড় দুটি পর্ব। কোনো দিন বিশ্রাম নেননি জীবনে—শেষের কয়েক বছর ছাড়া।

১৯৫১ থেকে আমাদের বাড়িতে প্রায় নিয়মিত আসতেন। তার আগেও আসতেন, কিন্তু অনিয়মিত। ১৯৫১-তে যখন শিশিরকুমার ভাদুড়ি আমার কাছে সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন আসতে লাগলেন, তখন থেকে বুড়োদাও আসতে লাগলেন সপ্তাহে অন্তত দু তিন দিন।

সাহিত্যজীবনের আরম্ভে তিনি যাঁদের সাহচর্যে উপকৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায় উল্লেখযোগ্য। এঁরা সাহিত্য বিষয়ের নানা তর্কে মেতে উঠে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন, এবং এই তর্কের ভিতর দিয়েই সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানের বিস্তারলাভ হত। তা ছাড়া ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতেও তখন এঁদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

প্রেমাঙ্কুরের মধ্যে একটি বড় দুর্বলতা আবিষ্কার করেছিলাম—তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। অনেকগুলো গান সম্পর্কে এবং সে সব গানের সুসঙ্গত সুর সম্পর্কে আমাদের অনেক আলোচনা হয়েছে। একদিন তিনি আমাকে বললেন, ভাল গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ইচ্ছা করে, শোনাতে পার?

এ কথায় মনে পড়ল, সে সময় শ্রীমতী কণিকা শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা এলে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত। আমি বললাম সে কথা। তিনি বললেন, এরপর এলেই খবর দিতে।

১৯৫৩, ৬ই ডিসেম্বর রবিবার কণিকা আমাদের বাড়িতে আসতেই প্রেমাঙ্কুরকে খবর পাঠিয়ে দিলাম।

কণিকা একটিমাত্র গান প্রায় দশ মিনিট ধরে গাইল—"রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব।" প্রেমাঙ্কুর আমাকে পরে বলেছিলেন এমন সুন্দর করে গাওয়া এ গান তিনি এর আগে কোথাও শোনেননি। এবং এটি শোনবার সুযোগ করে দেওয়াতে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ছিল না।

প্রেমাঙ্কুর সম্পর্কে আর কিছুই বলব না। শুধু এ কথা স্মরণ করব যে, এমন একটি মধুর চরিত্রের মানুষ, যিনি বাল্যকাল থেকে মানুষের সমাজ এবং জীবনকে তন্ন তন্ন করে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখেছেন, এবং যাঁর আলাপের আকর্ষণে তাঁর প্রতি সবাই প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতেন, যাঁর সঙ্গে দেশী-বিদেশী সাহিত্য বিষয়ে আলাপে তাঁর জ্ঞানের পরিধি মুগ্ধ করত, অথচ যিনি স্কুল পালিয়ে প্রায় সমস্ত জীবন মুসাফির হয়ে কাটালেন, এমন একটি দুর্লভ বাঙালী ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে পাঁচ ছ বছর ধরে দিনের পর দিন কাটাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

একটি কথা বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি। মৃত্যুর আগে তিনি জানিয়ে রেখে-ছিলেন "মৃত্যু হলে পরিমলকে যেন খবর দেওয়া হয়।" আমার সঙ্গে আরও একজনের নাম করেছিলেন—নরেন্দ্র দেবের। এ ইচ্ছা কেন হয়েছিল, তা বুঝি, এমন ক্ষমতা আমার নেই।

৩০-৬-৬৬

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৯০

স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর দুই অকালপক্ক বালক গোপনে বসে পূজনীয় ব্যক্তির বিচার করছে। কেন তিনি ঐ বৌটাকে বিষ খাওয়ালেন? এ কি তাঁর উচিত হয়েছে?

কিন্তু তা ছাড়া আর কি করা যেত তাও তো ভেবে পাই না।

অনেক কিছু করা যেত।

কিন্তু বৌটা যখন বুঝতে পারল তারই জন্য সংসারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং স্বামীর ভালবাসা যখন সে আর পাবেই না, তার সতীন যখন তার স্বামীকে ষোল আনা দখল করে বসেছে, তখন তার জীবনের আর কি দাম?

তা যদি হবে, তাহলে মরবার আগে স্বামী যখন তার কাছে এসে তার নাম ধরে ডাকল, তখন সে কেন বলল, কাল আমাকে এ নামে একবার ডাকলে না কেন? তাহলে তো আমার এইভাবে মরবার দরকার ছিল না। তার মানে, তার বাঁচবার ইচ্ছা ছিল। সতীনের সঙ্গেও বাস করবার ইচ্ছা ছিল।

অত সোজা নয় রে। পরে ভীষণ গণ্ডগোল হত। ও বেঁচে থাকলে দুজনের একজন অসুখী হত। তা ছাড়া পিছনে আরও সব ষড়যন্ত্রকারী ছিল, তারা অন্য উপায়ে এদের ক্ষতি করত।

সেই কল্পনা করে একেবারে হাতে বিষ তুলে দেওয়া? আসলে কি জানিস, সব অশান্তির মূলে হচ্ছে ঐ নগেন্দ্রটা। ও একদম মেয়েলি, কোনো রকম পৌরুষ নেই, কথায় কথায় কেঁদে ফেলে, এমন মানুষের সঙ্গে ও টিকতে পারত না। তাই বৌটাকে মারা ঠিকই হয়েছে।

এই জাতীয় গোপন আলোচনা। প্রকাশ্যে ওদের এসব আলোচনার উপায় ছিল না। কারণ তা হলে ধরা পড়ে যেত যে, তারা তাদের নিষিদ্ধ বই গোপনে পড়েছে, অর্থাৎ বিষবৃক্ষ গোপনে পড়েছে। আর সে সঙ্গে ধরা পড়ে যেত যে, আরও অনেক নিষিদ্ধ বই ওরা ঐ বয়সে পড়ে ফেলেছে। আর তাহলে জংলু ও বুড়ো নামক দুই বালকের একজনের পিঠে অন্তত লাঠি পড়ত। বুড়োর পিঠে। জংলু ও বুড়ো—অর্থাৎ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

এঁদেরই দুজনের কথা বলছিলাম। এঁরা বাল্যকালে বঙ্কিমবাবুর বিচার করছিলেন। লেখকরূপে তিনি কুন্দনন্দিনীকে বিষ দিয়ে মারলেন এটি তাঁর পক্ষে উচিত হয়েছে কি না। বঙ্কিমবাবু 'সমাপ্তি' পরিচ্ছেদে লিখেছেন—"কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথায় পাইল। তখন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ।"

কিন্তু বালক প্রেমাঙ্কুর ও বালক প্রভাতচন্দ্র আরও একটু বেশি দেখেছেন। তাঁরা নিশ্চিত জানতেন, এ কাজ বঙ্কিমচন্দ্রের। সমালোচকদেরও এই মত?

বয়সের তুলনায় দুজনেই কত বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এইভাবে প্রথমে এই দুজন এবং পরে হেমেন্দ্রকুমার রায় (ও পরে আরও অনেকে) একত্র জুটেছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে।

হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আমার সখ্য হলেও তাঁর পিতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আমার জানা নেই, কিন্তু প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাতচন্দ্রের পিতৃ পরিচয় আমার জানা আছে। প্রেমাঙ্কুরের কাছে তাঁর পিতার পরিচয় অনেকবার শুনেছি, এবং মহাস্থবির জাতকে পড়েছি। প্রভাতচন্দ্রের পিতার পরিচয় বাংলাদেশে কারো অজানা নয়, কারণ সামাজিক সংস্কারমূলক কাজে, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীজাতির ও স্ত্রীলোকের জন্য সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রসারে, তিনি সমস্ত জীবন ব্যয় করে গেছেন।

উভয়েরই পিতা দুঃসাহসিক এবং তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। মহেশচন্দ্র আতর্থী একবার এক গুণ্ডার ভোজালি নিজের মাথায় বিদ্ধ অবস্থায় তার হাত থেকে এক আক্রান্ত মেয়েকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও তিনি তা অগ্রাহ্য করেছিলেন। আর একবার এক ধনী গৃহের তেতলা থেকে এক অপহৃতা নারীকে রাত্রে সেই বাড়ির জলের পাইপ বেয়ে উঠে উদ্ধার করে এনেছিলেন। মেয়েটিকে নিজের পিঠে বেঁধে পাইপের পথেই নামিয়ে এনেছিলেন।

প্রভাতচন্দ্রের পিতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির ধর্মে আঘাত দিয়েছিলেন এক কাগজের সম্পাদক। তাঁর ধর্ম ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসার। সেই সম্পাদক দ্বারকানাথকে ও তাঁর প্রচেষ্টাকে কারটুন ছবির সাহায্যে বিদ্রূপ করেছিলেন। দ্বারকানাথ উত্তেজিতভাবে লাঠি নিয়ে সম্পাদকের বৈঠকে গিয়ে হাজির, পকেটে তাঁর সেই কাগজের বিদ্রূপাংশ। সেটি পকেট

থেকে বার করে সম্পাদকের মুখে গুঁজে দিয়ে চিৎকার করে বলছিলেন, Eat your words ! Eat your words ! বলছিলেন, আর লাঠি দিয়ে সেটি তাঁর মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন। একেবারে আক্ষরিক অর্থে eat your words ! 'যে কথা বলেছ, সে কথা আহার কর', বলা হয় ইংরেজীতে। কিন্তু ওর আসল মানে হচ্ছে, কথা "প্রত্যাহার" কর। দ্বারকানাথ ঐ সম্পাদকের কথা তাঁকে প্রথমে আহার করিয়েছিলেন, এবং পরে তাঁকে দিয়েই কাগজে প্রত্যাহার করিয়েছিলেন।

দুই বন্ধুর দুই পিতৃচরিত্রে এদিক থেকে কিছু মিল দেখা যায়।

এবং এঁদের দুই পরিবারও কাছাকাছি বাস করতেন, সে জন্য বন্ধুত্বের সুযোগ বেশি ছিল। পরিবারের পরিচয় প্রভাতচন্দ্রের ভাষাতেই বলি—

> "কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকে লাহাবাবুদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা—এখন যেটি ১৩ নম্বর বিধান সরণী,—বাবা ভাড়া নিয়েছেন। সেই বাড়ির দক্ষিণ অংশটিতে থাকতাম আমরা, আর আমাদের বড় ভগ্নীপতি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরিবার। আমাদের বাড়ির ঠিক দক্ষিণ গায়ে লাগানো ছোট্ট দোতালা বাড়িটাতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন বুড়োর [প্রেমাঙ্কুরের] বাবা মহেশচন্দ্র আতর্থী মশায়। আমাদের ভাইবোনের সংখ্যাও ছিল অনেকগুলি··· ভাগ্নে ভাগ্নীদের মধ্যে সবাই পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সুকুমার, সুখলতা, সুবিনয়, পুণ্যলতা, এরা তো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক।" (যুগান্তর সাময়িকী, ৮-১১-৬৪, "আমার জীবনে প্রেমাঙ্কুর")

প্রভাতচন্দ্রের মা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বাংলার স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সে এক কাহিনী, পৃথক আলোচনার যোগ্য। তবে তাঁকে উপলক্ষ করেই স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রধানত তাঁকে উপলক্ষ করেই বাংলার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে গিয়েছিল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মহিলার অন্যতম প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। এবং মেডিক্যাল কলেজের সম্পূর্ণ পাঠ শেষ করে পাস করা সত্ত্বেও যখন শুধু চিকিৎসার লাইসেন্স পেলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেলেন না (কারণ মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে পড়ার বিধান ছিল না), তখন দ্বারকানাথ এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাদম্বিনীকে বিলেত পাঠালেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, কারণ

সেখান থেকে তিনি L.R.C.P, L.R.C.S. এবং L.F.P. উপাধি নিয়ে গৌরবের সঙ্গে দেশে ফিরে এলেন।

এই সময়ের একটুখানি বর্ণনা উদ্ধৃত করি শ্রীযুক্তা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর "ছেলেবেলার দিনগুলি" নামক বই থেকে—

"দিদিমা কবে যে বিলাতে গিয়েছিলেন, সে কথা মনে নেই, কিন্তু তাঁর ফিরবার দিনটি বেশ মনে পড়ে। বাড়িতে ঢুকেই দিদিমা দু-হাত বাড়িয়ে জংলু-মামাকে [প্রভাতচন্দ্রকে] কোলে নিতে গেলেন। ছোট্ট এক বছরের জংলুমামাকে তাঁর [কাদম্বিনীর] মায়ের কাছে রেখে দিদিমা বিলাত চলে গিয়েছিলেন, এখন সে ছেলে মাকে চিনতে পারছে না। শক্ত করে ওর দিদিমার গলা আঁকড়ে রইল কিছুতেই মায়ের কোলে গেল না।"

এরপর এই প্রসঙ্গে আরও একটুখানি শোনাই শ্রীমতী লীলা মজুমদারের "উপেন্দ্রকিশোর" নামক বই থেকে—

"সত্যি কথা বলতে কি ভারতের এই প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট ও ডাক্তারকে এখনকার হিসাবেও আধুনিক না বলে উপায় নেই।...সমানে বাইরের কাজ করেছেন, নেপালের রাজবাড়িতে পর্যন্ত চিকিৎসা করেছেন, আরো পড়াশুনো করেছেন, কোলের ছেলে নিজের মায়ের কাছে রেখে বিলেত গিয়েছেন। আবার ফিরে এসে ঘরকন্নার ভার নিয়েছেন, হাল-ফ্যাশানে বাড়িঘর সাজিয়েছেন, রোজগারও করেছেন এন্তার, খরচও করেছেন উদারভাবে, অমানুষিক পরিশ্রমও করেছেন। কুঁড়েমি কাকে বলে জনতেন না; সেকালে মোটর ছিল না, রুগী দেখতে যেতেন ঘোড়ার গাড়িতে করে, পৌঁছতে অনেক সময় লাগত। কিন্তু সে সময়-টুকু নষ্ট না করে কি সুন্দর সূক্ষ্ম কাজের ক্রুশ কাঁটার লেস্ বুনতেন, সবাই দেখে প্রশংসা করত।"

এই হল প্রভাতচন্দ্রের বাল্যকালের পরিবেশ ও পরিবার পরিচয়। একই বাড়ির এতগুলো ব্যক্তির নাম সহজেই করলাম বটে, কিন্তু নতুন পাঠকের পক্ষে এঁদের মধ্যে পরস্পর কার কি সম্পর্ক নিশ্চয় এতক্ষণ ভুল হয়ে যাবার কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় যেন ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে সকৌতুকে বলেছিলেন, একই পরিবারে এতগুলো জীনিয়াস থাকলে বড্ড অসুবিধা। এঁদেরও অবস্থা প্রায় তাই। অতএব পটভূমি থেকে প্রভাতচন্দ্রকে এবারে সামনে এনে খাড়া করি।

আশা করি এতক্ষণে প্রভাতচন্দ্রের শৈশব সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করিয়ে দিতে পেরেছি। আমার এ সবই ইংরেজী আইনের ভাষায় যাকে বলে hearsay evidence, তাই। পড়া কথা, প্রভাতচন্দ্রের মুখে কিছু শোনা কথা। কিন্তু এখন যদি বলি, এই বালককে কল্পনার চোখে দেখার পর যেদিন হঠাৎ তাঁকে প্রথম চোখে দেখলাম, মুখে ঘন দাড়ি নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে কাজ করছেন, তখন মাঝখানের প্রায় চল্লিশ বছরের শূন্যতা পূরণ করতে আবার আমাকে ঐ 'হিয়ারসে এভিডেন্স'-এর আশ্রয়ে যেতে হবে।

প্রভাতচন্দ্রকে পরিবারের পটভূমি থেকে ছাড়িয়ে আনলেও, অতঃপর তিনি সমবয়সীদের নিয়ে যে একটি সাংস্কৃতিক পরিবার গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখা সম্ভব হবে না। প্রথম বন্ধুর নাম বলেছি। দুজনেরই পড়াশোনার দিকে ঝোঁক, শুধু এইটেই ছিল দুজনের প্রধান গুণ। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের হেতু। এবং বাল্যকালে দুজনেই ডানপিটে ছিলেন। মারামারিতে ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু প্রেমাঙ্কুরের পিঠের উপর মারটা অতিরিক্ত বর্ষিত হওয়ায় বালক বয়সেই তিনি গৃহত্যাগী হয়ে কয়েক বছর ভবঘুরে জীবন কাটালেন। তারপর ফিরে এলে আবার দুজনে একাত্মা। দুজনে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা, এবং আলোচনা। সতেরো আঠারো বছর বয়সেই দুজনে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে অনেকখানি পরিচিত হয়েছেন, এবং শেক্সপীয়ারও কিছু কিছু পড়েছেন। সবই নিজেদের জানবার শেখবার ঐকান্তিক আগ্রহ থেকে। এবং এই আগ্রহ থেকেই, যখন বিখ্যাত শেক্সপীয়ার অভিনেতা ম্যাথিসন ল্যাঙ দলবল সহ কলকাতা এলেন (অনুমান ১৯০৮ সনে) অভিনয় করতে, তখন প্রেমাঙ্কুর, প্রভাতচন্দ্র ও হেমেন্দ্রকুমার রায় (হেমেন্দ্রকুমার তৃতীয় প্রাণের বন্ধুরূপে এঁদের সঙ্গে এসে মিলেছেন ততদিনে) ম্যাথিসন ল্যাঙের যতগুলো নাটক হয়েছিল, হ্যামলেট, মিডসামার নাইটস ড্রীম, কিং লিয়র, ওথেলো, মার্চ্যান্ট অভ ভেনিস, সবই একে একে দেখলেন, কোনোরকমে নিম্নতম শ্রেণীর টিকিট কিনে। ম্যাথিসন ল্যাঙের বয়স তখন সাতাশ-আটাশ হবে। এঁর অভিনয় দেখে তিন বন্ধু বিগলিত। আর চুপ করে থাকা চলে না, এই অভিনেতার সঙ্গে দেখা করতে হবে যেমন করে হোক। লিখে ফেললেন এক চিঠি, দেখা করার অনুমতি ভিক্ষা করে। লিখলেন, যদিও আমরা বয়সে তরুণ, আমাদের মন সাহিত্য ও শিল্পের তৃষ্ণায়

আকুল, অতএব—।

চিঠি পাঠিয়ে ওঁরা ভেবেছিলেন ফললাভের আশা দুরাশা, তবু যদি লেগে যায়। কিন্তু ফললাভ হল আশাতীত। ম্যাথিসন ল্যাঙ শুধু চিঠির উত্তর দিলেন তাই নয়, তিনি তিন তরুণ উৎসাহীকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণও করলেন, যাতে খেতে খেতে আলাপ করা যায়।

তিন বন্ধু জীবনে একটি বড় প্রেরণা লাভ করলেন, এই শিক্ষিত উদার এবং গুণী অভিনেতার সংস্পর্শে এসে। শিশিরকুমার ভাদুড়িও ম্যাথিসন ল্যাঙের অভিনয়ে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন প্রথম জীবনে। আমি নিজে তাঁকে দেখি নি, কিন্তু তাঁর অভিনীত একটি নির্বাক সিনেমা ছবি দেখেছি গত যুগে। সে এক অদ্ভুত প্লট। শৌখিনরা ওথেলো অভিনয় করবেন। ম্যাথিসন ল্যাঙ নিয়েছেন ওথেলোর পার্ট। এবং তাঁর স্ত্রী হয়েছেন ডেস-ডেমোনা। এই স্ত্রীর প্রতি গল্পের নায়ক ব্যক্তিগতভাবে বিরূপ ছিলেন, তিনি ওথেলোরূপে ডেসডেমোনার হত্যা দৃশ্যে এমন বাস্তব অভিনয় করলেন যাতে ডেসডেমোনার ভূমিকায় অভিনয়রতা তাঁর নিজের স্ত্রী দম বন্ধ হয়ে সত্যিই মরে গেলেন। স্ত্রীকে মারবেন বলেই তিনি নিজে ওথেলো ও তাঁর স্ত্রীকে ডেস-ডেমোনা বানিয়েছিলেন। দারুণ ট্র্যাজিডি। সে দৃশ্য আজ চল্লিশ বছরেও মনে গাঁথা হয়ে আছে। এখনও মনে হলে দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। সবাই জানল হত্যাটা ইচ্ছাকৃত নয়, নাটকের চরিত্রকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে।

যাই হোক ম্যাথিসন ল্যাঙ আমার কোনো ক্ষতি না করলেও ঐ তিন বন্ধুর দুজন শেষ পর্যন্ত সিনেমা থিয়েটারের মধ্যেই নিজেদের জড়িয়ে ফেল-লেন, এবং প্রভাতচন্দ্র বি-এল (১৯১৯) পাস করে পুলিস কোর্টে ওকালতি রূপ অভিনয়ের জন্য চলে গেলেন, অবশ্য অল্পদিনের জন্যই, কারণ এর তিন চার বছর পরে চিত্তরঞ্জনের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে প্রভাতচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে এলেন আদালতের মঞ্চ থেকে। কিন্তু তাঁর আগেই তাঁর দিদি জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় (দর্শনশাস্ত্রে এম-এ, ১৯১২) অ্যানি বেসান্টের সভাপতিত্বে (১৯১৭ ?) কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেত্রীরূপে প্রথম দেশের কাজে যোগ দেন এবং দেশের কাজেই জীবন উৎসর্গ করেন। জাতীয় নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য।

প্রভাতচন্দ্রের জীবন, শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকের জীবন, কিন্তু তার

পূর্বপ্রস্তুতিতে বহু জাতীয় অভিজ্ঞতা। এবং ক্রমে মিত্রলাভ এবং মিত্রবৃদ্ধি। সে সব মহামনোহর কাহিনী সংক্ষেপে বলতে হবে।

তিন বন্ধুরই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরামর্শ দিলেন 'জাহ্নবী' মাসিকে যোগ দিতে। জাহ্নবীর প্রথম সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (১৯০৪ থেকে)। তারপর সম্পাদনা করেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৯০৭ থেকে)। তারপর সুধাকান্ত বাগচী (১৯১১ থেকে)। এই সময়ে সুধাকান্তের সঙ্গে এসে তিন বন্ধুতে যোগ দেন। এই কাগজেই প্রেমাঙ্কুরের প্রথম ছোট গল্প এবং হেমেন্দ্রকুমারের একখানা উপন্যাস ছাপা হয়। কিন্তু সুধাকান্তের সঙ্গে বনল না, কিছুদিন পরে জাহ্নবী ছেড়ে এঁরা তিনজনেই গিয়ে জুটলেন 'যমুনা'য়। তখন যমুনার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল (১৯১২)। এখানে জমল ভাল। লেখার সন্ধানে বেরিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, এবং তখন প্রেমাঙ্কুর ও প্রভাতচন্দ্র খুব উৎসাহের সঙ্গে নতুন লেখক শরৎচন্দ্রের গুণগান প্রচারে লাগেন তাঁর লেখা জনে জনে পড়ে শোনানো এঁদের একটা কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল তখন।

এই সময় দেড় বছরের মধ্যে যমুনায় শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯১২ থেকে ১৯১৩-র মধ্যে রামের সুমতি, বোঝা, বিন্দুর ছেলে, পথনির্দেশ, পরিণীতা, (অনিলা দেবী ছদ্মনামে "নারীর মূল্য"), চরিত্রহীন (আংশিক), চন্দ্রনাথ এবং আলো ও ছায়া।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই (অনুমান ১৯০৮) প্রভাতচন্দ্র বিপ্লবী দলের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তিনি তখন দলের নির্দেশে কর্মী রিক্রুট করে বেড়াচ্ছেন। এই সময়ে বাঘাটি গ্রামে এক স্বদেশী ডাকাতি হয়। বীরেন ঘোষ নামক এক তরুণ, তাদের নেতা মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর কাছে বলেন, বাঘাটি গ্রামে তাঁর মামারা টাকার মানুষ, সেখানে ডাকাতি করা দরকার। ডাকাতি সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হল বটে, কিন্তু মামারা ছদ্মবেশী ভাগ্নেকে চিনতে পেরেছিলেন, যার ফলে ভাগ্নে ধরা পড়ে গেলেন এবং পরে সেই দলের পান্নালাল চক্রবর্তী নামক এক যুবক রাজসাক্ষী হয়ে বলে দিল প্রভাতচন্দ্রই তাদের রিক্রুট করেছেন। আগে থাকতেই পুলিসের সন্দেহ ছিল, এবারে সুযোগ এলো, তাই ডাকাতিতে জড়াবার সুযোগ হবে আশায় প্রভাতচন্দ্রকে ধরতে এলো পুলিসের দল।



প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৬৫

এই উপলক্ষে এক অতি করুণ দৃশ্যের অবতারণা হল প্রভাতচন্দ্রের বাড়ি সার্চ করার সময়। বাড়ি তখন লাল পাগড়ীতে ঘেরা। ইনসপেক্টর জেনিংস সাবইনসপেক্টর নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন সার্চ করার জন্য। বোমা পিস্তল পাওয়া যাবে এই তাঁদের আশা। অবশ্য বাড়িতে একটি পিস্তল ছিল, কিন্তু তা প্রভাতচন্দ্রের সেজদা তাঁর ফোটোগ্রাফির ব্রোমাইড পেপারের প্যাকেটে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এ প্যাকেট খুললে কাগজে আলো লেগে নষ্ট হয়ে যাবে, সে জন্য জেনিংস প্যাকেটটি হাতে করেও খোলেন নি, কারণ অতটা সন্দেহ হয় নি। কিন্তু প্রভাতচন্দ্রের খাটের নিচে বোমা!

এবং একটা নয়, অনেকগুলো। নারকলী বোমা। নারকলের খোলের মধ্যে বারুদ পুরেও তখন বোমা তৈরি হত।

"ওরে কে কোথায় আছিস জলের বালতি আন।" চাকর বালতিতে করে জল নিয়ে এলে সাহেব হুকুম দিলেন ওগুলো খুব সন্তর্পণে ধরে ধরে বালতির জলে ডুবিয়ে দিতে। কিন্তু সাহেব জানতেন না যে ওগুলোর প্রত্যেকটার ভিতরেই জল আছে, বাইরে থেকে জল দেবার কোনো দরকারই নেই।

আসলে ওগুলো যশোর থেকে পাঠানো ঝুনো নারকল, ছোবড়া ছাড়ানো অবস্থায় পাঠানো, খাবার জন্য। প্রভাতচন্দ্র একটি হাতে নিয়ে ডান হাতে ভোঁতা দা দিয়ে কেটে দেখাতে গেলেন, তখন এক বিষম কাণ্ড। সাহেব ভাবলেন বিপ্লবী ছোকরা এবারে হাতে করে বোমা ফাটাবে, ওদের তো মৃত্যুভয় নেই, অতএব তিনি পিস্তল বার করে প্রভাতচন্দ্রের মাথা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু সাহেবের হাত ভীষণ কাঁপছিল তাই তিনি নিশানা ঠিক করতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে সাবইনসপেক্টর তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন দেয়ালের আড়ালে। ততক্ষণে নারকলের খোল দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, বেপমান সাহেবেরও বেপথু থেমেছে।

কিন্তু প্রভাতচন্দ্রের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলল। বেঁচে গেলেন শুধু মেট্রোপলিটান ইনসটিটিউশনের এক রসায়নের অধ্যাপকের সাক্ষ্যতে। নিঃসন্দেহ অ্যালিবাই —ঐ ডাকাতির দিন প্রভাতচন্দ্র রসায়নের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ছিলেন।

ল কলেজে পড়তে পড়তে 'প্রবাসী' মাসিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও প্রভাতচন্দ্র কিছু কিছু শিক্ষানবিসী করেছেন এবং এর পরে নির্মলচন্দ্র

চন্দ্রের সম্পাদনায় এবং চিত্তরঞ্জন দাশের পরামর্শে 'বৈকালী' নামক একখানি সান্ধ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এইখানে হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই ত্রিমূর্তির আবির্ভাব ঘটল সম্পাদকীয় কাজে সাহায্য করার জন্য। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন এঁদের সঙ্গে।

১৯২৩ সনের কথা এটি। সবাই মিলে ছোট কাগজে হাল্কা কাজ। বৈকালী ছাপা হত বসুমতী প্রেসে এবং ঐখানেই সম্পাদকীয় কাজও হত। একদিন মালিক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওঁদের ঠাট্টা করে বললেন, খুব সুখের কাজ দেখছি, একটুখানি খাটুনি, বেতন বেশ।

এঁরা বললেন, বসুমতীতে বেশি কাজ তো? কিন্তু আমরা সেই বেশি কাজের নমুনা কি, যদি দেখাই তবে কি বলবেন?

সতীশচন্দ্র খুব উদারপ্রাণ ছিলেন, বললেন যদি ত্রুটি বা ভুল বার করতে পারেন তবে এক শ' টাকা দেব।

এঁরা বললেন, 'বসুমতীর কেরামতি' নামে একটি কলমই করব দেখবেন। বসুমতীতে অনুবাদের অদ্ভুত নমুনা বেরুল—The police are patrolling the streets of Dacca—ঢাকায় পুলিসের লোকেরা রাস্তায় কেরোসিন তেল ঢালছে। ইংরেজিতে ছিল—Mr. Day was shot with a .32 bore pistol by Gopinath Saha. তার বাংলা হয়েছিল ৩২ নলা পিস্তল দিয়ে ডে'কে গুলি করা হয়েছিল। হোটেলে মহাত্মা গান্ধীর টেবিলে মেনু ছিল, তিনি খেতে খেতে তা দেখছিলেন, এই মেনুর অদ্ভুত বাংলা করা হয়েছিল। যথা, মহাত্মা গান্ধী হোটেলে খাবার সময় মনুসংহিতা পড়ছিলেন।

সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ওঁদের এই আবিষ্কার দেখে ভীষণ খুশি। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত এক শ' টাকা তো দিলেনই, উপরন্তু এক মোন সন্দেশ কিনে সকলকে খাওয়ালেন। যাঁরা ভুলের জন্য দায়ী তাঁরাও খেলেন।

হার স্বীকারে এত আনন্দ বাঙালীর মধ্যে বড একট দেখা যায় না। সতীশচন্দ্রকে এ বিষয়ে ব্যতিক্রম মনে হবে।

এই সময় শিশিরকুমার ভাদুড়ি অধ্যাপনা ছেড়ে প্রকাশ্যভাবে নিজস্ব থিয়েটারে সীতা মঞ্চস্থ করেছেন। বৈকালী কাগজে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লেখা হল। কিন্তু বৈকালীর পরিচালকদের মধ্যে একজন অন্য থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, তিনি বললেন এ জিনিস চলবে না। সম্পাদক এঁর সঙ্গে বিবাদ করতে অনিচ্ছুক থাকাতে তিন বন্ধুর জোর কমে গেল। অল্প-দিনের মধ্যেই ঐ ভদ্রলোক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে দিয়ে শিশিরকুমারের

অভিনয়ের কিছু নিন্দাসূচক সমালোচনা লিখিয়ে বৈকালীতে ছাপার ব্যবস্থা করলেন। সম্পাদক এঁদের বললেন, তোমরা তোমাদের বিভাগ নিয়েই থাক, থিয়েটার সম্পর্কে তোমরা কিছু ভেবো না।

কিন্তু এঁরা তাতে রাজি না হয়ে বৈকালী ত্যাগ করে চলে এলেন এবং হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সম্পাদনায় 'নাচঘর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই কাগজের উদ্দেশ্যই ছিল শিশির-কুমারের প্রাপ্য প্রশংসা করা। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নাচঘর প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রভাতচন্দ্র কিছুদিন পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন এবং ১৯৪২ সনে মাখনলাল সেন পরিচালিত 'ভারত' নামক দৈনিকের সম্পাদকরূপে যোগ দেন। এর পূর্বে ১৯৩০ সনে গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের বছরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের সম্পর্কে প্রভাত-চন্দ্র গেপ্তার হন এবং সাড়ে চার মাস জেলে প্রথম শ্রেণীর বিশেষ বন্দী রূপে থাকেন। জেলের অন্যান্য কোর্টে এই সময় কিরণশঙ্কর রায়, সুভাষ-চন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। মোট ৪৬টি সেল নির্দিষ্ট ছিল এঁদের বিশেষ শ্রেণীতে। ১৯৪২ সনে ভারত-সম্পাদকরূপে প্রভাতচন্দ্র পথ চলতি অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে এগারো মাস কারাবাস করেন। তার পরেও মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্য বন্দী থেকেছেন। যেকোনো উপলক্ষে ধরে নিয়ে যেত।

এসব কাহিনী অল্প দু-চার দিন আগে প্রভাতচন্দ্রের মুখে শুনে নোট করে নিয়েছি। তিনি স্মৃতি থেকে বলেছেন, তবে তাঁর স্মৃতির উপরে আমার বিশ্বাস আছে, তাই যেমন শুনেছি তাই লিখেছি।

তাঁর রচিত বই আমার কাছে কিছু কিছু আছে। সম্পাদিত বই আছে একখানা। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা চার—(১) রামমোহন প্রসঙ্গে, (২) বাংলার নারী জাগরণ, (৩) কস্তুরবা গান্ধীর জীবনী, (৪) ভারতের রাষ্ট্র ইতিহাসের খসড়া। তা ছাড়া সম্পাদনা করেছেন (অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের সহযোগে) কলেট প্রণীত রাজা রামমোহন রায়, মূল রচনার সঙ্গে আধুনিক গবেষণালব্ধ বহু তথ্য সংযোগে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি রচিত।

এর মধ্যে বাংলার নারী জাগরণ নামক তাঁর ১০৮ পৃষ্ঠার বইখানি আমার কাছে সর্বজনপাঠ্য এবং অবশ্যপাঠ্য হিসাবে খুব মূল্যবান বোধ হয়। বাংলার নারী জাগরণের ক্ষেত্রে (শিক্ষায়, স্বাধীনতায়, রাজনীতিতে) এদেশে যেসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তি প্রাণপাত করে গেছেন তাঁদের ইতিহাস চমকপ্রদ। এ

ইতিহাস একবার সবারই পড়া উচিত। আধুনিক বহু শিক্ষিত মহিলাকে আমি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি—তাঁরা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শোনেন নি। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শোনেন নি। অথচ আজ তাঁরা যে-শিক্ষা পেয়ে স্বাধীনভাবে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা যাঁদের চেষ্টায় অথবা যাঁদের উপলক্ষ করে সম্ভব হয়েছে, সে সম্পর্কে তাঁদের একেবারে কোনো ধারণা নেই, এটি খুবই অসঙ্গত মনে হয়।

প্রভাতচন্দ্রের পিতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং এই ইতিহাসে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন। এ বইতে তাঁর ইতিহাসও চমকপ্রদ। বাংলার নারী জাগরণ বই থেকে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

> "যখন দ্বারকানাথের বয়স মাত্র সপ্তদশ বৎসর, তখন তাঁহার নিজ গ্রাম মাগুরখণ্ডে (ঢাকা) তাঁহার অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় এক কুলীন কন্যাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। দ্বারকানাথ মানুষের এই নৃশংস বর্বরতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, কুলীন কন্যাদিগকে বধ করা তখনকার দিনে বিরল ছিল না। তৎকালে কুল মর্যাদার হানির ভয়ে অকুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করা চলিত না বলিয়া বহু কুলীন কন্যাকে অবিবাহিত জীবনযাপন করিতে হইত, অথবা বহুদার স্বামীকে বিবাহ করিতে, এমন কি অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইত।……দ্বাবকানাথ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন তাঁহার স্বগ্রামেই বত্রিশ-তেত্রিশটি কুলীন কন্যাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে।……"

এ সম্পর্কে দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব' নামক নিজের সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকায় লিখেছিলেন ('বাংলার নারী জাগরণ' থেকে উদ্ধৃত করি)—

> ……"মানুষের হৃদয় এককালে পাষাণ না হইলে এ অবস্থায় দ্রব না হইয়া পারে না। আমরা বাল্যকালে চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোক সকল পাঠ করিয়া স্ত্রীজাতির ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সর্বদা বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে আমাদিগের আমোদ বোধ হইত। কিন্তু যখন বুঝিলাম, ইহারা উপহাসের পাত্র নহে—তখন ভাবিলাম, যদি বিন্দু পরিমাণেও ইহাদের এই দুঃখ-দুর্গতি দূর করিতে পারি, জীবন সার্থক হইবে। এই অভিপ্রায়েই অবলাবান্ধবের জন্ম হয়।"

গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ দ্বারকানাথ ব্রাহ্মণেতরের ছোঁয়া জল খেতেন না, সেই দ্বারকানাথের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল একটি নিরপরাধ বালিকা

হত্যার ঘটনা। তাঁর জন্মান্তর ঘটল। তিনি হলেন সমাজ বিপ্লবী। তাঁর মতো হৃদয়বান আরও অনেক যুবককে নিয়ে তাঁরা দল পাকালেন। সারদাকান্ত হালদার, বরদাকান্ত হালদার, নবকান্ত, শীতলাকান্ত, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জুটে এক আশ্চর্য ডাকাতি আরম্ভ করলেন। তাঁদের কাজ হল বিপন্ন কুলীন কন্যাদের উদ্ধার করে গোপনে কলকাতা চালান দেওয়া এবং তাদের সুপাত্রে বিবাহ দেওয়া। অতি বিপজ্জনক ঝুঁকির কাজ। একটি কাজের দৃষ্টান্ত (বাংলার নারী জাগরণ থেকে) এখানে বিবৃত করি। এটি প্রসিদ্ধ বিধুমুখী হরণ মামলার কথা।

বিধুমখী মুখোপাধ্যায় নামক এক কুলীন বালিকার বিবাহ এমন একটি কুলীনের সঙ্গে ঠিক করা হয় যার তেরোটি স্ত্রী তখন বর্তমান। এই কন্যাটি বরদা হালদারের পিতৃব্য ও কন্যার অভিভাবক স্থির করেন। বরদা হালদার দলবল সহ বিধুমুখীর সঙ্গে গোপন পরামর্শের পর তাকে নিয়ে নৌকাপথে পালিয়ে আসেন। এ পথে না এলে রেলপথে পুলিস ঠিক ধরে ফেলত। মেয়েটিকে বরিশালের পথে কলকাতা আনা হয়। ঢাকা শহরে বরদা হালদার ও তস্য সহকারী রূপে প্রসন্ন গুপ্তের বিরুদ্ধে নারী হরণ মামলা দায়ের হয়। তারপর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারে হরণকারীদের এই সৎ কাজের জন্য উচ্চ প্রশংসা করা হয়। পরে বিধুমুখীর বিবাহ দেওয়া হয় সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রজনীনাথ রায়ের সঙ্গে।

এঁরা ইতিহাস রচনা করে গেছেন বাংলা সমাজের। এই যুগের এবং এই পিতামাতার বিপ্লবী মনোভাবের উত্তরাধিকার পুত্র-কন্যারাও লাভ করেছেন। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলেছি। তিনি সমস্ত জীবন নানা দিক দিয়ে দেশসেবা করে গেছেন। প্রভাতচন্দ্রও সাংবাদিকরূপে দেশসেবা করেছেন এবং ইংরেজ রাজের বিরোধিতা করে কারাবাস করেছেন। বাংলার নারী জাগরণের ইতিহাস তাঁর পিতার কর্ম ও ধর্ম জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, প্রভাতচন্দ্র এ ইতিহাস লিখে গৌণভাবে সমাজেরই সেবা করলেন। নারীজাগরণই ছিল পিতার কর্ম এবং ধর্ম।

প্রভাতচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার নীরব কর্মী। তাঁর সব কাজই স্থিরমস্তিষ্ক-জাত। পুরানো দিনের স্মৃতিকথা বলতে আরম্ভ করলে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে। বয়স ৭৬ পার হচ্ছে। এখনও দৈনিক দু' মাইল হাঁটতে পারেন। ১০-১১-৬৬

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৯০

সুনীতিকুমারের সান্নিধ্যে এসেছি অনেকদিন অনেক উপলক্ষে। ১৯৩২ সন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁকে বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছে প্রথম পরিচয়েই। তিনি সংস্কৃতিমান্। বিদ্যা যখন অহঙ্কারের বদলে অলঙ্কার হয়ে ওঠে তখন তার সংস্পর্শে এলে মন আপনা থেকেই খুশি হয়। সংস্কৃতির এই পরিচয় ব্যাবহারিক জীবনে। এটি হল ব্যক্তি-গত আচরণের কথা। নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতির অর্থ আরও জটিল এবং ব্যাপক।

সুনীতিকুমার যখন আলাপ করেন, মজলিশি মেজাজে থাকেন, তখন তাঁর সমস্ত বাক্যের ভিতর দিয়ে বিদ্যার এক অদ্ভুত বিকিরণ ঘটতে দেখা যায়, এবং তা সবাইকে সমানভাবে খুশি করে তোলে। আসলে তিনি মজলিশি মেজাজেরই মানুষ, তাই তাঁর যা কিছু দেখা এবং জানা বিষয়, তাঁর যা বিদ্যা, তাকে এক অভূতপূর্ব সরসতায় মণ্ডিত করে তিনি তাঁর আলাপের সহজ উপকরণরূপে ব্যবহার করতে পারেন। পাণ্ডিত্যের এমন সরস সংস্করণ সহজে দেখা যায় না। বিদ্যার সাম্যবাদ বলা চলে বোধ হয় একে —সব বিদ্যাই আসরে বসে তাঁর সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করা!

বিদ্যা সবার ক্ষেত্রে ঠিক এমন হয়ে ওঠে না। অবশ্য সবই মনের গঠনের উপর নির্ভর করে। তাই সাধারণত লোকের ধারণা, সংস্কৃতি এমন একটি জিনিস যা জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে শো-কেসে সাজিয়ে রাখা যায়। সংস্কৃতি বিক্রি করা যায়। আজকাল যেমন নাচগানকেই সাধারণ-ভাবে লোকে সংস্কৃতি বলে জানতে শিখেছে। সংস্কৃতি দেশে ও বিদেশে প্রচার করা হয় শুধু নাচগানের সাহায্যে। জাতীয় সংস্কৃতির এটা অবশ্যই একটি অঙ্গ, কিন্তু এখন সংস্কৃতির একমাত্র অর্থই এইটি দাঁড়িয়ে গেছে।

সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা মনে এলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃতির সমার্থকরূপে "কৃষ্টি" শব্দটি ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। এই অর্থে "কৃষ্টি" ব্যবহারে তিনি এতই বিরক্তি বোধ করতেন যে, শেষ পর্যন্ত "তাসের দেশ" (১৯৩৩) নামক নাটকে "কৃষ্টি" নিয়ে

যথেষ্ট বিদ্রূপ করেছেন এবং ঐ সঙ্গে “অবদান” শব্দটির ব্যাপক অপব্যবহারের প্রতিও একটু খোঁচা প্রয়োগ করেছেন। একটুখানি নমুনা দিই—

রাজা। ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম। কী রাজাসাহেব।

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপ-প্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে। কৃষ্টি কৃষ্টি কৃষ্টি।

অন্যত্র—

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি তাসদ্বীপের কৃষ্টি। বাঁচাও সেই কৃষ্টি।

অন্যত্র—

গোলাম। এ কী হল। হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি।

গোলামের মুখের একটি গানেও বলা হয়েছে, “কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি, সে দেশে নিশ্চিত অনাসৃষ্টি।”

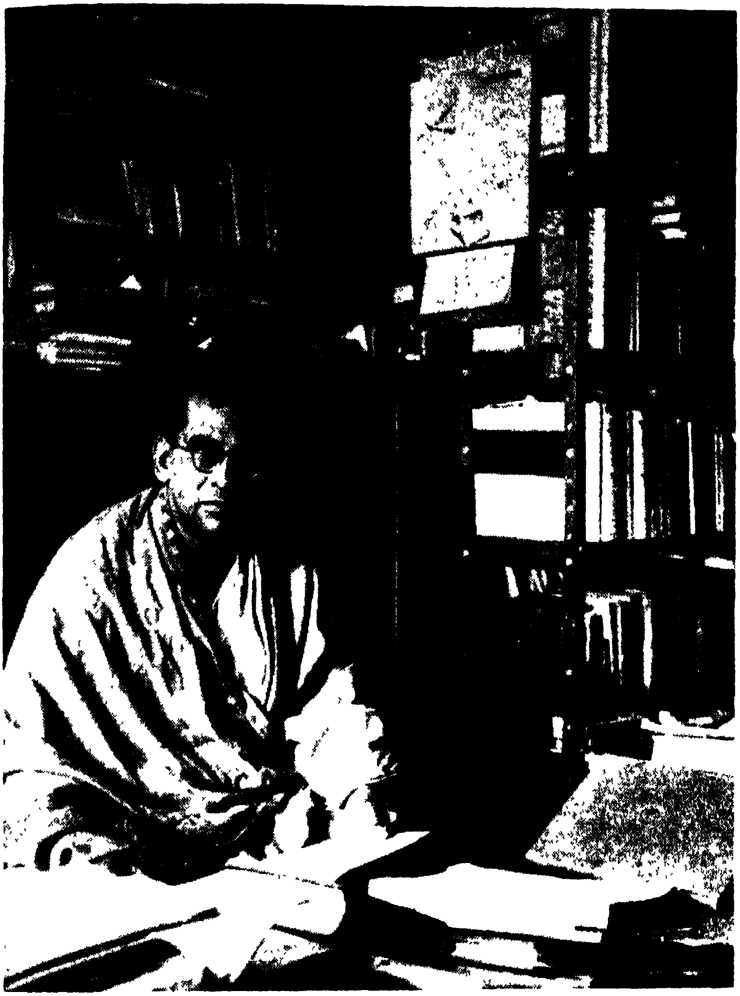
১৯৩৭, ২১শে ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে গঙ্গাবক্ষে রবীন্দ্রনাথের বোটের মধ্যে বসে (সেখানে সুনীতিকুমার উপস্থিত ছিলেন) আমি কৃষ্টি প্রসঙ্গে কথা তুলে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলাম, শব্দের ব্যবহার নিয়ে যখন যে রীতিকে গাল দেওয়া যায়, কিছুদিন বাদে দেখি সেটাই স্থায়ী আসন লাভ করেছে, যেমন সংস্কৃতি অর্থে আপনি কৃষ্টি ব্যবহারের বিরোধী, কিন্তু ওটা নিয়ে আলোচনার ফলে কৃষ্টি আরও বেশি বেশি চলছে। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বলেছিলেন, ‘কিন্তু আমার কৃষ্টি আছে এটা স্বীকার করে তো?’ (এই পর্যায়ের প্রথম রচনা দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু এই সংস্কৃতি ও কৃষ্টি দুটি শব্দের অর্থ যে বিভিন্ন, তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ সুনীতিকুমারই করেছিলেন এর বছর পনেরো আগে ১৯২২ সনে। এবং রবীন্দ্রনাথের “কৃষ্টি”বিরোধিতার মূলেও সুনীতিকুমার। আমি সুনীতি-কুমারের ‘সাংস্কৃতিকী’ (বাক্-সাহিত্য) গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ “সংস্কৃতি” থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি প্রমাণস্বরূপ।—(গ্রন্থখানি সুনীতিকুমার ৩০।৩।৬২-তে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, এতদিনে প্রাপ্তিস্বীকার করা গেল।)

…"কৃষ্টির অর্থগত পরিবর্তন বৈদিক আর সংস্কৃত সাহিত্যে যা দেখা যায়, তা থেকে কিন্তু বাঙলায় গৃহীত এর culture অর্থ সমর্থিত হয় না। কৃষ্টির মূলগত অর্থ 'কর্ষণ-কার্য,' তা থেকে 'চাষ-করা ক্ষেত,' তা থেকে 'ক্ষেত্র, ভূমি, দেশ,' এবং তারপরে 'দেশের মানুষ, জাতি'। বৈদিক ভাষায় 'কৃষ্টি' মানে 'জাতি' ; যেমন 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' মানে 'পাঁচ জাতি'—প্রথম-প্রথম আর্যজাতির পাঁচটি প্রধান শাখা…সম্বন্ধে এই পঞ্চকৃষ্টয়ঃ শব্দ প্রযুক্ত হত, পরে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝাবার জন্য এই শব্দের অর্থ প্রসার ঘটে। 'চাষ'-অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দ পরবর্তী সংস্কৃতে মেলে। Culture অর্থে নয়। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দ সম্পর্কে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন।

"সংস্কৃতি শব্দটি culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশি হন।……'সংস্কৃতি' শব্দটি culture বা civilization অর্থে আমি পাই প্রথমে ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। Culture-এর বেশ ভাল প্রতিশব্দ ব'লে শব্দটি আমার মনে লাগে।…১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। তিনি আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়েছিলেন কিনা, জানি না—সম্ভবত শব্দটি তাঁর অবিদিত ছিল না। তবে আমার বেশ মনে আছে culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, 'কৃষ্টি' শব্দ আর ব্যবহার করা ঠিক হয় না, এ কথাও বলেন।"……

সুনীতিকুমার সম্পর্কে যিনিই কিছু লিখেছেন, তাঁরই প্রধান কথাটি মানুষ সুনীতিকুমার সম্পর্কে। পরিচয়ে আলাপে এই দিকটিই তাঁর বড় হয়ে ওঠে। পাণ্ডিত্য যাঁর বেশি তিনি উগ্রস্বভাবের হন, অথবা মিতবাক হন, গম্ভীর প্রকৃতির হন, এই জাতীয় সব ধারণা সুনীতিকুমার তাঁর জীবনে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। তাঁকে একমাত্র শিক্ষকরূপে চিহ্নিত করাতেও এই ভুল হয়ে থাকে। কিন্তু আমি তাঁর সাহচর্যে এসে তাঁর সম্পর্কে একটি বড় সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি এই যে, শিক্ষকতা তাঁর জীবিকা হলেও মনে-প্রাণে তিনি শিক্ষার্থী। তাঁর শিক্ষার বয়স ও কাল আজও শেষ হয় নি। চোখ ও মন পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সদাজাগ্রত। সুনীতিকুমারকে লেখা (২৯।৯।১৯) প্রমথ চৌধুরীর একখানা চিঠির একটি কথা থেকে তাঁর মনীষার এই দিকটি সম্পর্কে ভালভাবেই জানা যাবে। প্রমথ চৌধুরী লিখছেন—



সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৩৯

"আমরা বলতুম যে সুনীতির কানে ধরা পড়ে না এমন শব্দ নেই। এখন দেখছি তোমার চোখে ধরা পড়ে না এমন জিনিসও কম আছে।"

এটি স্বভাবতই সত্য কথা। সুনীতিকুমার ভাষাতাত্ত্বিক। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। এ কাজে সকল দেশের মানুষের ভাষার তুলনামূলক রূপ ও তার শ্রেণীবিভাগ, মূল ধ্বনিতত্ত্ব ও আনুষঙ্গিক বহু বিষয়ে চরম জ্ঞান থাকা দরকার। মানুষের ভাষা, মানুষের সৃষ্টি। জন্মগত অধিকার এতে নেই। বংশগতি নিয়ন্ত্রণকারী gene ভাষার বাহক নয়। অতএব ভাষার মূল খুঁজতে গেলে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য আরও যে যে উপায় অবলম্বন করেছে, তার সঙ্গেও পরিচয় থাকলে কোনো একটি ভাষাকে তার যথার্থ পটভূমিতে এবং পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হয়। মানুষ আত্মপ্রকাশের জন্য সঙ্গীত, কারুশিল্প এবং চিত্রশিল্পও তার অন্যতম প্রধান উপায়স্বরূপ জ্ঞান করেছে, বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজ নিজ কল্পনা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছে এবং কোনো একটা কাল্পনিক অদৃশ্য ক্ষমতাকে মান্য করে চলবার রীতি প্রচলন করেছে। এইসব আত্মপ্রকাশের উপায় ও তার সঙ্গে আত্মরক্ষার উপায়ও তার নিজস্ব উদ্ভাবন। গৃহ নির্মাণ, চাষ, যন্ত্র উদ্ভাবন, সমাজ বা গোষ্ঠীর গঠন প্রভৃতি এর আওতায় পড়ে। মোটের উপর এ সবই তার আত্মপ্রকাশেরই একটি জটিল রূপ, এবং সব মিলিয়ে যা হয় তাই তার সামাজিক সামগ্রিক সংস্কৃতির রূপ। ভাষাও সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। অতএব শুধু ভাষার ইতিহাস জানতে আনুষঙ্গিক বহু জিনিস জানা দরকার। এই জানা in depth পরিমাপ করতে হলে সংস্কৃতির সকল বিভাগের সঙ্গে কতখানি পরিচয়, এ প্রশ্ন এসে পড়ে। অতএব সুনীতিকুমার যে, শিল্পের নানা বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছেন, (এবং স্বয়ং উচ্চাঙ্গের চিত্রশিল্পী হওয়াতে এই জ্ঞানলাভ তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে) তা অকারণ নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি সমাজের আদি ও ঐতিহাসিক যুগের নানা শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন আপন রুচির গরজে, ভাষাতত্ত্বকে গভীরভাবে আত্মস্থ করার গরজে এবং শিল্পকে ভালবাসেন বলে। তাঁর নানা জাতীয় শিল্প-নমুনার সংগ্রহ দেখলেই সে বিষয়ে অনেকটা ধারণা হবে। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করে সংস্কৃতির ত্রিমাত্রিক (থ্রী-ডাইমেনশন্যাল) রূপ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছেন।

১৯৬২ সনের (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯) 'কথা সাহিত্য' নামক মাসিক, বিশেষ সুনীতিকুমার সংবর্ধনা সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় আমি

সুনীতিকুমারের নিজহাতে আঁকা কয়েকখানি ছবি সহ তাঁর শিল্পকৃতির দিক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। কিন্তু চিত্রগঠন তিনি ভাষার সাহায্যেও যে কত সুন্দরভাবে করতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে তাঁর 'পথ চলতি' (গ্রন্থপ্রকাশ) নামক বইয়ের নানা রচনায়, বিশেষ করে তাঁর শৈশবস্মৃতি বর্ণনার মধ্যে। একটুখানি পড়লেই এব চিত্রধর্মিতার আকর্ষণ মনকে বিরামহীনভাবে টেনে নিয়ে যাবে শেষ কথাটি পর্যন্ত। তবু সবখানি পাঠের আনন্দ থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করে আমাকে নমুনাস্বরূপ অল্প একটুখানিই এখানে উদ্ধৃত করতে হল—

······"আমাদের পাঠশালায় যাবার পথে সুকিয়াস স্ট্রীটের উপরে একটা মস্ত মুদির দোকান ছিল। আমাদের সংসারের "মাসকাবারী বাজার", প্রতি ইংরিজি মাসের গোড়ায় বাবা মাইনে পাবার দু'-একদিনের মধ্যেই আনা হ'ত। ঠাকুরদাদা সাধারণতঃ এই বাজার ক'রে আনতেন। হেদুয়া পুখুরেব কাছে মাণিকতলা স্ট্রীটে এক বড়ো বাজার ছিল—শিমলার বাজার। সেই বাজারের সামনে খুব বড়ো একখানা গোলদারী দোকান ছিল, গোবর্ধন পাল আর শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে—এঁদের দোকান ছিল। ঠাকুরদাদা এই দোকানকে "গোবর্ধন মুদী"-র দোকান ব'লতেন। সারা মাসের উপযোগী চা'ল, দা'ল, তেল, ঘী, গুড়, চিনি, নুন, আটা, ময়দা আর মশলা সংগ্রহ ক'রে রাখা হ'ত। একটু বড় হ'য়ে ঠাকুরদার সঙ্গে এই দোকানে আমিও যেতুম। সেখানে বিরাট্ বিরাট্ বস্তার মধ্যে মন মন রকমারী চা'ল, সে-রকম বিরাট্ আকারের জালার আর গামলার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের দা'ল, মাটির মটকীর মধ্যে আর ছোট ছোট টিনের মধ্যে ঘী, ঘরের অর্ধেকখানা জোড়া গুড়ের নাগডি, সিমেন্টের চৌবাচ্চা ভর্তি নুন, এ-সমস্ত আমার শিশু-মনকে তখন যেন অভিভূত ক'রে ফেলত। ক্রমাগত নানান রকমের জিনিস, কাঁচা খাদ্য-দ্রব্য, বড়ো বড়ো দাঁড়িপাল্লায় ওজন হ'চ্ছে; খ'দ্দেরের ভীড়; একটি ছোটো বাক্স কোলের সামনে রেখে দোকানের মালিকেরা লম্বা লম্বা কাগজের ফালির উপর খস্‌খস্ ক'রে ফর্দ লিখছেন, মুখে-মুখে হিসেব ক'রে টাকার অঙ্ক ফেলছেন; বাইরে ঝাঁকা নিয়ে ডজনখানেক পশ্চিমা মুটে' অপেক্ষা ক'রছে, ভিতরে এসে মাল ওজন ক'রছে, এরাই জিনিস-পত্র ঝাঁকায় ভ'রে মাথায় ক'রে খ'দ্দেরের বাড়ি পৌঁছে দেবে।"

হুতোমের নক্সা মনে পড়ে ভাষাভঙ্গিতে। আর এক স্থান থেকে অন্য

দোকানের কিছু শোনাই—

"দোকানের চারিদিকে নানা ধামার মধ্যে, মাটির গামলায় আর হাঁড়িতে চা'ল, দা'ল প্রভৃতি জিনিস রেখে, সামনে তেলের আর ঘীয়ের হাঁড়ি নিয়ে, বাঁশের উঁচু মাচার উপরে পসার সাজিয়ে' দোকানী ব'সে জিনিস বিক্রি ক'রত। খ'দ্দেরের বাটিতে বা অন্য পাত্রে একটি ছোট ছেঁদাওয়ালা কাঠের খুরির মতন পাত্রের মধ্য দিয়ে বাঁশের হাতাওয়ালা নারকল মালায় ক'রে হাঁড়ি থেকে তেল নিয়ে ঢালত—ঐ কাঠের ছেঁদা-খুরিটি ফুন্দিলের কাজ ক'রত, তেল চারিদিকে ছড়িয়ে' প'ড়ত না। মুদীর সামনেই একটা মাটির গামলায় এক গামলা কড়ি থাকত, আর সেই কড়ির গামলার উপর একটি কাঠের বারকোশ। সেই বারকোশটি ছিল তখনকার দিনের দোকানের coun.er, তার উপর জিনস-পত্র রাখা হ'ত—খ'দ্দেরের বাটি, ঘটি, বোতল আর ওজন-করা জিনিসের ঠোঙা।...উত্তম-মুদীর দোকানে বারকোশ-কাউণ্টারের সামনে মাচার উপরে একটি ছোট কাঠের চৌকির উপরে দোকানদার ব'সত। তার পাশে, মাথায় ছেঁদাওয়ালা একটা বাক্স থাকত, তার ভিতর টাকা-পয়সা ফেল্‌ত। দূরের গামলা বা ধামা থেকে কোনো জিনিস নিতে হ'লে, খুব লম্বা, বাঁশের হাতলে বড়ো মালা লাগানো থাকত, তাই দিয়ে জিনিস তুলে নিত'। একটা জিনিস আমার বেশ লাগ্‌ত, উপরের চালের বাঁশ থেকে একটা মোটা শক্ত দোড়ি মুদীর মাথার কাছে ঝুল্‌ত, তার তলায় কতকগুলো ন্যাকড়া দিয়ে মুঠো ক'রে বেশ একটা ধরবার জায়গা, যাতে হাত পিছলে না যায়। উঠে দাঁড়াতে হ'লে মুদী ঐ দোড়ি ধ'রে উঠত, আর দূরের জিনিস হ'লে দোড়ি ধ'রে ঝুঁকে' নিত।"...

সুন্দর এই বর্ণনাগুলি, পড়তে বসলে সেকালের এক একটি দোকান ঘর, তার বিক্রেতা, ক্রেতা ও বিক্রেয় জিনিসপত্র সহ ছবির মতো ফুটে ওঠে চোখের সামনে। সুনীতিকুমার নিজে চিত্রকর, তাই ভাষায় ছবি আঁকা এমন সহজ তাঁর কাছে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার পরে এমন সুন্দর ছেলেবেলা আর আমি পড়ি নি।

প্রমথ চৌধুরীর পূর্বে উল্লেখিত চিঠির কথাটিই আবার এখানে স্মরণ করি—"তোমার চোখে ধরা পড়ে না এমন জিনিসও কম আছে।"

১৯১৯ সনের লেখা এই চিঠি, ১৯৫১ সনে লেখা এই শৈশবস্মৃতি। তখন পত্রলেখক বলেছিলেন সুনীতিকুমারের শিরোবাসী দুটি চোখের দেখার

কথা, আর এই 'স্মৃতি'তে দেখা যাবে তাঁর মনোবাসী দুটি চোখের দেখার কথা দুটি দেখাই সমান চিত্রধর্মী।

তাঁর বাল্যস্মৃতি আমার নিজের কাছে আরও বেশি ভাল লেগেছে এ জন্য যে, আমিও শৈশবে দূর পল্লীতে প্রায় এই রকমই দেখেছি। তার বর্ণনা দিলেও প্রায় এই রকমই হবে। তবে সুনীতিকুমার তাঁর বাল্যকালে কড়ির প্রচলন দেখেছেন, আমি তা দেখি নি। ১৯১০ সনে প্রথম কলকাতা আসি অল্পদিনের জন্য, এবং তারপরে বহুবার এসেছি এবং বড় রাস্তার উপরেই এ জাতীয় দোকান অনেক দেখেছি, সম্ভবত এখনও বাজার এলাকার ভিতরে ঢুকলে এ জিনিস দেখা যাবে। তবে আমি তেলের জন্য দোকানে ব্যবহৃত তালের মালায় বাঁশের হাতল লাগানো হাতা দেখেছি পল্লীগ্রামে। নারকল মালার হাতা দেখি নি।

এই বইতে "হেড-পণ্ডিত মশায়" নামক স্মৃতি অধ্যায়ের এক স্থানে আছে —"বাঙলা ব্যাকরণের পাট আমাদের এই হাই স্কুলে ছিল না।" অথচ এই ছাত্রই পরে ব্যাকরণের সর্বপ্রধান পণ্ডিতরূপে বাংলাদেশে এবং ভাষা-তাত্ত্বিকরূপে পৃথিবীখ্যাত হয়েছেন। এমন হয় সংসারে। ভাগ্য-দেবতা বড়ই পরিহাসপ্রিয়।

সুনীতিকুমার আমার চেয়ে প্রায় আট বছরের বড়, আমি তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পাই নি, কিন্তু তিনি নিজেই তো একটি সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়! এবং তাঁর কাছে বসে তাঁর মধ্যে আরও অনেক বড় জিনিস দেখেছি। নানা উপলক্ষে তাঁর কাছে এসেছি। তাঁর সুকিয়াস রো-এর বাড়িতেও গিয়েছি এবং নতুন বাড়ি 'সুধর্মা'য় প্রবেশের কিছুদিনের মধ্যেই, মনে পড়ে, নিমন্ত্রণ খেয়েছি। শিশিরকুমার ভাদুড়িও সেদিন ভোজন-পংক্তিতে ছিলেন, মনে আছে। শনিবারের চিঠির সম্পাদনাকালে (১৯৩২ থেকে ১৯৩৬-এর কয়েক মাস) প্রথমে তাঁর সান্নিধ্যে আসি। আমার একটি রচনা শনিবারের চিঠিতে ছাপা হবার জন্য তৈরি হয়েছিল, তার প্রুফ তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। কিন্তু তার বিষয়টি এমনই সাময়িক ছিল যে, তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে সেটাকে আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। তখন "শ্রী" কথাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীলে থাকার বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর মুসলমান আন্দোলন করছিলেন। এই আন্দোলন যে যুক্তিহীন, তাই নিয়েই আমার সে রচনাটি তৈরি হয়েছিল। এবং এটি যে তাঁর ভাল লেগেছিল তাইতে আমি তখন যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছিলাম।

শনিবারের চিঠির আড্ডা এবং ধর্মতলা স্ট্রীটে বঙ্গশ্রী মাসিকের আড্ডা—দুইয়েতেই সুনীতিকুমারের আবির্ভাব সবার পক্ষেই আনন্দদায়ক ছিল। পূর্বে উল্লেখিত সংবর্ধনা সংখ্যায় আমি সুনীতিকুমারের চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও যে কথা বলেছি তা এই—

…"আর দেখেছি রসনাবিলাস। সে রসনা যেমন প্রিয়-বাক্যে বিলাসী তেমনি প্রিয় খাদ্যে। বঙ্গশ্রীর টেবিলে খবরের কাগজে পরিবেশিত মুড়ি বেগুনি পেঁয়াজির পাহাড়ের দিকে সবার সঙ্গে গণতান্ত্রিক দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করতে তাঁর কৌশল অন্যান্যের চেয়ে কিছু কম ছিল না। নীরস পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্য ভিন্ন অন্য কিছুতে খুব মাততে পারেন না।"

শিল্পের সকল বিভাগেই সুনীতিকুমারের সমান আকর্ষণ। রন্ধনশিল্পেও তাঁর আকর্ষণ, অবশ্য ভোক্তারূপে। এবং এ শিল্প মানুষের সমাজ সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকৃত।

বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁর একটি রচনায় বলেছিলেন, কোনো জিনিসের সম্পর্কে তথ্য জানা থাকলে সেই জিনিস বেশি উপভোগ করা যায়। এ তথ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য হতে পারে, ঐতিহাসিক তথ্য হতে পারে, ভৌগোলিক তথ্য হতে পারে এবং আরও অনেক রকম হতে পারে। কিন্তু কোনো জিনিস উপভোগে তার সম্পর্কিত তথ্য জানা আর না জানার মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা বোঝা বা বোঝানো শক্ত।

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর "এ প্যাসেজ টু ইংল্যাণ্ড" পড়তে গিয়ে পদে পদে এ কথা অনুভব করেছি যে, তিনি বিমানে উড়ে যেতে বইতে পড়া জ্ঞান থেকে রোমের বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সৌধ বা সৌধাবশেষও আকাশ থেকে নিঃসন্দেহরূপে চিনতে পেরে খুবখুশি হয়েছিলেন। প্রায় সমস্ত বইখানাই এই পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে প্রথম দর্শন মিলিয়ে দেখে বেশি আনন্দ পাওয়ার ইতিহাস। বারট্রাণ্ড রাসেলের উক্তি সত্য মনে হবে নীরদবাবুর দৃষ্টান্ত থেকে।

তেমনি সুনীতিকুমার যখনই কোনো বিদেশী ভাষা শোনেন বা পড়েন, বা প্রথম কোনো দেশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন, তখন এ সবের পটভূমির ইতিহাসটা অবশ্যই তাঁর মনে জেগে ওঠে, এবং বাইরে থেকে সাধারণ মানুষের দেখা বা জানায় যে আনন্দ জাগা সম্ভব, নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পান। তবে সব জিনিস উপভোগের মুহূর্তে তার ইতিহাস মনে পড়া কি অত্যাবশ্যক? কারণ আড্ডায় মুড়ি উপভোগের সময় বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্বজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সুনীতিকুমার যে

আমাদের অপেক্ষা তা বেশি উপভোগ করেছিলেন তা বোধ হয় না। প্রতি-দিনের পরিচয়ে কোনো জিনিসের পটভূমি অবান্তর হয়ে ওঠে সম্ভবত।

কিন্তু তত্ত্বকথা থাক। আমি 'ভালবাসা'• বিষয়ে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। রবীন্দ্রনাথ যৌবন বয়সে একটি গান রচনা করেছিলেন —ভালবাসায় বিভ্রান্ত এক সখী আর এক সখীকে ভালবাসা কাকে বলে জিজ্ঞাসা করছেন, এই হল সেই গানের মূল কথা। প্রথম কয়েকটি কথা এই—

সখী, ভাবনা কাহারে বলে।
সখী, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বল, দিবস-রজনী
'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা'—
সখী, ভালোবাসা কারে কয়!
সে কি কেবলি যাতনাময়।
তাহে কেবলি চোখের জল?…

ইত্যাদি

এই গায়িকা-সখী আগের যুগের, তাই তিনি সুনীতিকুমারের "সাংস্কৃতিকী" নামক গ্রন্থপাঠের সুযোগ পান নি। কারণ এই বই ছাপা হয়েছে ১৯৬১ সনে। এই "সাংস্কৃতিকা"র প্রথম প্রবন্ধটি যদি তাঁর পড়া থাকত তা হলে "ভালোবাসা কারে কয়" তা তিনি বিশদভাবেই জানতে পারতেন। এবং বুঝতে পারতেন ভালবাসা কেবলই যাতনাময় নয়। কারণ ভালবাসার ইতিহাস সহজেই তিনি আয়ত্ত করতে পারতেন, বিনা অশ্রুতে, বিনা যাতনায়—ভালবাসা without tears!

"ভালোবাসা কারে কয়"—তার উত্তর ভাষাতত্ত্বের তরফ থেকে সুনীতি-কুমার এইভাবে দিচ্ছেন—

"ইংরিজি love-এর প্রতিশব্দ এখন যা বাঙলায় জোরের সঙ্গে চলছে, সেটা হ'চ্ছে 'ভালোবাসা'। ইংরেজিতে খুবই বাচংযমতা আছে, ওদের ভাষায় 'লাভ্' এই একটি 'সিলেব্‌ল্' বা অক্ষরের দ্বারা প্রকাশিত ভাবটিকে বাঙলায় জানাতে হ'লে কিন্তু চারিটি অক্ষর 'ভা-লো-বা-সা'-র দরকার হয়। কিন্তু 'ভালোবাসা' শব্দটি (বা মিলিত শব্দ দুইটি), দু-শ বছর আগে বাঙলা ভাষায় 'লাভ্' এই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হ'ত না। তখন ভালো-বাসা'-র অর্থ, শুদ্ধ বা কেবল প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, প্রীতি, প্রভৃতি ছিল না;

—'ভালোবাসা' এই মিলিত শব্দটি কতকটা যেন বর্ণ- বা রাগ-হীন নিষ্প্রাণ শব্দ ছিল। এর অর্থ ছিল তখন, 'ভালো বলে অনুভব করা, ভালো মনে করা।' 'ভালো-বাসা' শব্দের 'বাসা' বা বাস্ ধাতু, 'বোধ করা' অর্থে প্রযুক্ত হ'ত—এখন এই অর্থে ধাতুটি অপ্রচলিত হ'য়ে যাচ্ছে। 'ভালোবাসা'-র পাশাপাশি 'মন্দ-বাসা' শব্দটিও মাঝে মাঝে শোনা যায়; কিন্তু প্রাচীন বাঙলাতে 'বাস্' ধাতু বেশ জীবিত ধাতু। এই ধাতুর সহযোগে 'ভালো-বাসা,' 'মন্দ-বাসা'-র মতন পুরাতন বাংলায় 'ভয়-বাসা,' 'ঘৃণা-বাসা,' 'লজ্জা-বাসা,' 'দুঃখ-বাসা' প্রভৃতির প্রয়োগ খুবই মেলে।...খ্রীষ্টীয় ১৮-র শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার ভাওয়ালে ব'সে পোর্তুগীস পাদ্রি বা সাধু-বাবা মানোএল দা-আস্সুম্পসাউঁ তাঁর যে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' বই লেখেন, আর যে বই রোমান অক্ষরে লিস্বনে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপান, তাতে কিন্তু 'ভালোবাসা' অর্থে 'দয়া করা' প্রযুক্ত হয়েছে, অন্য শব্দ নয়; যীশু মানুষের প্রতি দয়া করেন, আর 'মাউগ' আর 'ভাতার'ও পরস্পরের প্রতি দয়া করে।"

রবীন্দ্রনাথের গানের সখী শুধু এইটুকু পড়লেই তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যেতেন। 'ভালোবাসা কারে কয়' কোনো এক যুগে এর অর্থ শেষ হয় নি; যুগে যুগে এর ব্যাবহারিক অর্থের বদল ঘটেছে। (উক্ত সখীর প্রশ্ন যদি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি বিষয়ক হয়, তবে তার জন্য ফ্রয়েডের কাছে যাওয়া প্রয়োজন।)

এই প্রসঙ্গে বলি, রবীন্দ্রনাথও 'বাসা' পৃথক ধাতুরূপে ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত: "নাহি জানি মনে কী বাসিয়া/পথে বসে আছে কে আসিয়া।"

সুনীতিকুমারের ভাষাতত্ত্ব ভয়ানক কিছু নয়। এই একটি শব্দের সঙ্গে যে ইতিহাস জড়িয়ে আছে তা অন্য যেকোনো কাহিনীর চেয়ে কি কম চিত্তাকর্ষক?

সুনীতিকুমারের শিল্পবোধের উন্মেষ প্রথম জীবন থেকেই লক্ষ্য করা যায়। সংবর্ধনা সংখ্যা কথা সাহিত্যের প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে তাঁকেই প্রমাণরূপে দাঁড় করিয়েছি। তা থেকে একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করি—

..."পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অভ ওরিয়েন্টাল আর্ট কর্তৃক প্রকাশিত মুখপত্রের বিশেষ গোলডেন জুবিলী সংখ্যাটি অবনীন্দ্রনাথ সংখ্যা করা হয়েছে। এই সংখ্যাতে সুনীতিবাবুর একটি দীর্ঘ (ইংরেজী) রচনা আছে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে।...তিনি বলছেন,

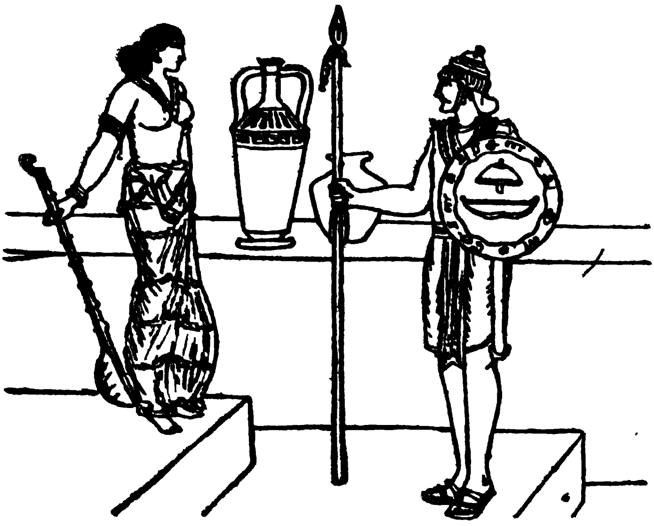
তাঁর বয়স যখন ১৩ বছর তখনই তিনি অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে চমৎকৃত হন। কথাটি ইঙ্গিতপূর্ণ। জন-সাধারণ যখন আর্টের বিচারক সেজে অবনীন্দ্রনাথকে তিক্ত সমালোচনায় জর্জর করছে, সে সময় বালক সুনীতি-কুমার অবনীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়েছেন। তিনি আরও বলছেন—From very childhood I had formed a very great love for pictures. I used to collect all sorts of pictures, and particularly what attracted me most was pictures of soldiers in various kinds of uniform from different countries, and illustrations of great historical events, or of romantic stories."

তাঁর শিল্পপ্রিয়তার ইতিহাস আছে এই কথাগুলোর মধ্যে। কিন্তু ছবি আঁকার বিদ্যাটি তিনি নিজেই আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি যখন স্কটিশ্ চার্চ কলেজে ইণ্টারমীডিয়েট ক্লাসের ছাত্র (১৯০৮) তখন স্মিথের গ্রীস ইতিহাস তাঁদের পাঠ্য ছিল। এই বইতে গ্রীকদের ছবি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, এবং তাঁর আঁকা ছবিতেও যে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তা এ জন্যই। (কিন্তু চিত্রশিল্প মাত্রেই যাঁর কাছে গ্রীক তিনি এই গ্রীক প্রভাব না বুঝলেও ছবির সৌন্দর্য উপভোগে অসুবিধা বোধ করবেন না।)

সুনীতিকুমার আমাকে বলেছেন, তাঁর এই নানা দেশীয় ইউনিফর্ম পরা সৈনিক-চিত্রপ্রিয়তা একবার খুব কাজে লেগে গিয়েছিল কলেজে পড়বার সময়েই। শিশিরকুমার ভাদুড়ি তখন (১৯০৮) তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এবং সুনীতিকুমার ইণ্টারমীডিয়েটের। কলেজ থেকে জুলিয়াস সীজার অভিনয় হবে। থিয়েটারের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-পোশাক তখন ভাড়া পাওয়া যেত গ্র্যাণ্ড হোটেলের নিচের একটি দোকানে। একজন উদ্যোগী ব্যক্তি সেখান থেকে পোশাক এনে দেবেন ভার নিলেন, এবং তার জন্য ১০০ টাকা অগ্রিম নিয়ে নিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তেও যখন পোশাক এলো না, তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সাজ-পোশাকের দোকানে ঐ টাকা জমা পড়ে নি, লোকটি নিখোঁজ এবং আরো জানা গেল ঐ দোকান দেশী লোকদের কাছে কোনো পোশাক ভাড়া দেয় না।

তখন সুনীতিকুমার বললেন, কিছু ভাবনা নেই, আমরাই পোশাকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তিনি তখনই আনন্দ সিংহ ও নীহার বসু নামক দুই কলেজ বন্ধুর সহযোগিতায় কাজচলা গোছ পোশাক তৈরি করে জুলিয়াস সীজার অভিনয়ের সফল ব্যবস্থা করে দিলেন। এই নাটকে শিশিরকুমার

ব্রুটাসের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। এই সময় থেকেই শিশিরকুমারের সঙ্গে তিনি স্থায়ী সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। এবং পরে ইনস্টিটুটে চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়েও তিনি গ্রীক সৈন্যদের পোশাক রচনায় সাহায্য করেছিলেন। "সাংস্কৃতিকী" নামক গ্রন্থখানি তিনি "অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ ও সোদরোপম সতীর্থ" শিশিরকুমার ভাদুড়ির নামে উৎসর্গ করেছেন।



'র অঙ্কিত একটি চিত্র

শিশিরকুমারের নাট্যরূপ পরিকল্পনায় সুনীতিকুমার নেপথ্য থেকে অনেক সাহায্য করেছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর "বাংলা রঙ্গালয় ও শিশির-কুমার" নামক গ্রন্থে লিখছেন—

> "লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শিশিরকুমার যাঁদের সাহায্য গ্রহণ করে-ছিলেন তাঁদের সকলেই এসেছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে থেকে। অভিনেতাদের সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়। আড়ালে আড়ালে থেকে তাঁকে সাহায্য করতেন আরো কয়েকজন বন্ধু যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।"

আমার সঙ্গে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত সুনীতিকুমারের সান্নিধ্য অব্যাহত ছিল, কিন্তু তারপর তিনচার বছর মাঝে মাঝে দেখা হলেও বৈঠক কোথাও ছিল

না। ১৯৪০ থেকে কয়েক বছর (সম্ভবত তিন বছর) আমি ম্যাট্রিকুলেশন বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষকরূপে প্রধান পরীক্ষক সুনীতিকুমারের গৃহে তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পাই—পূর্ববর্ণিত সাহিত্যিক আড্ডার অনুকল্প আড্ডা বলা যায় একে। এখানেও বন্ধুদের মিলন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অজয় ভট্টাচার্য, প্রমথ বিশী, মনোজ বসু প্রভৃতির। কুলদারঞ্জন রায়ও ছিলেন এই দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষক। বহু পরীক্ষকের ভিড়, তাঁরা খাতা বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতেন, খাতা দিতে গিয়ে অন্যের আনা খাতাও গুনে নিতে হত। হিসাব মিললে সুনীতিকুমার রসিদ দিয়ে দিতেন। পর বৎসর থেকে উপরন্তু স্ক্রুটিনির কাজও জুটল। অন্য পরীক্ষকের খাতা পরীক্ষা করে দেখতে হত মার্ক দেওয়া যথাযথ হয়েছে কি না, টোট্যাল ঠিক হয়েছে কি না, কোনো প্রশ্নের দু'বার উত্তর লিখলে তা ধরা পড়েছে কি না, অথবা কোনো উত্তরের পাশে মার্ক দিতে ভুল হয়েছে কি না। স্ক্রুটিনাইজারের এই ছিল কাজ। দিনে তিন চার শ থেকে সাত আট শ পর্যন্ত খাতা কেউ কেউ এভাবে পুনঃপরীক্ষা করে দেখতে পারতেন। আমি বেশি পারতাম না। এই স্ক্রুটিনির কাজেও কেউ কেউ ভুল করে বসতেন। একবার একজন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁর কোনো আত্মীয়ের মার্ক জানবার জন্য রোল নম্বর সহ লোক পাঠিয়েছিলেন। এই অনুরোধে সুনীতিকুমারকে বেশ একটু বিরক্ত বোধ করতে দেখেছি তখন।

কিন্তু সেই বিশেষ রোল নম্বরের খাতা বার করে এক নতুন বিপত্তির সৃষ্টি হল। অর্থাৎ মূল পরীক্ষক একটি উত্তরে মার্ক দিতে ভুলে গেছেন, এবং যিনি স্ক্রুটিনি করছিলেন তিনিও তা ধরেন নি, ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কম নয়, মোট ১৩ মার্ক বাদ পড়েছে! অতএব একই সঙ্গে দুটি বিপত্তি! স্ক্রুটিনি হয়ে গেছে এমন খাতা থেকে এ জাতীয় ভুল, স্ক্রুটিনাইজারের পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু অপেক্ষিত বিপদ ঘটল না। সুনীতিকুমারের উদারতা স্ক্রুটিনাইজারকে বাঁচিয়ে দিল। পরীক্ষকের ভুল ধরা পড়লে তা তালিকাভুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার নিয়ম। কিন্তু সুনীতিকুমার কোনো পরীক্ষককে সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁর বৃত্তিচ্যুতি ঘটতে পারে এমন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে পারতেন না। তাঁর স্নেহশীল উদার মন কোনোমতেই পরীক্ষকদের ক্ষতি' হবে এমন কাজ করতে পারত না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষার খাতা দেখা সম্পর্কে একটু বেশি অসতর্ক ছিলেন। সুনীতিকুমার তা জানতেন, কিন্তু তবু

প্রতিবারই তিনি তাঁকে বন্ধুর মতোই গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে আমি সুনীতিকুমারের নিজেরই উক্তি উদ্ধৃত করেছি, এই পর্যায়ের "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়" নামক রচনায়। কয়েক বছর পরে অন্য প্রধান পরীক্ষকের কাছে কাজ করতে সেই পরীক্ষকের কড়াক্কড়ি মেজাজ দেখে বিভূতিবাবুর খাতার ত্রুটি-বিচ্যুতি আমি নিজেই, তাঁর খাতা পরীক্ষার সময়, সংশোধন করে দিয়েছি একবার। কিন্তু পরে অন্যের হাতে পড়াতে তা আর সম্ভব হয় নি, তাঁর পরীক্ষকবৃত্তিরও ছেদ পড়ে গেল তখন থেকে।

'সুধর্মা'র নিচের তলার একটি প্রশস্ত ঘরে পর্বতপ্রমাণ পরীক্ষার খাতার উঁচু বাণ্ডিলগুলোর পরিবেশে গ্রীষ্মকালের তপ্ত দিনে আমাদের মধ্যে সুনীতিকুমারের আবির্ভাব একটা স্নিগ্ধতার হাওয়া বইয়ে দিত। আমরা ভুলে যেতাম আমাদের হিসাবী কর্তব্য, তিনি নিজেই ভুলিয়ে দিতেন। নানা প্রসঙ্গে আলাপ শুরু করে তিনি পরীক্ষকদের নিয়ে মজলিশ জমাতেন। এমনি একটা দিনে তাঁর কোনো বেদনাময় স্মৃতিমূলক কাহিনী বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসজল হতে দেখেছি। সে এক আশ্চর্য বিয়োগান্ত পরিণতির গল্প। কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক।

যিনি অনেক বেশি জানেন, নিজের বিদ্যা সম্পর্কে যাঁর আত্মবিশ্বাস প্রকৃত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁর পক্ষে অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবার কোনো হেতুই নেই। তাই তাঁর পক্ষে উদার এবং পরম ক্ষমাশীল হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। তাই সুনীতিকুমারকে আপন বিদ্যার অহঙ্কার নিয়ে কোনো প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে কখনো দেখি নি। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যে বিস্ময় সৃষ্টি করেন, কিন্তু সুমার্জিত আচরণ ও উদার প্রীতির দ্বারা সবাইকে সমানভাবে আকর্ষণ করেন।

৪-৫-৬৭

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯১-১৯৫২

কবিতার আত্মকেন্দ্রের বাইরে সজনীকান্তকে আমি যূথভ্রষ্ট অবস্থায় প্রায় দেখি নি। সঙ্গে সব সময় বন্ধুদের দল। আর ব্রজেন্দ্রনাথকে প্রায় সব সময়েই দেখেছি একা, একমাত্র শনিবার দিন দল খুঁজে বেড়াতেন।

সজনীকান্তের সঙ্গে, সজনীকেন্দ্রিকভাবে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রায় সবার কথা আমি স্মৃতিচিত্রণে এবং অন্যত্র বলেছি। তাই আমার এবারের কথা আপাতত দুজনকে নিয়ে, যে দুজন মিলিতভাবে আজীবন সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মূল্যবান কাজ করে গেছেন। তাই ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে সজনীকান্তর কথা অনেকখানি বলতে হচ্ছে আগে।

সজনীকান্তের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় খুবই সামান্য ছিল। উপাসনা যখন রূপান্তরিত হয়ে বঙ্গশ্রীতে পরিণত হতে চলেছে সে সময় একখানা বার্ষিকপত্র সম্পাদনাকালে আমাকে তাঁর সংস্রবে আসতে হয়েছিল এবং উপাসনার দলের সঙ্গে আমি ১৯২০ থেকে পরিচিত ছিলাম, সেজন্য উপাসনার ক্রিসালিস চিরে যখন বঙ্গশ্রী নামক রঙীন প্রজাপতিটি বেরিয়ে এলো, তখন আমি সেখানে অনেক সময় উপস্থিত থাকাতে সজনীকান্তের সঙ্গে একটা সান্নিধ্য মাত্র ঘটেছিল। উপাসনার সহকারী সম্পাদক কিরণকুমার রায় এই সময়ে উপাসনা থেকে দরজার দিকে এক পা বাড়াতেই সজনীকান্ত তাকে টেনে নিলেন বঙ্গশ্রীর দিকে। কিরণ আমার পূর্ব পরিচিত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সম্পাদনা কাজে তার মতো এমন নিবিড় নিষ্ঠা আমি আর দেখি নি এবং সে কথা সজনীকান্তের কানে এসে থাকবে। তাই বঙ্গশ্রীতে সাবিত্রীপ্রসন্ন এবং অন্যান্যরা বিস্মৃত হলেও শুধু কিরণ রয়ে গেল।

এমনি অবস্থায় ১৯৩২-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি অথবা শেষ দিকে সজনীকান্ত বঙ্গশ্রী অফিসে তখনকার অল্প পরিচিত আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে আমাকে শনিবারের চিঠির স্বত্বাধিকার এবং সম্পাদনারভার দিয়ে আমাকে অবাক করলেন। এমন আচমকা প্রস্তাবের পিছনে কার হাত ছিল জানি না, কিংবা তখনকার দিনের বেপরোয়া প্রাণোচ্ছল অথচ সূক্ষ্ম শিল্পবোধসম্পন্ন সজনী নিজের ঝোঁক থেকেই এ কাজ করে থাকবেন। আমাকে ভাবতে সময় দেন নি। তাঁর ছিল প্রবল ব্যক্তিত্ব, কাজেই না করবার শক্তি



ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৩৮

ছিল না। তিনি বললেন সম্প্রদান করলাম, আমি বললাম গ্রহণ করলাম। মাত্র এক মিনিট লাগল সম্প্রদানে।

আমাকে তিনি শনিবারের চিঠির মালিক এবং সম্পাদকরূপে সবার কাছে পরিচিত করাতে লাগলেন এবং এ ব্যাপারটা বেশিদূর না গড়ায়, সেজন্য আমি মালিক হওয়া বিষয়ে ঘোর আপত্তি জানালাম। বললাম তা হলে আমি ডুবব। আমি ব্যবসা জানি না। অতএব মালিকানা তাঁকেই ফিরিয়ে দিলাম। সম্প্রদানের সময় কোনো সাক্ষী ছিল না, এ সময়েও কেউ সাক্ষী ছিল না।

সজনীকান্তের সাহিত্য ও শিল্পবোধ এমনই সহজাত ছিল যে, অতি দ্রুত ভাল-মন্দ বিচার করতে পারতেন। এ জিনিসটা আমি কিছুকাল লক্ষ্য করে তবে বুঝতে পেরেছিলাম। এ শিক্ষা বাইরে থেকে পাওয়া নয়, নিজের একান্ত গরজে, বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও, বাল্যকাল থেকে অবিরাম সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকার ফলে জন্মেছিল।

সজনীকান্তের চালচলন কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যে ভীষণ রকমের একটা অস্থিরতা ছিল, এক জাতীয় অনির্দেশ্যতা ছিল এবং এটি ছিল তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান আকর্ষণ। দুর্দান্ত প্রাণশক্তিতে দারুণ অশান্ত সজনী, বিখ্যাত শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের সদ্যঃক্রীত প্রেসের ম্যানেজার এবং বঙ্গশ্রী কাগজের সম্পাদক। মস্ত বড় বাড়ি, বহু কর্মী, প্রকাণ্ড আড্ডা। এমন motley crowd সম্ভবত আজ পর্যন্ত এ দেশে কোনো সম্পাদকের ঘরে দেখা যায় নি। এত বড় সম্পাদকীয় ঘরও অন্যত্র দেখা যাবে না। সহকারীদের উপর এমন সম্পাদকীয় অত্যাচারই বা কোথায় দেখা যাবে? কাজ করতে দেবেন না। 'বেশি কাজ করলে চাকরি খেয়ে দেব'—এমন চাপ! সহকারী সম্পাদককে কাজ ফেলে আড্ডা জমাতে হবে, অফিস ছেড়ে সবাই বাইরে গিয়ে হৈ হৈ করতে হবে।

এ সময়ের সমস্ত ঘটনা অদ্ভুত মনে হয়। সবই ঝোঁকের মাথায় ঘটত। হ্যামলেটের ছিল ম্যাডনেসের মধ্যে মেথড, আর আমি দেখেছি সজনীকান্তের মেথডের মধ্যে ম্যাডনেস। কাজ ঠিকই করতেন এবং এক পয়সার হিসাবও না মিললে চলবে না, কিন্তু সব কর্তব্যের বাইরে ছিল একটা উন্মত্ততার ঝঞ্ঝাবরণ। চরম অস্থির, চরম ইম্‌পালসিভ অথচ নিজের শক্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রকাশের পরেও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সঙ্গে সজনীকান্তের মনে মনে কিছু বিরোধিতা ছিল। সেটি প্রথম আবিষ্কার করি ঐ বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে। আমি সংবাদপত্রে সেকালের কথাকে অভিনন্দন জানিয়ে ছোট্ট একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটি শনিবারের চিঠির প্রথম প্রবন্ধরূপে ছাপা হচ্ছে সে-কথা সজনীকান্তকে বলেছিলাম। শনিবারের চিঠিতে কি ছাপা হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের আলোচনার কোনো প্রয়োজনই হত না, কেননা আমার উপর সমস্ত ভার ছিল এবং যা ছাপা হত তাই খুব ভাল হচ্ছে, এ ভিন্ন তাঁর আর কথা ছিল না। কিন্তু এই প্রথম তিনি বললেন, ও বইয়ের জন্য এতটা করবার দরকার ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কিছু বিরূপ, সেই প্রথম সে কথা জানতে পারলাম। সজনীকান্ত বললেন, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি 'কেচ্ছা' লিখেছি, বলে এক দীর্ঘ কবিতা এনে দেখালেন এবং অনেক কথাই বললেন। সম্ভবত সেটি এখনো রক্ষিত আছে।

কিন্তু—একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে, কি ছিল বিধাতার মনে! ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন দুর্ধর্ষ একরোখা মানুষ। তাঁর একজন বাহনের দরকার ছিল এবং সজনীকান্ত দেখলেন গবেষণামূলক কাজ নিজ হাতে না করলে সম্পাদকীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তাই দুদিকের গরজে দুয়ের মিলন ঘটল খুব সহজেই এবং এ-মিলন দুজনের আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল।

সজনীকান্ত-চরিত্রে অনেক পরস্পরবিরোধিতা ছিল। আমাকে যে ব্যক্তি সম্বন্ধে বারবার সাবধান করে দিয়ে বলেছেন তাকে বেশি প্রশ্রয় দেবেন না, পরে দেখি সেই ব্যক্তি অত্যধিক প্রশ্রয় প্রাপ্ত হচ্ছে তাঁর নিজেরই কাছে। বনফুলকে যখন প্রথম পরিচয় করাই সজনীকান্তের সঙ্গে, তখনও তিনি বনফুলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ দূরত্ব রেখে চলতেন। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে অনেক পরে।

ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মনিষ্ঠা অতুলনীয়। গবেষণা কাজ তিনি একক শক্তিতে আপন গরজে চালিয়ে বহু বিস্মৃত জিনিস শুধু উদ্ধার করেছেন তাই নয়, তাদের কালানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করেছেন এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে তা অতিশয় মূল্যবান করে তুলেছেন। গবেষণার বিষয় ভিন্ন তাঁর অন্য আলাপ বেশি ছিল না। এর মধ্যে তিনি যে আনন্দ পেতেন, তার কথা সবাইকে শোনাতেন। গাড়ি টানা ঘোড়ার চোখের দু' পাশে ব্লিংকার লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে দু' পাশের দৃশ্য তাকে বিচলিত না করতে পারে, এবং যাতে সে শুধু সম্মুখের পথটিই দেখতে পায়। তেমনি গবেষক-ব্রজেন্দ্রনাথের দু' চোখের দু' পাশে অদৃশ্য ব্লিংকার লাগানো ছিল। তাঁর পথ

একটিই ছিল। ভীষণ জেদী এবং একরোখা মানুষ। কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, ঠোঁট দুটি পুরু, গণ্ডদ্বয় দু'পাশে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। রাউণ্ড-হেডদের মতো চুল খাটো করে ছাঁটা। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন।

প্রসিদ্ধ 'ঊনবিংশ শতক' গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগলও ঐ একই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরও কাজ ছিল গবেষণা। দু'জনেই সেদিক দিয়ে ঊনবিংশ শতকে বাস করতেন। তবে যোগেশবাবু আবেগপ্রবণ ছিলেন না বলে তাঁর কাজ ছিল স্থিরমস্তিষ্ক জাত। সজনীকান্তের ঊনবিংশ শতকে প্রবেশ আরও পরে।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও যোগেশবাবুর মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা একই বিষয়ের গবেষক-সুলভ ঈর্ষার ভাব ছিল। কোনো বিষয়ের তথ্য যদি যোগেশবাবু আগে আবিষ্কার করতেন, তাহলে ব্রজেন্দ্রনাথ একেবারে ক্ষেপে যেতেন। প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁর সহকারী কর্মী তাঁর কাছ থেকে যেন কেড়ে নিচ্ছেন, এই রকম ভাব। তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটত। ব্রজেন্দ্রনাথ উত্তেজিত হলে সাধুভাষা ছাড়া সাধারণ চলতি ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। যোগেশবাবুর উপর এই কারণে রেগে গেলে তিনি সাধু ভাষায় এই-ভাবে একদিন তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন—"আপনাকে আমি বারংবার বলিয়াছি ঐ বিষয়ে আমি গবেষণা আরম্ভ করিব, আপনি কেন বাহাদুরি করিয়া আগেই সব প্রকাশ করিলেন? আপনি অন্যায় করিয়াছেন। এমন কাজ ভবিষ্যতে আর করিবেন না।" ফলে যোগেশবাবুর অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া গবেষণার কাজটি ব্রজেন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ করতে হয়েছে। এ সবই খেলার ব্যাপার, এবং এতে স্থায়ী মনোমালিন্যের প্রশ্ন নেই। দৌড় পাল্লায় কে প্রথম হবেন, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা। ফলে পুরানো লাই-ব্রেরিতে যিনিই প্রথম কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েছেন, তিনিই প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে তার আভাস টের না পান, সেই উদ্দেশ্যে এমন উপায় অবলম্বন করতেন যাতে সে বস্তু আর কেউ সেখানে আর আবিষ্কার করতে পারতেন না। ভবিষ্যৎ উই ও ইঁদুরকে বঞ্চিত করতে এঁরা দ্বিধা করেন নি।

ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা কাজে যে মনোবৃত্তি দরকার তা মোটামুটি নির-পেক্ষ ছিল। তবে কখনো কোনো গবেষক হয় তো নিজস্ব অনুমানকে আগেই এত বিশ্বাস করে বসেন যার ফলে সাক্ষ্য প্রমাণ যাতে সেই অনু-মানকে সমর্থন করতে পারে, সেই ভাবেই সমর্থক-প্রমাণসমূহ সংগ্রহ করার

কাজে অগ্রসর হন। কোনো কোনো বিজ্ঞানী এইভাবে ভুল পথে এগিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথও একবার রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটি গবষণায় এই জাতীয় ভুল করে বসেছিলেন। প্রবাসীতে (এবং যতদূর মনে পড়ে মডার্ন রিভিউতেও কিছু পরিমাণ) রমাপ্রসাদ চন্দের সঙ্গে বহু বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল কিছুদিন ধরে। শেষ পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। যে অনুমান প্রমাণের আগেই প্রিয় হয়ে ওঠে, তাকে সব সময় সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, এ রকম ক্ষেত্রে গবেষকের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের দিকটা এত ভারী যে, তার তুলনায় এ জাতীয় দু-একটি ক্ষণিক দুর্বলতা সম্পূর্ণ তুচ্ছ।

প্রাচীন রোমক কবি ওভিডের একটি বিখ্যাত কথা আছে, Tempus edax rerum, যার বাংলা অর্থ, "কাল সর্ববস্তুভুক"। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ, জি, ওয়েলস্ এই কথাটির বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর 'দি কংকোয়েস্ট অভ টাইম' নামক বইতে। তিনি বলেছেন, এ যুগে আর ও কথা সত্য নয়। কাল সব বস্তু হজম করতে পারেনি। অনেক কিছুই তাকে এখন উদ্গিরণ করতে হচ্ছে। আগে যা কিছু কালের পেটে গিয়েছিল মনে করা হয়েছে, এখন গবেষকদের পাল্লায় পড়ে কাল তা পাকস্থলী থেকে বার করে দিচ্ছে। এবং অতীত কালের সব রকম গবেষকদের পক্ষেই এ-কথা সত্য। ব্রজেন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়েও এই প্রসঙ্গটা মনে এলো। কারণ, ব্রজেন্দ্রনাথও তাঁর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অনেক তথ্য কালের জঠর থেকে বাইরের আলোয় প্রকাশিত করেছেন। তাঁর সাহিত্য সাধক চরিতমালা তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস প্রভৃতি এ পথের গবেষকদের আকর গ্রন্থ হিসাবে অসামান্য। একক চেষ্টায় বহুদূর এগিয়ে আসবার পর সজনীকান্তের সহযোগিতায় সম্মিলিতভাবে আরো অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন, যার মূল্য চিরদিন স্বীকৃতি পাবে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের পড়াশোনা এনট্রান্স দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। স্কুল ছাড়তে হল আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য (১৯০৭)। তারপর শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং শিখে ১৯০৮ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত বিভিন্ন অফিসে স্টেনোর কাজ। তারপর ১৯২৯ থেকে প্রবাসীতে। জাহ্নবী মাসিকের সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত



পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘ থেকে (১৯৩৭) প্রত্যাবর্তনের ট্রেনে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠরত বনফুল ও শ্রোতা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৩৭

ব্রজেন্দ্রনাথকে এই সময় লেখক বানাবার চেষ্টা করেন এবং তার ফলে ব্রজেন্দ্রনাথ এককালে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ গল্প এমন কি কবিতাও লিখেছেন, নানা স্থানে তা ছাপাও হয়েছে। তারপর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সংস্পর্শে এসে ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি শেখেন সার যদুনাথ সরকারের প্রেরণায়। তারপর ১৯৩০ সনে শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রাচীনতম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণের সংখ্যাগুলি আবিষ্কার করেন। তাঁর রচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ সংখ্যা ৩১ খানা। সম্পাদিত গ্রন্থ ১২ খানা। সজনীকান্তের সহযোগে ১৯ খানা। তাঁর কীর্তি যথাযোগ্য পুরস্কার লাভে গুণীজনের স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি ১৯৫১-৫২ সনের রবীন্দ্র স্মারক পুরস্কার (৫০০০ টাকা) লাভ করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদের সবার ব্রজেনদা ছিলেন। প্রবাসী অফিসে হোক বা অন্যত্র হোক, তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই মুখে শুধু গবেষণার কথা। সাহিত্য পরিষৎ ছিল তাঁর প্রাণস্বরূপ। ব্রজেন্দ্রনাথ সজনীকান্ত ও আমরা একত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যেভাবে যুক্ত হয়েছিলাম তাতে আমাদের অন্তরঙ্গতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বছর কয়েক বাদে আমাকে সাহিত্য পরিষদের সম্পর্ক ছাড়তে হয়েছিল, কিন্তু আমার প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের প্রীতির কখনো অন্যথাভাব ঘটেনি।

যোগেশচন্দ্র বাগলের কথা আগে বলেছি। তখন দু'জনে প্রবাসী অফিসে এক টেবিলেরই দুই বিপরীত দিকে বসতেন। যোগেশবাবু গবেষণা কাজে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিলেন, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ সপ্তাহে অন্তত একদিন বেশ রসালাপে আসর জমিয়ে তুলতেন। আমাদের শনিবারের চিঠির আসরে (মোহনবাগান রো-তে) প্রবাসী অফিস থেকে শনিবারের দিন কিছু আগে বেরিয়েই চলে আসতেন এবং আমাকে উদ্দেশ করে হেসে বলতেন, পরিমলদা, আজ শনিবার, আজ একটুখানি অন্য আলাপ। তিনি আমার চেয়ে সাত বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু সজনীকান্তের অনুকরণে তিনি আমাকে পরিমলদা বলতেন। চিঠিতেও ঐ সম্বোধন।

রসিক ছিলেন, তার আর এক প্রমাণ আমরা একবার রেডিওতে (১৯৩৪) বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় করেছিলাম, তাতে ব্রজেন্দ্রনাথ বিপিনের ভূমিকায় বেশ অভিনয় করেছিলেন। বই বাজাতে বাজাতে যখন "ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা" সুর করে গাইতে আরম্ভ করলেন তখন চেহারায় ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য-ইতিহাস নিয়ে দুর্ধর্ষ গবেষণার কোন চিহ্ন

ছিল না। সে দৃশ্য (আমরা বেতার স্টুডিও ঘরের একমাত্র দর্শক) আমি কখনো ভুলব না। তারপর একত্র পাটনা যাওয়ার দিনগুলি আজও মনে এলে রোমাঞ্চ জাগে। ব্রজেন্দ্রনাথ-বিভূতি-নীরদ চৌধুরী, সজনী ও আমি, এই পাঁচ জনের ১৯৩৭ সনের জানুয়ারির শেষে দুর্দান্ত শীতে কাঁপতে কাঁপতে যাওয়া এবং বনফুলসহ ফিরে আসার স্মৃতি আজও কত মধুর। সেই শীতের মধ্যে সবার সঙ্গে জমাট হয়ে বসে ব্রজেন্দ্রনাথ বনফুলের সদ্য-সমাপ্ত একখানি উপন্যাস পাঠ শুনছেন, এ কৌতুক দৃশ্যের একখানা ছবি আমি চলন্ত ট্রেনে তুলতে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম (পৃথক প্লেট দ্রষ্টব্য)। ব্রজেন্দ্রনাথ নভেল শুনছেন, দৃশ্যটি সত্যই কি কৌতুককর? কিন্তু তিনিও এককালে গল্প লিখতেন, অতএব গল্পে তাঁর আকর্ষণ অস্বাভাবিক নয়।

বন্ধুপ্রীতি তাঁর ছিল আন্তরিক। নিরহঙ্কার ছিলেন সব বিষয়ে, শুধু গবেষণার ব্যাপারে তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল অতি প্রবল এবং তা তাঁর কৃতি স্মরণ করলে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বোধ হবে।

১-১২-৬৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৪—১৯৫০

বিভূতিবাবুর মধ্যে মোটামুটি দুটি পরস্পর-বিরোধী সত্তা অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। আমি পিটার প্যানের সঙ্গে তাঁর একটি দিকের তুলনা করি। তফাৎ এই যে, পিটার প্যান কিশোর হয়ে থাকবে বলেই পণ করেছিল, বিভূতিবাবুর কিশোর মন তাঁর চরিত্রগত।

এই কিশোর মনের উপর একটি গ্রাম্য আবরণ। অনেক গ্রামের লোক আছে যারা সরল, তারা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে কিছু চতুর বুদ্ধিরও পরিচয় দেয়, কিন্তু মোটের উপর নিজের যা আছে তাইতে খুশি, বিভুতিবাবুর আচরণেও অনেকটা সেই পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁর মধ্যে যে শিল্পী ছিল সেও জটিলতা বর্জিত।

দুদিকেই বৃদ্ধির কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ তাঁর দুটি সত্তাই একটা বিশেষ সম্পূর্ণতা নিয়ে জন্মেছিল। শিল্পীরূপে তাঁকে বহু ব্যর্থতার পথে সাহিত্যিক সাফল্য অর্জন করতে হয় নি। যখনই কলম ধরেছেন, তখনই পাকা শিল্পী। তিনি কারো মন ভোলাবার জন্য হিসাব করে কিছু করেন নি—ব্যক্তিগত জীবনেও না, সাহিত্যিক জীবনেও না। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষ যে অসম্পূর্ণ, মানুষ যে প্রকৃতিরই অঙ্গ, এ বোধ তাঁর শিল্পমানসের কেন্দ্রে। অতএব তাঁর এই শিল্পী সত্তার আর উন্মেষের দরকার হয় নি, প্রথমেই সম্পূর্ণতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। আবার, যে কিশোর মন এবং পল্লীসুলভ চরিত্র নিয়ে তিনি জন্মেছেন তারও কোনো উন্মেষ নেই, তারও হ্রাসবৃদ্ধি এক সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। তাঁর চরিত্রের এই অংশকেই আমি পিটার প্যান বলেছি। পল্লীবাসীর স্বভাবকার্পণ্য, সাজপোশাকে অমনোযোগ, দাড়ি না কামিয়ে দু-চার দিন থাকা, ধুলো-কাদা মাখা জুতো-পায়ে চলা, একটুখানি বুদ্ধির পরিচয় দেবার চেষ্টা, একটুখানি স্বার্থবোধ, এর আর তাঁর বদল হতে দেখি নি। কিন্তু এ কথাও সত্য যে তাঁর দুই সত্তা পৃথক হলেও তার মাঝখানে প্রাচীর ছিল না, তাঁর শিল্পীমন অন্য জগতে থাকলেও তার হাওয়া এসে লাগত চরিত্রের এদিকটাতেও, এবং যে স্বার্থবোধে টাকা আদায় করতেন, অন্য দিকের হাওয়ায় সে টাকার প্রতি চরম উদাসীনতা প্রকাশ পেত। তাঁর সমস্ত আচরণ মিলে এমন একটি ব্যক্তিকে রূপায়িত করেছিল

যার কোনো শত্রু থাকা দূরের কথা, বরং সে দিকে সবাই প্রবলভাবে আকৃষ্ট হত।

মাঝে মাঝে ভদ্রলোক সাজিয়ে দেওয়া হত জোর করে। যেমন এই রচনার সঙ্গে যে ফোটোগ্রাফখানা ছাপা হয়েছে, তাতে বিভূতিভূষণ, "বাবু" বিভূতিভূষণ। এ তাঁর আসল রূপ নয়। এর একটুখানি ইতিহাস আছে। অনেক দিন ধরেই বলছিলাম, আপনার একখানা ছবি তুলে দেব ভাল করে। কিন্তু তিনি খেয়ালই করেন না। দু-তিন বার বলেছিলাম। আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন, কিন্তু দাড়ি না কামিয়ে। কতদিন বলেছি এমন অবস্থায় ছবি তোলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ বোধ হয় ছবির দরকার হয়ে পড়েছিল, তাই একদিন সকালে এসেই বললেন আজ ছবি তুলে দিন। আমি বললাম আগে বলেছি না, দাড়ি কামিয়ে না এলে তুলব না? বিভূতি-বাবু দাড়িতে হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, এতে ক্ষতি হবে না।

আমি আগে যা সব বলেছি তা তাঁর সেই মুহূর্তেই ভুল হয়ে গেছে। অগত্যা আমি সেফটি রেজর, জল, এবং সাবান তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, আগে দাড়ি কামিয়ে নিন।

দাড়ি কামানো হলে, চিরুনি বার করে নিজ হাতে চুল ঠিক করে দিলাম। যে দিন ফোটো পেলেন সেদিন বালকের মতো খুশি হয়ে উঠে-ছিলেন। (এই প্রসঙ্গে ১৯২০ সনের একটি কথা মনে পড়ে—বিভূতিভূষণ ভট্টের কথা। তাঁর একখানা ছবি তুলে দিয়েছিলাম সে সময়। তিনি ফোটো-গ্রাফ হাতে নিয়ে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "এ আবার কোন্ ভদ্রলোকের ছবি?")

বিভূতিবাবু জুতো বাইরে রেখে ঘরে ঢুকতেন। অনেকেই তাই করতেন, কিন্তু যেদিন বিভূতিবাবু আসতেন সেদিন তাঁর জুতোই বাইরে থেকে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করত। আর কারো জুতোয়, মালিকদের বৈশিষ্ট্য এমন থাকত না। জুতো থেকে চুল পর্যন্ত তাঁর সমান উদাসীনতা।

দুটি পৃথক সত্তা একটি মগজের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে বাস করেছে, সেজন্য আদর্শ এবং আচরণে পরস্পর অতি-বিরোধিতা অনিবার্য। এবং এজন্যও বিভূতিবাবু আমার কাছে চিত্তাকর্ষক ছিলেন। আমি এ জিনিসটি তাঁর মধ্যে ভাল করেই দেখবার সুযোগ পেয়েছি তাঁর সঙ্গে ১৯৩৩ সনের প্রথম ভ্রমণে।

তিনি তাঁর শিল্পী সত্তায় ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী, এবং শিল্পীরূপে কোনো

শস্তা খ্যাতিলাভের প্রবৃত্তি তাঁর কখনো হয় নি। তাঁর শিল্পীমনের নিজস্ব একটি সুর ছিল, তার চেহারা আলাদা। ভাষার মারপ্যাঁচ ছিল না, সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় সাধারণ মানুষের ছবি এঁকেছেন, এবং তাদের জীবনের অল্পপরিসরের মধ্যেও জীবনকে অনেক বেশি দেখতেন। শেষ দিকে তিনি পরলোকের ব্যাপার নিয়ে একটু বেশি রকম চিন্তা আরম্ভ করেছিলেন।

তাঁকে তাঁর পথের পাঁচালি, আরণ্যক বা দৃষ্টিপ্রদীপ নিয়ে চটিয়ে দেবার চেষ্টা করে দেখেছি, তা কিছুমাত্র তাঁর অন্তরে পৌঁছত না। তাঁর শিল্পধর্মে এমন একটি পরিপূর্ণ নিমগ্নতা ছিল যে, আমার রহস্যচ্ছলে বলাকে তিনি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন। সে জিনিস না দেখলে ঠিক বোঝানো যায় না। সে হাসি ছিল তাঁর কৃপামিশ্রিত, কারণ তিনি তাঁর সেই শিল্পের স্তরে ছিলেন তপস্যাব্রতী, সে স্তর তাঁর প্রত্যক্ষ দৃষ্টি এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত, অতএব তাকে আঘাত করলে সে আঘাত সেখান থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসত। তিনি হয় তো বা মনে মনে বলতেন, প্রভু এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না এরা কি করছে। কিন্তু যে জিনিসে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, যার ভিত্তি শুধুই বিশ্বাস, সেই পরকাল সম্পর্কে অবিশ্বাস প্রকাশ করলে তিনি দুঃখিত হতেন, তর্কও করতেন এবং শেষ পর্যন্ত একদিন বলেছিলেন তাঁর যদি আগে মৃত্যু ঘটে তবে তাঁর আত্মাকে তিনি চাক্ষুষ দেখিয়ে যাবেন। কিন্তু শিল্পী বিভূতিবাবুর এ দিকটিকে অগ্রাহ্য করলে ক্ষতি নেই।

আমি তাঁর এইরকম আচরণ-অসঙ্গতির জন্যও তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, এবং তাঁর সঙ্গ ভাল লাগত না, এমন কাউকে আমি জানি না। কি এক আশ্চর্য মাধুর্য ছিল তাঁর চরিত্রে। তিনি কখনো সাহিত্যের জগতে গুরু সাজতে চেষ্টা করেন নি, কাউকে উপদেশ দিয়ে তার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চান নি, হীনতাভাবও তাঁকে কখনো স্পর্শ করে নি, তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন, সবাই তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেত, তাই তাঁকে সবার ভাল লাগত। এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি নিজের প্রতি উদাসীন ছিলেন।

তাঁর চরিত্রের নানা অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধিতা বিষয়ে আমি তাঁর জীবিতকালে অনেক লিখেছি, এবং তাঁকে পড়ে শুনিয়েছি, এবং তিনি খুব কৌতুক অনুভব করেছেন তাতে। খুবই ভাল লেগেছিল এমন একটি মানুষকে নিকটদৃষ্টিতে দেখা।

তাঁর সঙ্গে ১৯৩৩ সনের প্রথম ভ্রমণে তাঁকে ভাল করে জানবার সুযোগ

পেয়েছিলাম, আগে বলেছি। সে ভারী মজার ব্যাপার। ভ্রমণ থেকে ফিরে প্রথমে অন্যত্র সংক্ষেপে, এবং পরে কিছু দীর্ঘ আকারে সেটিকে লিখেছিলাম পাটনার মণি সমাদ্দারের 'প্রভাতী' মাসিকে, ১৯৪৫ সনে, ধারাবাহিকভাবে। পরে সে লেখা আমার 'পথে পথে' (বেঙ্গল পাবলিশার্স) বইতে সঙ্কলিত হয়েছিল। বিভূতিবাবুকে সেটি পড়ে শুনিয়েছিলাম, কিন্তু সে কথা বলার আগে তাঁর সাহিত্য জীবনের আরম্ভের কিছু সংবাদ দেওয়া দরকার, এটি তাঁর মুখ থেকে শোনা এবং তখন তখন টুকে রাখা।

বিভূতিবাবুর জন্ম হয় বঙ্গাব্দ ১৩০১, ২৮শে ভাদ্র—ইংরেজী ১৮৯৪-তে। এই জন্ম তারিখ তিনি আমাকে বলেন নি। দ্বারেশ শর্মাচার্য হিসাব করে বলেছিল ১৩০০ সালে। কিন্তু বিভূতিবাবুর মৃত্যুর পর পুরানো দলিল ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পরে জানা গেছে বাংলা ১৩০১ সাল।

আমাকে বিভূতিবাবু বলেছিলেন তিনি ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন ইংরেজী ১৯১৬-তে। ভুল বলেছিলেন। এখন জানা গেছে ("বিভূতি বিচিত্রা", মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ) তিনি ১৯১৪-তে পাস করেছিলেন। এতে আমার মন থেকে একটি ধাঁধা সরে গেল, কারণ আমি নিজে প্রবেশিকা পাস করেছি ইংরেজী ১৯১৫-তে। এ ছাড়া আরও একটি ধাঁধা থেকে উদ্ধার পেয়েছি পরে। বিভূতিবাবুর একখানা চিঠি প্রকাশিত হয় 'কথা সাহিত্য' মাসিকের ১৩৫৩ ভাদ্র সংখ্যায় (১৯৪৬)। চিঠির তারিখ ৩রা আশ্বিন ১৩৪৭ (১৯৪০) বিভূতিবাবু লিখছেন—......"ধূমকেতু দেখার সুযোগ ঘটে নি। ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু উঠেছিল শুনেছি, সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন খুব ছেলেমানুষ, পাড়াগাঁয়ে থাকি, কেউ দেখায় নি।"

বিভূতিবাবুর জীবিতকালে এই ছাপা চিঠিখানা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল।

১৩০১ সালে জন্ম হলে—(অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) বিভূতিবাবুর বয়স তখন ১৬ বছর আর আমার বয়স ১২-১৩ বছর।

আমি সে ধূমকেতু তাঁর বাসস্থান থেকে অনুমান ১২৫ মাইল দূরে বসে মাসখানেক ধরে শুধু দেখেছি তাই নয়, তার সম্পর্কে মজা করে বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখেছি। সে সবই স্পষ্ট মনে আছে। হ্যালির ধূমকেতু প্রথম দিকে শেষ রাত্রে উঠত, তারপর ক্রমে সময় সরে যেতে যেতে সূর্যাস্তের ঠিক পর থেকেই আকাশ জুড়ে সেটি বিরাট এক সোনার সম্মার্জনীরূপে ফুটে উঠত।

সামান্য একটুখানি দক্ষিণ-পশ্চিমে তার মাথা, দিগন্ত রেখার একটু উপরে—আর কেতুটি ক্রমে প্রশস্ত হয়ে মধ্যাকাশ ছাড়িয়ে যেত। কি অপরূপ অদৃষ্ট-পূর্ব বিরাট ঘটনা সেটি। তা নিয়ে তখন কাগজে (গ্রামে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পড়েছি) এবং লোকের মুখে মুখে কত আতঙ্কজনক জল্পনা। পৃথিবী ধ্বংস অনিবার্য! কিন্তু সে ধূমকেতু কাউকেই ধ্বংস না করে নীরবে বিদায় নিয়ে চলে গেল। দেখে দেখে পুরানো হয়ে গিয়েছিল।

এই বিরাট এবং অবিস্মরণীয় ঘটনা এবং মহা উত্তেজনাপূর্ণ আবির্ভাব বিভূতিবাবুর গ্রামেও একই রকম দেখা গেছে। এবং ১৬ বছরের বিভূতিবাবু "তখন খুব ছেলেমানুষ" ছিলেন একথা ঠিক নয়, সেটি তাঁর ম্যাট্রিক পাসের চার বছর আগের ঘটনা। এবং "কেউ দেখায় নি" অতএব দেখেন নি একথাও অবিশ্বাস্য, কারণ দেখাবার দরকারই ছিল না, সূর্যকে যেমন দেখাবার দরকার হয় না। ধূমকেতুর সে চেহারা আজও চোখের সামনে ভাসছে। আমার এ লেখা যাঁরা অনুমান ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পড়বেন, তাঁরা অবশ্যই বুঝতে পারবেন সেই ১৯১০ সনে ঐ ধূমকেতু দেখে আমার মনে কি বিস্ময় জেগেছিল। হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে প্রায় ৭৬ বছর পর পর। অর্থাৎ আর মাত্র উনিশ কুড়ি বছর পরে একে দেখা যাবে। এখন ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দ।

কিন্তু বিভূতিবাবু এমন কথা লিখলেন কেন? কোন্ অবস্থায় ছেলেরাও বয়স কমিয়ে দেখাতে ভালবাসে? সেই রকমই কিছু মনে হয়। এবং তাঁর মনের সেই পিটার প্যান অংশই এর জন্য দায়ী। বিভূতিবাবুর স্বভাবের সঙ্গে এমন ঘটনা মোটেই বেমানান নয়। পল্লীবাসীর সরল চাতুর্য এবং কিশোরসুলভ দুষ্টমি আছে এর পিছনে। আমার কাছে নিজের সম্পর্কে যা যা বলেছিলেন তার মধ্যে ম্যাট্রিক পাসের ও বি-এ পাসের বছর (১৯১৬ ও ১৯২০) দুবছর করে বাড়িয়ে বলেছিলেন, সেও সম্ভবত বয়স কমিয়ে বলার প্রবৃত্তি থেকে।

বিভূতিবাবুর কাছে যে একদিন তাঁর জীবন কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি যা যা বলেছিলেন টুকে নিয়েছিলাম, তার একটা ইতিহাস আছে। আমার একবার—সম্ভবত ১৯৪৪ কিবাং ৪৫ সনে ইচ্ছা হয়েছিল সমসাময়িক লেখক-বন্ধুদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয় লিখব। পর পর চার-জনের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়েছিলাম। বিভূতি, মানিক, গোপাল ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানী) ও সরোজ রায়চৌধুরী শেষ করার পর বনফুলকে লিখলাম, সে পোস্টকার্ডে চার লাইন লিখে জানাল তার জীবন কথা।

দুজনের কথা জীবিত কালে লেখা হল না। বিভূতি ও মানিকের কথা। এবং এই দুজনের কথাই দুজনের মৃত্যুর পর, একে একে যুগান্তর সাময়িকীতে যথাক্রমে ১৯৫০ ও ১৯৫৬-তে ছাপা হল এবং দুটি রচনাই সপ্তপঞ্চ (মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ) নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। আর গোপাল ভট্টাচার্যের কথা স্মৃতিচিত্রণ ও দ্বিতীয় স্মৃতিতে এবং বনফুলের কথা স্মৃতিচিত্রণে বিস্তারিত-ভাবে বলেছি—দুজনেরই প্রাইভেট লাইফ! সরোজ রায়চৌধুরীর কথা ছোট পুস্তিকাকারে বেরিয়েছিল। আর বিভুতিবাবুর প্রাইভেট লাইফ 'পথে পথে' বইতে।

বিভুতিবাবুর জীবন কথা আমাকে যা বলেছিলেন তার একস্থানে আছে তিনি ছেলেবেলায় একখানা কঞ্চি হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন বহু দূরের কোনো নির্জন স্থানে বা নদীতীরে। তিনি সেখানে গিয়ে গাছপালা নদী ইত্যাদিকে সেই কঞ্চি হাতে একা একা চিৎকার করে গল্প শোনাতেন। যে-কোনো বিষয়ে বানিয়ে বানিয়ে শুধু বলে যাওয়ার আনন্দে বলা।

ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত বহন করছে অবশ্যই। কঞ্চি হাতে—স্কুল-মাস্টারের প্রতীকচিত্র। এবং গল্প বলা, অর্থাৎ ভবিষ্যতে তিনি গল্পই বলবেন, তারও আভাস আছে ওতে। তিনি এ দুইই হয়েছিলেন—স্কুলমাস্টার এবং গল্প লেখক, দুই-ই। কিন্তু এই যে বাল্যকালে তিনি তাঁর গল্প শোনাতেন গাছপালা নদীর কাছে, তা আমাদের বেলায় কিন্তু উল্টে গিয়েছিল, অর্থাৎ পরে তিনি গাছপালা নদীর গল্প আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁর গল্পের প্রথম শ্রোতা প্রকৃতি, এবং তাঁর প্রকৃতির গল্পের শ্রোতা আমরা।

প্রকৃতির প্রতি তাঁর শুধু শিল্পীসুলভ টান নয়, প্রাণের টান ছিল, নইলে বড় উপন্যাসে প্রকৃতির জন্য এতখানি জায়গা কখনো ছেড়ে দিতেন না।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একাধিক মানুষের নিবাস, কিন্তু বিভুতিবাবুর মধ্যে যে দুজনের নিবাস তারা প্রত্যেকেই এত স্পষ্ট যে, একটাকে দেখলে আর একটা প্রায় অসম্ভব বলে বোধ হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, যা অন্যত্র প্রায় দুর্লভ, সে হচ্ছে—প্রথমত, তাঁর এ দুটি চরিত্রসম্পর্কেই তিনি বিশেষ চেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, তিনি যা কিছু করতেন, তা সবাইকে সরলভাবে শোনাতেন, কোনো কথাই গোপন করতেন না, কোনো বিষয়েই না। গোপন করা যে উচিত এ বোধই তাঁর ছিল না। ১৯৩৩ কিম্বা ৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখেছি তাঁর চিঠি লেখার রোমাঞ্চ। পেন-ফ্রেণ্ড ছিলেন কেউ কেউ। যে সব চিঠি পেতেন তার মধ্যকার সবচেয়ে সুন্দর এবং



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৩৯

বসসমৃদ্ধগুলি আমাকে দেখিয়েছেন। সে সব চিঠির কথা আজও আমার মনে আছে কিছু কিছু। সবচেয়ে প্রিয় পেন-ফ্রেণ্ডের নামও মনে আছে। বিভূতিবাবু ক্লাসে পড়াতেন, তিনি ছিলেন স্কুলমাস্টার। ক্লাসের যে ছেলেটিকে তিনি পছন্দ করতেন, তাকে ধরে ক্লাসের মধ্যে সবার সামনে আদর করতেন। এবং সে কথা স্বচ্ছন্দে সবাইকে বলতেন। এক অনাত্মীয় গ্রাম্য কিশোরী তাঁকে স্নেহবন্ধনে বেঁধেছিল, তাকে নিয়ে কিছুদিন কলকাতা দেখিয়ে বেড়ালেন। তার বিয়েতে বিভূতিবাবু ৫০০ টাকা খরচ করেছিলেন একথাও তাঁর মুখেই শুনেছি।

এ সব ব্যাপারে তাঁর সরল মন সরলভাবে কাজ করেছে। মনের ধর্মে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি—তার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর আচরণ শ্রদ্ধেয় বলা চলে। অন্য কারো সঙ্গে মিলবে না এ আচরণ।

তাঁর চরিত্রের এই জাতীয় বহু স্বতন্ত্র, এবং সাধারণ বিচারে বহু ত্রুটিপূর্ণ, বৈশিষ্ট্য ছিল। এবং ছিল বলেই সবাই তাঁকে ভালবাসত। তিনি কাছে থেকে কখনো দূরত্ব রচনা করেন নি, সবাইকে সমানভাবে কাছে টেনেছেন। তাঁর শিল্পীমন অনেক গভীরে অবস্থিত, পিটার প্যানের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখানে ঘনিষ্ঠ নয়।

তাঁর চরিত্রের পিটার প্যান অংশ, স্বভাব-কৃপণ। কিন্তু এই কৃপণতা দিয়েও তাঁর এদিকের চরিত্র বিচার করা চলে না, কারণ আগেই বলেছি এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। পূর্বোক্ত বিভূতিসংখ্যা কথা সাহিত্যে গজেন্দ্রকুমার মিত্র লিখেছেন—

> "সবাই জানতো ওঁকে আধপাগলা কৃপণ স্বভাবের……খুব অন্তরঙ্গ সাহচর্য পাবার সৌভাগ্য যার হয়েছে, সেই শুধু কোন এক সময় চমকে উঠে আবিষ্কার করেছে তাঁর মহান্ ব্যক্তিত্ব, বিরাট মানুষের বিরাট রূপ।"

আরও এক আশ্চর্য খবর দিচ্ছেন—

> "আসল আসক্তি তাঁর কিছুতেই ছিল না—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এদের ওপরে ত নয়ই—ঘর-দুয়ার, টাকা-পয়সাতেও না।……সবাই কৃপণ বলে ঠাট্টা করত……বিভূতিবাবুর অনাসক্তি এবং উদাসীনতার কথা দিয়ে একটা পুঁথি লেখা যায়। একদিন ওঁর বারাকপুরের বাড়িতে গিয়ে কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আবিষ্কার করলুম তিন-চারখানা বছর-দুই আগেকার চেক পড়ে আছে, তার অঙ্ক সব মিলিয়ে প্রায় দু'হাজার

টাকা। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, এ করেছেন কি ? এতগুলো টাকা মাটি। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন, ও টাকা আর পাওয়া যাবে না ?"

তার পর তিনি যখন শুনলেন ওগুলোর এখন আর কোনো দাম নেই, তখন ছিঁড়ে ফেললেন সেগুলো এবং তার পর 'নিশ্চিন্ত এবং প্রফুল্ল' হলেন।

এ রকম অনেক ঘটনা আছে। আমি নিজে জানি এক প্রকাশক তাঁকে প্রতারিত করেছিলেন, তাঁকে বলেওছিলাম। শুনে বলেছিলেন, তাই না কি ? কি অন্যায় ! আর কিছুই করেন নি তার পর।

আমার লেখা ১৯৩৩-এর ভ্রমণ কাহিনীতে বিভূতিবাবুর চরিত্র আমার কাছে খুব বেশি উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই ভ্রমণ প্রথমে বঙ্গশ্রী মাসিকে লেখেন বিভূতিবাবু, ভ্রমণ শেষ করে এসেই। বৈশাখ ১৩৪০ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি তারিখের ভুল করেছেন। লিখেছেন '৫ই মার্চ রওনা হয়েছিলাম।' অভিযাত্রিক বইতে তারিখটি সংশোধিত দেখলাম—সম্ভবত আমার মনে করিয়ে দেওয়ার ফলে। তারিখটি আমার মনে আছে কারণ ৩-৩-৩৩, এবং ৩য় শ্রেণীতে যাত্রা। এই তিনের যোগাযোগটা উল্লেখযোগ্য ছিল। পরেও যে সব গণ্ডগোল করেছেন তা যথাসময়ে বলব, যদিও তা গুরুতর কিছু নয়। আমার লেখা কাহিনীটি 'পথে পথে' বইতে সবিস্তার বর্ণিত আছে।

বঙ্গশ্রী মাসিকপত্রের অফিসে ঐ সময়ে সজনী-কেন্দ্রিক একটি বড আড্ডা ছিল। সমসাময়িক সচলপদ অনেক সাহিত্যিক ও শিল্পী সেখানে এসে আড্ডা জমাতেন। বিভূতিবাবু ঐ কাগজে নিয়মিত লিখতেন 'বিচিত্র জগৎ' ফীচার। নানা দেশের ভৌগোলিক পত্রিকা থেকে সঙ্কলন মাত্র।

আমি এই সময়ের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করি। বিভূতিবাবু একদিন ওখানকার দলের মধ্যে সবে বলেছেন, "আমি ব্যবসা করব।"—আর তার ফলে সবাই মিলে মিলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা, এবং মিলিতকণ্ঠে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসার উপদেশ, এবং শেষ পর্যন্ত বিভূতিবাবুর হাত ধরে টানাটানি। অবশেষে নিরুপায় বিভূতিবাবু 'আমি ব্যবসা করব না' বলাতে পরিবেশের উত্তেজনা কেটে গেল। (এই ঘটনা নিয়ে আমি "প্ল্যান" নামক একটি গল্প লিখেছিলাম, সেটি ১৩৪০-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে ছাপা হয়।)

বিভূতিবাবু সিগারেট খেতেন অথচ নিজে কিনতেন না। দারুণ গ্রীষ্মেও

তিনি সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাখা চালাতে দিতেন না, সিগারেট তাড়াতাড়ি পুড়ে যাবে ভয়ে। বিভূতিবাবু কৃপণ? তা হলে দু'হাজার টাকার চেক ছিঁড়ে ফেলে তৃপ্তিলাভ করলেন কি করে?

বিভূতিবাবুর সিগারেট খাওয়ার এই কৃপণতা অতি প্রসিদ্ধ। কবিশেখর কালিদাস রায় ঐ একই সংখ্যা কথা সাহিত্যে লিখেছেন—

"যে দৈন্য তার চরিত্র গঠন করেছে, যে দৈন্য তার সুপ্ত শক্তিকে উন্মেষিত করেছে, যে দৈন্য তার লেখার উপাদান, প্রেরণায় রসসঞ্চার করেছে তার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার যেন সীমা ছিল না।......এই লোক যখন বিড়ি খেতে খেতে আগুন নিভে গেলে আধখানা বিড়ি আমাদের দেখিয়ে পকেটে রাখত—তখন আমরা শুধু হাসি নি, তা আমাদের ভাবিয়েও তুলেছে। সমস্যার সমাধান হয়েছে যখন ভেবেছি দারিদ্র্যের চরণে এটা একটা ভক্তি নিবেদন ছাড়া আর কিছু নয়।"

এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায় বিভূতিবাবুর এই জাতীয় সব চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে সবাই প্রশ্রয় দিত, ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত।

বিক্রমখোল ভ্রমণের দিন অপরাহ্নে বঙ্গশ্রী অফিসে বিভূতিবাবু আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে ফোটো তোলা শিখিয়ে দিতে পারেন?" এই যে প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এতেও একটি শিশুমনের পরিচয়, কারণ তিনি জীবনে ক্যামেরা স্পর্শ করেন নি, কখনো ছবি তোলেন নি। তিনি যাবেন সম্বলপুর জেলায় কয়েক ঘণ্টা পরে। তাঁর বন্ধুর ক্যামেরা, সেটিও তিনি চোখে দেখেন নি।

এরই পরিণামে আমাকেও যেতে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। ক্যামেরার সাইজ ইত্যাদির পরিচয় পরে সংগ্রহ করে আমি দোকান থেকে প্যাক ফিলম ও অ্যাডাপটার কিনে নিলাম। (বিভূতিবাবু তাঁর অভিযাত্রিক বইতে লিখেছেন ক্যামেরা আমার। কিন্তু এটি তাঁর ভ্রান্তি। অনেক পরে লেখাতে অনেক ঘটনা ওলট-পালট করেছেন, এবং আমি আমার লেখা তাঁকে পড়ে শোনাবার পরেও তা আর সংশোধন করেন নি, এই ছিল তাঁর স্বভাব। ভুল হয়ে গেছে তো গেছে—কে আর ফিরে তাকায় সেদিকে!)

আমরা চারজন রওনা হলাম। অপর দুই সঙ্গীর একজন কিরণ রায়' বঙ্গশ্রীর সহকারী সম্পাদক (পরে সম্পাদক), অন্যজন, প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত সাবডেপুটি (পরবর্তী খবর জানি না), তিনি বিভূতিবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু নীরদরঞ্জন দাসগুপ্তের, (ব্যারিস্টার এবং সাহিত্যিক)—ভাই। তাঁর সঙ্গে

গাড়িতে আলাপ হল প্রথম। তাঁরই ক্যামেরা, কোয়ার্টার সাইজ, ফোকাসিং, কিন্তু ফোকাসিং স্ক্রীনটি সম্পূর্ণ ভাঙা।

কিন্তু তার আগে উদ্যোগপর্বে যা কথা হল তাতে কিরণের ও আমার কিছু ভয়ের কারণ ঘটল। এ সময় বিভূতিবাবুর আদর্শ শিল্পীসত্তা অত্যন্ত প্রবলভাবে আমাদের সামনে যে অভিযান-স্পিরিটের অন্তর্নিহিত রূপটি উদ্‌ঘাটিত করে ধরল, তাতে মনে চরম উদ্দীপনা সৃষ্টি হলেও আশঙ্কাও কম হল না। পথের খাওয়া, অথবা বেলপাহাড় ডাকবাংলোয় উঠে খাবার ব্যবস্থা কি হবে জিজ্ঞাসা করাতে বিভূতিবাবু তো অবাক। বললেন, অভিযানের স্পিরিটটি আপনারা ধরতে পারেন নি, ও সব ভুলে যান।

এটা যে একটা সত্য দুঃসাহসিক অভিযান, আমার মনে হয় বিভূতিবাবু সেটা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। এর আগে তিনি আরাকান অঞ্চল এবং পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের বন্য অঞ্চল ঘুরেছেন। তিনি বললেন, অ্যাডভেনচারের স্পিরিট হচ্ছে কোনো বিষয় পূর্ব পরিকল্পনা না করা।

প্রকৃত আদর্শ অভিযাত্রীর কথা। ভাবতে গেলে মনে রোমাঞ্চ জাগে, কিন্তু তবু পথে খাওয়াটা যে নিতান্ত দরকার এ ধারণা মন থেকে দূর করা যায় না। তাই বিভূতিবাবুকে না জানিয়ে কিরণ ও আমি ব্যাগে যথেষ্ট রুটি মাখন নিয়েছিলাম। প্রমোদবাবুর ব্যাগে অতিরিক্ত, মারম্যালেড ছিল।

গাড়ির মধ্যে রাত্রিকালে যখন লজ্জার মাথা খেয়ে সেই সব বার করলাম তখন বিভূতিবাবুই বেশি খুশি হয়ে উঠলেন, এবং নেতারূপে যে বেশি অংশটাই তাঁর প্রাপ্য ছিল, তাতে আমরা ভুল করি নি। তার পর ঘুমের কথা উঠল। বিভূতিবাবু বললেন, রাত্রে রেলগাড়িতে তিনি ঘুমোতে পারেন না, রাত্রের অন্ধকারে বাইরের দৃশ্যের একটা রহস্যময় শোভা আছে—ইত্যাদি বলতে বলতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁর নাক ডাকার শব্দও শোনা যেতে লাগল।

কিন্তু আরও একটা ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা বিভূতিবাবুর বিশেষ ইচ্ছায় হয়েছিল। নীরদরঞ্জনের ব্যক্তিগত প্রভাবে আগে নির্দেশ দিলে বেলপাহাড় ডাকবাংলোয় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু বিভূতিবাবু তা হতে দেন নি। যে বিভূতিবাবু এ কার্য করেছিলেন তিনি আদর্শ অভিযাত্রী। অভিযানে খাওয়ার কথা ভাবব কেন? প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে হবে। এ পর্যন্ত বেশ। কিন্তু সুবিধা থাকতেও ছেড়ে দেব, এ কথা নিশ্চয় কিছু পরিমাণ কাব্যের সীমানায় গিয়ে পড়ে। কিন্তু সে আদর্শ,

বিভূতিবাবুর পিটার প্যান অংশ মানবে কেন? অতএব বেলপাহাড়ে দুপুর-বেলা গিয়ে অতি ত্রুটিপূর্ণ সাময়িক ব্যবস্থায়, অসম্পূর্ণ আয়োজনে, রান্নার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, এবং তখন শালপাতার থালায় ভাত এবং শাল-পাতার বাটিতে ডাল খেয়ে বিভূতিবাবুর ক্ষুধার্ত দেহের অসহায়তা কিছু দূর হতে পেরেছিল।

পথের কথা না তোলাই ভাল। যে স্টেশনে যা অখাদ্য পাওয়া যায় তাই তাঁকে খেতে হল, উপায় ছিল না। পিটার প্যানের জঠরাগ্নি দমিত হয়েছে যে-কোনো খাদ্যে। কিন্তু সে শুধু ছাই চাপা মাত্র, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভিতর থেকে আগুন বেরিয়ে পড়েছে। বিভূতিবাবু সমস্ত দোষ সিংভূম জেলার আবহাওয়ার উপর চাপাতে লাগলেন। কিন্তু দুই জ্বলনের মধ্যবর্তী অব-স্থায় প্রকৃতির দৃশ্যও তাঁকে অস্থির করে তুলতে লাগল। সে এক আশ্চর্য দ্বিধাবিভক্তি। একদিকে প্যান, (কিছু পরিমাণ দেবতা প্যানও বটে!) আর একদিকে প্যানোরামা! বাইবে সে কি শোভা! আমাদের এবং বসন্তকালের পূর্ণ যৌবন সেটি, মার্চের প্রথম, মানে, ফাল্গুনের মধ্যবর্তী কাল। এলোমেলো, উঁচুনিচু অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ী পথ, রেলের দুধারে ফুলের আর রঙের সমারোহ। একে তো নিচু বাংলার সমতল ক্ষেত্র থেকে এমন তরঙ্গিত পাহাড় পথে এলেই অভিনবত্বের স্পর্শে মন নেচে ওঠে তার উপর লাল পলাশের আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঘন সবুজে, ঘন লালে, আর বিপরীত দিকে দ্রুত-ছুটেচলা এলোমেলো পাহাড়ে, বিভূতিবাবুর মনের মধ্যে যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, তা কেমন করে ভাষায় বোঝাব জানি না। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া বাইরে এমন একটি ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছিল যে, মনে হয় একমাত্র সেই ঘটনাতেই তা অনেকখানি প্রকাশ পেতে পারে।

আমাদের গাড়িতে আর কোনো যাত্রী ছিল না, তাই আমরা সবাই সেই অসহ্য সৌন্দর্যের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নিজ নিজ ভঙ্গিতে নানা চেষ্টা করছিলাম। বিভূতিবাবু থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছিলেন, কখনো কীর্তন গাইতে আরম্ভ করছিলেন, আমরাও সবাই 'ঐ দেখুন ঐ দেখুন' বলে চেঁচিয়ে নতুন কোনো সৌন্দর্য বিন্যাস পরস্পরকে দেখাচ্ছিলাম। ক্রমাগত স্থান বদল করছিলাম বিভূতিবাবুর সঙ্গে। অর্থাৎ বিভূতিবাবু চেঁচিয়ে বল-ছিলেন, এদিকে দেখুন, আমরা বলছিলাম, এদিকে দেখুন। এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ চঞ্চল বিভূতিবাবু উন্মাদের মতো খপ করে আমার হাত সজোরে চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "পরিমলবাবু, ক্ষেপে যান, এ ছাড়া

আর কোনো উপায় নেই।"

সেই তীক্ষ্ম স্বরের কথা আজও কানে বাজছে, সেই আবেগকম্পিত স্পর্শ এখনও লেগে আছে হাতে। কি অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া বিভূতিবাবুর মনে! সৌন্দর্যের কোন্ লোকে গিয়ে তিনি অভিভূত হয়ে ফিরে এসে এমন অদ্ভুত কথাটি বললেন? অদ্ভুত, অথচ তখন এটি কত স্বাভাবিক। তখন মনে হয়েছিল এ ছাড়া আর কিই বা বলবার আছে। বাইরের শোভায় আমরা সবাই যেখানে চিৎকার করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অসহ্য ভার থেকে মুক্ত হচ্ছিলাম, সেখানে বিভূতিবাবু নিজে ক্ষেপে গিয়ে আমাকেও ক্ষেপে যেতে বলেছিলেন, এতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

সত্যাই দুটি বিপরীত বিভূতিবাবু। পিটার প্যান অংশের খাওয়ার লোভ ছিল খুব বেশি, এবং এজন্য যে-কোনো ডাকে 'না' করতেন না। এই বিভূতিবাবু কতগুলো গুরুদায়িত্বের কাজেও ছিলেন উদাসীন। ম্যাট্রিকুলেশনের পরীক্ষকরূপে তাঁকে এই রকম উদাসীন দেখেছি। আমরা একসঙ্গেই পরীক্ষক ছিলাম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান পরীক্ষক। বিভূতিবাবুর খাতা আমি স্ক্রুটিনাইজ করেছি—মার্ক দিতেন তাতে গণ্ডগোল হত, মার্ক যোগে ভুল হত। বিভূতি-সংখ্যা কথা সাহিত্যে সুনীতিবাবু লিখছেন, "বিভূতিবাবু কয়েক বৎসর সাধারণ পরীক্ষক থাকার পরে তাঁকেও স্ক্রুটিনাইজার বা নিরীক্ষক করে নিই। তাঁর কাজ একটু ঢিলা-ঢালা হত কিন্তু তাতে কিছু এসে যেত না।"

এ বিষয়ে অবশ্য সুনীতিবাবু আমাদের সবার প্রতিই উদার এবং প্রীতিভাবাপন্ন ছিলেন।

কিন্তু বিক্রমখোল অধ্যায় শেষ হয় নি।

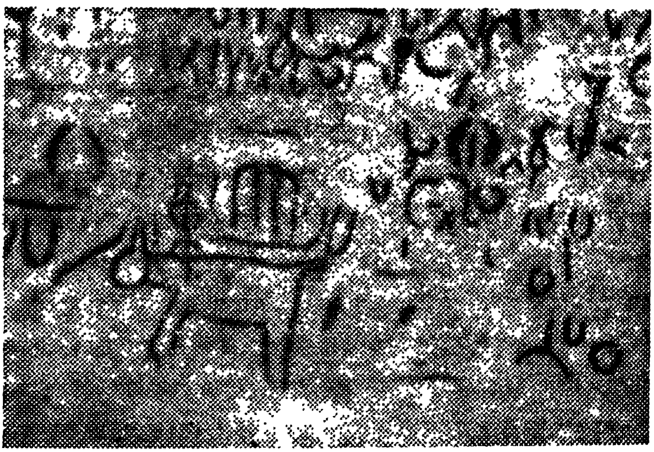
বেলপাহাড় বাংলোয় রাত্রি কাটিয়ে পরদিন হেঁটে যেতে হবে বিক্রমখোলে। মোট প্রায় দশ মাইল পথ। মাঝখানে গ্রিণ্ডোলা গ্রামে ক্ষণবিশ্রাম ও কিছু জলযোগান্তে বিক্রমখোল অভিমুখে যাত্রা। জিনিসপত্র বাঁকে বইবে বাহকেরা। গোরুর গাড়ির প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু বিভূতিবাবু গাড়িতে যেতে হবে শুনে উত্তেজিত। আমি তবু জোর করে একাখানা গাড়ি রাখলাম, হঠাৎ দরকার হলে ওঠা যাবে। কিন্তু দরকার হয় নি, তবু গাড়ি গিয়েছিল। অভিযানের স্পিরিট নষ্ট করতে দিতে তিনি রাজি নন।

গ্রিণ্ডোলা গ্রামে গিয়ে দুধ-মুড়কি খেয়ে আমরা বিক্রমখোল রওনা

হলাম। ফিরে এসে ভাত খাব বললাম, কিন্তু বিভূতিবাবু বললেন ভাত খেলে হাঁটতে পারবেন না। লুচি খাবেন। আমি জোর করে আমার জন্য ভাতের ব্যবস্থা করে গেলাম।

শিলালিপি পর্যন্ত যাবার একটা ভাল পথ ছিল, কিন্তু তাতে অভিযানের স্পিরিট নষ্ট হবে, সেজন্য বিপদসঙ্কুল অরণ্যপথ ধরলাম। সঙ্গে দু'জন গাইড ও কয়েক জন বল্লমধারী আদিবাসী।

শুধু বিক্রমখোলের সেই চার হাজার বছরের প্রাচীন শিলালিপির ধারে গিয়ে বিভূতিবাবুর পিটার প্যান অংশ দমিত ছিল। অদ্ভুত সে পরিবেশ। তার নির্জনতা এমনই ভয়াবহ যে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল। যে পথে গিয়েছি সে পথ মানুষের পদচিহ্নহীন ঘন অরণ্য। হিংস্র জন্তুর বাস সেখানে। অজস্র আমলকি-ঝরা পথ। শিকারীদের বাঘ মারার মাচা দু-একটা সে পথে।



বিক্রমখোল শিলালিপির একাংশ

এই পরিবেশে বিভূতিবাবুর শিল্পীসত্তার জাগরণ। সে পরিবেশটা এমনই আশ্চর্য রকমের অভিনব যে, তা এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে মনের উপর। আধুনিকতার কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। যাবার পথে ক্রমেই আমরা আধুনিক কালের সমস্ত চিহ্ন থেকে দূরে সরে এসেছি। এক এক ধাপ করে সরে এসেছি। গ্রিগোলা নামটিও আমাদের কানে নতুন। পায়ে হেঁটে গিয়েছি সেই জনহীন অরণ্য পথে। তারপর শুরু হয়েছে হাজার

হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার পরিবেশ। সঙ্গে আদিম যুগের দেহরক্ষী।

অবশেষে সেই শিলা, আর তার গায়ে খোদিত লিপি বা লেখ। পাহাড়ের গায়ে শক্ত ধারালো ধাতুর অস্ত্রে খোদাই করা বহু চিত্রধর্মী এবং নানা চক্র বা রেখা বা ত্রিশূলাকার সব লিপি। ছোট্ট এক টুকরো পাহাড় যেন সাপের ফণার মতো বিস্তৃত এবং সামনের দিকে একটুখানি ঝুঁকে পড়া। লিপি, যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে খোদাই করা, তার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুট। পাহাড়ের ভিতর দিকটা অর্থাৎ যেদিকে লিপি সেই অর্ধ 'কেভ'-এর দিকটা কংকেভ। আমি সেই গ্রাউণ্ড গ্লাসহীন ক্যামেরায় অনুমানে ছবি তুললাম। লিখনের ছবি সামনে থেকে সবটা তুলতে যতখানি পিছিয়ে যাওয়া দরকার তা যাওয়া সম্ভব ছিল না, একটু দূর থেকেই পাহাড় ঢালু। তাই লেখের অংশ, এবং দু পাশ থেকে সমস্ত পাহাড়টির ছবি তুললাম। কিছু লেখ এঁকে নিয়েছিলাম, তা বিভূতিবাবুর অভিযাত্রিক বইয়ের প্রথম সংস্করণে ছাপা ছিল দেখেছি। সে লেখ বা লিপি এখনও অপঠিত। আমি পূর্বের লেখায় তাকে একখানি প্রাচীন গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করেছি, বলেছি শুধু সাউণ্ড বক্স আর নীডল-এর অভাবে বাজানো গেল না।

কিন্তু সে দিন সেই ৫ই মার্চ (১৯৩৩) বেলা দেড়টার সময় সেখানে বসে বহু সহস্র বৎসর আগেকার কালের মধ্যেই যেন এসে পড়েছি এমন মনে হয়েছিল। সবারই মনে শুধু এক গভীর বিস্ময়পূর্ণ জিজ্ঞাসা।

একটা মহাতৃপ্তিকর গম্ভীর প্রশান্তি। কারো মুখেই কথা নেই, শুধু নীরব বিস্ময়। ওখান থেকে ফিরে এলাম, তখনও চুপচাপ। তারপর গ্রিণ্ডোলায় গাঁউটিয়ার (মোড়ল) বাড়িতে যখন খেতে বসব তখন বিভূতিবাবু প্রথম কথা বললেন। বললেন, তিনি ভাত খাবেন। ভাত অবশ্য শুধু আমার জন্যই হয়েছিল।

পিটার প্যানের পিঠ থেকে তার ছায়া খুলে গিয়েছিল, পরে ওয়েণ্ডি সে ছায়া তার পিঠে শেলাই করে লাগিয়ে দেয়। শিল্পী বিভূতিবাবুর পিঠ থেকে স্বয়ং পিটার প্যানই খুলে পড়ে গিয়েছিল, গ্রিণ্ডোলায় ফিরে এসে তাকে আবার পিঠে লাগিয়ে নিলেন।

তারপর সন্ধ্যায় ফেরা। বিভূতিবাবুকে দেখা গেল না। কোথায় বিভূতিবাবু? গোরুর গাড়ির ভিতর থেকে বিভূতিবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "আমি গাড়িতে যাচ্ছি।"





১। বিক্রমখোল যাত্রাপথে—প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত, কিরণকুমার রায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বিক্রমখোল শিলালিপির সম্মুখে বিশ্রামরত তিনজন। মাঝখানে বিভূতিভূষণ

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৩৩

বেলপাহাড়ে ফিরে এসে কিছুই খাওয়া হবে না, বিভূতিবাবু নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষিধেয় এমন কাতর হয়ে পড়লেন যে আবার সেই রাত্রে সব আয়োজন করতে হল।

কেমন আশ্চর্য একটি চরিত্র!

অভিযানে খাওয়া থাকার হিসাব থাকবে না, একথা যখন তিনি বলেছিলেন, তখন তো জানতেন—তিনি না খেয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না, এবং নীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত খাওয়ার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভূতিবাবু বিশেষভাবে তা যাতে না হয় তার চেষ্টা করলেন কেন? তাঁর কথায় কি কিছুমাত্র আন্তরিকতার অভাব ছিল?

কল্পনাই করা যায় না। তিনি শিল্পীরূপে, আদর্শ অভিযাত্রীরূপে, যা হওয়া উচিত তাই চেয়েছিলেন। তখন পিটার প্যান সুপ্ত, শিল্পীর প্রভাব তখন তুঙ্গী। দুটি সত্তা মাঝে মাঝে একেবারে পৃথক হয়ে পড়ে। গাড়িতে ঘুমানো, ক্ষিধেয় কাতর হওয়া, ভাত খাওয়া, গোরুর গাড়িতে ফিরে আসা—এর কোনোটাই শিল্পী বিভূতিবাবু চান নি, সবই পিটার প্যানের ক্রিয়া।

মানুষ বিভূতিবাবুর এ চরিত্র আর দেখা যাবে না। এর পর আমিও আর দেখি নি, যদিও আরো দুবার তাঁর সঙ্গে বাইরে গিয়েছি। বিক্রমখোল যাবার চার বছর পর পাটনায়। কিন্তু এ ভ্রমণে যদিও আমরা পাঁচজনের একটি দল ছিলাম, (নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, সজনীকান্ত ও আমি)—তবু এ যাত্রায় নেতা বিভূতিবাবু নন, নেতা নীরদচন্দ্র চৌধুরী। প্রকৃত বিভূতিবাবুকে দলের মধ্যে পাওয়া যায় না, অরণ্যপথে একবারই পেয়েছিলাম, পাটনার জনারণ্যে নয়।

পাটনার প্রথম সভায় লেখা-গল্প পড়েছিলেন, যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ। পরদিন কোন্‌টা পড়েছিলেন মনে পড়ে না। জোরালো কণ্ঠ, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের উচ্চ 'পিচ' বা তীক্ষ্ণতা। বক্তৃতাও খুব মনোহর দিতে পারতেন। সেটা দেখেছি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পাবনা শহরে লাইব্রেরি বিষয়ের বক্তৃতায়। বক্তৃতা দিয়েছিলেন ৩০শে জুলাই। সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি, এবং তার মধ্যেই দুজনে ঝড়ের বেগে ফিরে এসেছিলাম ঈশ্বরদি স্টেশনে। তারপর দার্জিলিং মেলের ভিড়। এ সব ঘটনা স্মৃতিচিত্রণে লেখা আছে।

বিভূতিবাবু রসিক ব্যক্তি ছিলেন, সব সময়েই প্রায় হেসে কথা বলতেন, এবং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার ছিলেন। ছোট বড় ভেদ ছিল না মনে।

১৯৪৩-এর মহামন্বন্তরের বছরে 'নূতন পত্র' নামক একখানা মাসিক প্রকশিত হয় আমার সম্পাদনায়, সহযোগী ছিল সুধীর ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র)। সেই কাগজে বিভূতিবাবুকে লিখতে বলে-ছিলাম। তিনি 'বহরাগড়া' নামে একটি ভ্রমণ লিখতে আরম্ভ করেন। কাগজখানা যুদ্ধ সময়ের আইনের নানা দাবী মেটাতে অনিচ্ছুক হওয়াতে তিন সংখ্যার পর বন্ধ করতে হয়েছিল। বিভূতিবাবু শেষ দু'সংখ্যায় লিখেছিলেন।

এই লেখাটি পড়ে আমি আরণ্যকের বিভূতিবাবুকে আরও একটু যেন বেশি করে পেলাম।

কোন্ জগতের তিনি?

কোন্ বেদনার অন্ধকারে বার বার তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপ আলো নিক্ষেপ করতে চায়? সিংভুম অঞ্চলের এই ভ্রমণে সেখানকার মানুষের দীনহীন দারিদ্র্যের চেহারাসুদ্ধ তাদের সমাজের চেহারাটি এমনভাবে উন্মোচন করে চোখের সামনে ধরেছেন যে, শিল্পী মানবদরদী বিভূতিবাবুকে মনে মনে বার বার প্রণাম জানিয়েছি পড়তে পড়তে। তাঁর সঙ্গে গাছপালার পরিচয় জানেন এমন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁকেও এড়িয়ে তিনি স্থানীয় লোকদের কাছে ছুটে গিয়ে-ছেন, এবং প্রশ্ন করে করে তাদের কথা জেনে নিয়ে গভীর সংবেদনশীল ভাষায় লিখে গিয়েছেন। কোথাও উচ্ছ্বাস নেই, নিজের কোনো ভাবাবেগে কোথাও নিখুঁত বাস্তবচিত্রকে বিকৃত করেন নি। এ সব পড়লে বিভূতিবাবুকে চিনতে ভুল হয় না, জীবনশিল্পী বিভূতিবাবুকে। তাঁর দৃষ্টি বার বার অনাহার-অর্ধাহারক্লিষ্ট মরণোন্মুখ অখ্যাত অবজ্ঞাত গ্রাম্য লোকদের দিকে প্রসারিত হয়েছে। তাদের সেই হতাশা আর দীনতার গুহান্ধকারে, যেখানে সহজে কারো দৃষ্টি পৌঁছয় না, সেখানে বহু যত্ন করে তিনি দৃষ্টি মেলেছেন। কোথায় কোন্ ছেলের দল দিনরাত অপেক্ষা করে আছে—কখন এক বিশেষ বাড়ির রান্নাঘর থেকে রাঁধা ভাতের ফেন গড়িয়ে বাইরে এসে পড়লে তাই খাবে, তাদের দিকে তাঁর বিষণ্ণ দৃষ্টি। গ্রামের অপরিচিতদের মধ্যে গিয়ে কে কি খেতে পায়, চাল কি দরে কেনে, শুধু সেই জিজ্ঞাসা। বিভূতিবাবু এই সব গ্রাম্য নিঃস্ব মানুষের মধ্যে, গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যে, অরণ্যের মধ্যে, কাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন সমস্ত জীবন? কি খুঁজেছেন, কে তার উত্তর দেবে?

মানুষের মনের শস্তা ভাববিলাস যা মনস্তত্ত্বের নামে সাহিত্যে বড় স্থান

দখল করতে চায়, তা থেকে তিনি দূরে ছিলেন। বই বিক্রির উপায় তিনি কখনো খোঁজেন নি, সে বিষয়ে তাঁর কোনো চেতনাই ছিল না। তাঁর শিল্প-প্রেরণা ভিন্ন জাতের।

তাঁর বেদনা ঘন-কুয়াসার মতো নেমে এসে তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছে, কিন্তু তিনি সংস্কারকের ভূমিকা নিতে পারেন নি। বেদনার ছবি সবার সামনে মেলে ধরেছেন। তিনি অন্যায়কারীকেও আঘাত করতে পারেন নি—তাঁর হৃদয়টি ছিল অত্যন্ত কোমল।

একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলি। সম্ভবত তাঁকে আরও একটু বেশি বুঝতে সাহায্য করবে এ ঘটনা।

যখন নূতন পত্রে তিনি বহরাগড়া লিখছিলেন, সেই সময় একদিন বলেছিলাম, আপনি তো মানুষের দুঃখবেদনার কথা লেখেন, আমি একটি অদ্ভুত কাহিনী বলি, শুনুন। এটি একটি ইংরেজী গল্প।

বিভূতিবাবু কাহিনী শোনার জন্য ব্যগ্র হলেন। আমি গল্পটি বললাম। সেটি এই—একটি গরিব লোক তার একটি হাঁসকে নানা রকম খেলা শিখিয়েছিল, কিছু উপার্জন হবে উদ্দেশ্যে। কিন্তু যা হত তাতে তার চলত না। একবার একটি ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দল তাদের অঞ্চলে এলে ঐ দুঃখী লোকটি তার হাঁসটিকে নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বলল, আমাকে যদি আপনাদের দলে একটি চাকরি দেন, তা হলে আপনাদের ইনটারভ্যালের সময় আমার এই হাঁসের খেলা দেখিয়ে দর্শকদের খুশি করব।

ম্যানেজার খেলা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং বললেন, তোমাকে নেব, কিন্তু কয়েকটা দিন দেরি হবে। তোমার নাম ঠিকানা লিখে দাও, জানাব।

এরপর লোকটি দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে লাগল, খবর আর আসে না। অবশেষে টেলিগ্রাম এলো, অবিলম্বে হাঁস নিয়ে এই ঠিকানায় চলে এসো।

লোকটি উত্তরে জানাল, "দুঃখিত, বড্ড দেরি করে ফেলেছেন, ইতিমধ্যে অভাবে পড়ে হাঁসটাকে খেয়ে ফেলেছি—SORRY. MUCH TOO LATE. HAD TO EAT DUCK."

বিভূতিবাবু এ কাহিনী শুনে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বেদনার্ত কণ্ঠে যেন আত্মগত ভাবেই বলে উঠলেন—বলেন কি! হাঁসটাকে খেতে হল? Had to eat duck?

আবার চুপ। আবার সেই ঐ একই প্রশ্ন। হাঁসটাকে খেতে হল?

বিভূতিবাবুকে দুঃখে এমন অভিভূত হতে আগে কখনো দেখি নি।

আমি এতক্ষণ তাঁর সত্তাকে দুভাগে ভাগ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা নিতান্তই স্থূল চেষ্টা। মানুষকে ওরকম যান্ত্রিক ভাগ করা যায় না। এক মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মানুষ থাকে, কিন্তু তাদের মাঝখানে প্রাচীর থাকে না। অন্তরের মানুষটির পরিচয় কি কেউ জানতে পারে? আমি যা লিখলাম তা আমার দেখা সত্য। তা আসল সত্যের সঙ্গে না মিলতেও পারে। কিন্তু বিভূতিবাবু প্রকৃতই কি ছিলেন, তার আভাস তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন একটি কবিতায়। "বিভূতি বিচিত্রা" থেকে তার অংশ তুলে দিচ্ছি এখানে—

দুঃখ হতে ক্ষতি হতে
যে অমৃত করেছি সঞ্চয়
নিত্য পলে পলে,
মৃত্তিকার ধরণীতে
কণ্ঠ ভরে গাহি তারি জয়
...নানা কুতূহলে।...

দুঃখ ভরা পৃথিবীর
কবি আমি নামগোত্রহীন
অখ্যাত অনামী,
মানুষের চিত্তমাঝে
তবু কবে মোর মর্মবীণ
শাশ্বত সে বাণী।

অনন্ত বেদনা মাঝে
চিরন্তন সৃষ্টির সম্ভার
আনন্দ স্বরূপে—
আমি যে দেখেছি তার
প্রশান্ত স্বভাব,
অপরূপ রূপে।

তাই মোর কাব্য কথা
নব ছন্দে হয়েছে মুখর
অশ্রুজল মাঝে,
কুসুম সঙ্গীতে তাই
ধরিত্রীর ব্যাকুল অন্তর
ক্ষণে ক্ষণে বাজে।" (১৯৪০)

এই তো তাঁর আত্মপরিচয়। দুঃখভরা পৃথিবীর কবি তিনি, পুলকিত মুগ্ধ শিহরণে অন্ধকার রাত্রে বিশ্বকে ধ্যান করেছেন। তাঁর ভাষা অশ্রুমণ্ডিত।

১৯-৫-৬৬

জ্যোতির্ময়ী দেবী

১৮৯৪

আমি যাঁদের দেখেছি পর্যায়ের লেখাগুলি যাঁরা অনুধাবন করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, আমার দেখা ব্যক্তিরা অনেকেই এখন আর জীবিত নেই, এবং এখনও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের সবারই বয়স সত্তর পার হয়েছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম কাজি নজরুল ইসলাম। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বয়সের প্রশ্ন অবান্তর।

আমার দেখা লেখিকাদের মধ্যে তাই একমাত্র শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্পর্কেই আমি কিছু বলতে বসেছি তার কারণ অন্য যে সব প্রসিদ্ধ লেখিকার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাঁরা কেউ তাঁদের বয়স সত্তর পার হয়েছে, এমন কথা স্বীকার করছেন না, চেষ্টা করেও তাঁদের কাছ থেকে আমি স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারি নি।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর বয়স এখন এই রচনা সময়ে ৭৩, তাঁর জন্ম ১৮৯৪, জানুয়ারি। এবং একথা তিনি নিজে স্বীকার করাতে আমি কিছু বিস্ময় বোধ করেছি। পৃথিবীর সর্বত্রই যেখানে মহিলাদের বয়স কমিয়ে বলার অভ্যাস, সেখানে একা জ্যোতির্ময়ী নিজ মুখে বয়স স্বীকার করেছেন, এবং আমি সে কথা বিশ্বাস করেছি। (কেউ ভাববেন না যেন যে, এটাও তাঁর প্রকৃত বয়স নয়!)

শুধু এই একটি মাত্র কারণেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী। তা ভিন্ন তাঁর নিজের সম্পর্কে বিনয় তাঁর প্রায় দুর্ভেদ্য। জানতে চেয়েছিলাম পড়াশোনার ব্যাপ্তির খবর। লিখলেন, "বিদ্যাবুদ্ধি লেখাপড়া বিদ্যাসাগরী বোধোদয় কথামালা আখ্যানমঞ্জরী এবং প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুকের কয়েক পাতা।" (১৯-৭-৬৬, চিঠি)

কিন্তু কথাটা চমকপ্রদও নয়, অবিশ্বাস্যও নয়। সাহিত্যের সৃজনকার্যে স্কুলকলেজের নির্দিষ্ট পড়াশোনার প্রয়োজন খুব আছে কি? অথবা আদৌ আছে কি? সৃজনপ্রেরণার জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন, তার ক্ষেত্র অধিকাংশ স্থলেই নির্দিষ্ট পাঠের বাইরে বিস্তৃত। যাঁদের মন সৃজনধর্মী তাঁদের নিজের মনের থেকেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের এমন এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে যখন বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষের জীবন, এবং প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার, সবার কাছ

থেকেই শিক্ষাগ্রহণ না করে তাঁরা থাকতে পারেন না। জ্যোতির্ময়ী দেবীও তাই করেছেন, সাহিত্যস্রষ্টা মাত্রেরই ঐ একই ইতিহাস। আমি তো বছর কুড়ি আগে এক গল্পে বলেছিলাম এ কথা। বিধাতাপুরুষকে এক তরুণ ও তরুণী হঠাৎ ধরে ফেলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল। বিধাতা সত্য পরিচয়ই দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের তা বিশ্বাস না হওয়াতে তাঁকে নানাভাবে জেরা করতে লাগল। সাধারণ জ্ঞানের সব কথা। তিনি একটারও জবাব দিতে পারেন নি। শুধু বলেছিলেন, সব করেছি বটে, কিন্তু কেন করেছি তা বলতে পারব না। ব্যাখ্যাও করতে পারব না। শেষে এ-প্লাস্-বি হোল স্কয়ারের পরিণাম কি, তাও যখন বলতে পারলেন না, তখন ওরা বুঝতে পারল বিধাতা ম্যাট্রিকুলেশন পাসও না। এটাই স্বাভাবিক, কারণ স্রষ্টা সৃষ্টির করেন অন্তরের তাগিদে, কিন্তু তা সব সময় নিজে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাস না করেও সব করতে পারেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী আমাকে লিখলেন, "আমার কাছে এটা আলোর মতোই সত্য যে, মেয়েরা কখনই 'বিরাট' কিছু হতে পারেন নি। কদাচ কেউ কেউ হয় তো 'বিশেষ' হয়েছেন। বিরাটে বিশেষের স্থান আছে কিন্তু বিশেষে বিরাট ধরানো যায় না। পৃথিবীতে মেয়েদের বিধাতা-নির্দিষ্ট এইটেই কর্মফল— ভালবাসায়। সে ভালবাসাতে অহং থাকে না। যদিও কোন বিশেষ পণ্ডিতের উক্তি আছে যে, তারা জীবনের ঋণশোধ করে দুঃখভোগের দ্বারা। দুঃখের আনন্দের দিকটা তাঁর মনে ছিল না ?"…(চিঠি, ২৩-৮-৬৬)

আবার লিখলেন, "আমার বিশ্বাস মেয়েদের হাতে এ পর্যন্ত কিছু রসসৃষ্টি হয় নি। তাঁরা জীবধাত্রী হয়েই থাকবেন। তবে বিশেষ মেয়ে আমি মাত্র তিনচারজনকে মনে করি…আর সকলেই আমরা পুরুষের নকল নবীস। তবু কেন আমি লিখি ? সেটাও আমার বড় দুঃখ। না লিখে না পড়ে পারি না, তাই কাগজ-কলমের শ্রাদ্ধ করি। কিন্তু আমি এই সত্যকে দেখতে পেয়েছি, এই আমার সম্পদ, এই আমার আনন্দ।"…

স্থিতধী জ্যোতির্ময়ী, মোহমুক্ত জ্যোতির্ময়ী। তাই তাঁর নিজের সম্পর্কে কোনো মমতা নেই। এমন মানুষ দেখেছিলাম একবার মাত্র—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে।

জ্যোতির্ময়ী যে বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে বছর স্বর্ণকুমারী দেবী 'ফুলের মালা' উপন্যাস শেষ করেছেন, তেত্রিশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সোনার তরী', 'ছোটগল্প', 'কথা চতুষ্টয়' ও 'বিচিত্র গল্প'—এই চারখানা

গ্রন্থের লেখক হয়েছেন। (এবং জ্যোতির্ময়ী তার কোনো একখানাও হাতে পেলেই তার পাতা ছিঁড়ে মুখে পুরছেন।) তাঁর জন্মের ঠিক এক মাস আগে (২৭-১২-৯৩) দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সমাপ্ত হয়েছে। আরো কিছুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোয় পার্লামেণ্ট অভ রিলিজিয়নসএ বক্তৃতা দিয়ে দেশময় আনন্দের সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন। এই বছরে এদেশে লর্ড ল্যানসডাউনের শাসন শেষ হয়ে লর্ড এলগিনের শাসন আরম্ভ হল। আর বিলেতে তথাকার প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন পদত্যাগ করলেন, জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং ফরাসীদেশে ড্রেফুসকে অন্যায়ভাবে দেশদ্রোহিতার ফাঁদে ফেলা হল।—এই বছরে দেশে বিদেশে বহু ইতিহাস রচিত হয়েছে। এবং এই বছরে বাঙালিনী জ্যোতির্ময়ী রাজপুতানায় জন্মগ্রহণ করলেন।

পিতা অবিনাশচন্দ্র সেন জয়পুররাজের দেওয়ান। পিতামহ সংসারচন্দ্র সেনও ঐ রাজের দেওয়ান ছিলেন। জয়পুর শহরও বাঙালী স্থপতির পরিকল্পিত। বাড়িতে যে ভাষায় জ্যোতির্ময়ী প্রথম কথা বলতে শিখলেন, বাড়ির বাইরে সে ভাষা অচল। বালিকা বয়সে এই দুই ভাষাবৈপরীত্যের মাঝখানে মনকে চালনা করবার একটি মুক্ত গবাক্ষ তিনি পেলেন গৃহগ্রন্থাগারের মধ্যে। অজস্র বাংলা বই আর সমসাময়িক যাবতীয় পত্রপত্রিকা। গ্রন্থজগতের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি মেলে শুধু দেখতেন আর ভাবতেন কবে সব পড়তে পারবেন। দশ এগারো বছর বয়সে যতটা পড়া যায়, পড়ে ফেললেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর প্রথম পরিচয় এই সব বইয়ের ভিতর দিয়েই। দুচোখ মেলে চারদিকে দেখেছেন এক দেশ, বইয়ের ভিতর দিয়ে দেখেছেন আর এক দেশ। একটি বাইরের দেখা, অন্যটি অন্তরের দেখা। বাংলা হিন্দি দুটি ভাষাই ছোটবেলা থেকে আয়ত্ত হওয়াতে রাজপুতানার আকাশ বাতাস মানুষ এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি যেমন রক্তে মিশল, তেমনি মনে জাগল ছবি—কল্পনার ছবি—কল্পনার বাংলাদেশ, মাতৃভূমি, পিতৃভূমি। তাই পরবর্তীকালে তিনি যে সব গল্প লিখলেন, রাজস্থানের মানুষদের নিয়ে, সে সব গল্পে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর স্বাদগন্ধ ফুটে উঠল তাঁর নিপুণ কলমে। অবাংলাদেশের গল্প রচিত হল বাংলা ভাষায়, দুটি রাজ্য যেন এক হল তাঁর কলমের মুখে।

মাত্র এগারো বছর বয়সে জ্যোতির্ময়ী পরলেন বধূর বেশ। সে যুগে এমন ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। স্বামীগৃহ গুপ্তিপাড়ায় কিন্তু

বিবাহিত জীবনও বাংলাদেশে একটানা কাটাতে পারলেন না। স্বামী পাটনায় অ্যাডভোকেট, অতএব রাজপুতানী বাঙালিনী পুনরায় বিহারিণী হলেন।

মাত্র পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবন।

প্রবাসিনীরূপে প্রথম জীবনে জয়পুরে, বিবাহিত জীবনে গুপ্তিপাড়া ও পাটনায়, ও পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাবর্তন। দেশের যে বিস্তার পেলেন আপন অভিজ্ঞতার মধ্যে, সেই বিস্তারের মধ্যেই তিনি পেলেন পরবর্তী জীবনের সার্থকতা। নানা তীর্থে ঘুরলেন, দুর্গম পথের পথিক হলেন। বিবাহিত জীবনেই তিনি শিল্পীরূপে নিজেকে বিকশিত করে তুলেছেন। সুপ্ত শিল্পীর জাগরণ ঘটেছে। মনের উন্মেষ ঘটেছে। ১৯১৮ সনে স্বামীহারা। সেই বছরেই তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে নিজের মনের কাছেই যে ভাষায় তিনি আত্মগতভাবে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করেছেন, বাংলা 'স্মরণ' কাব্যের জগতে তার চেয়ে মর্মস্পর্শী কবিতা আমি আর পড়েছি বলে মনে পড়ে না। এ কবিতাটি জ্যোতির্ময়ী তাঁর তীর্থপর্যটন বিষয়ের গ্রন্থ "সময় ও সুকৃতি''র (ডি-এম লাইব্রেরি) প্রথমে উৎসর্গ রূপে নিবেদন করেছেন—

শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথি। ঘন ঘোর মেঘে
ঝাপসা আকাশ। নিচে বসেছিল জেগে
ধরিত্রী মলিন মুখে। বায়ু এলোমেলো
সারারাত ঘরে মোর এলো আর গেল,
হাতখানি ধরে পাশে বসিয়া ছিলাম।
যদি কথা কও। যদি ডাক ধরে নাম।
যদি কিছু বল। চির বিচ্ছেদের ক্ষণ
ঘনায়ে আসিল তাহা নাই কি স্মরণ?
নিবিল রাতের দীপ। প্রভাতের আলো
অবশেষে দুজনারি নয়নে মিলালো।
বিমূঢ় অন্তর, মূক অশ্রুহীন শোক
সহসা হেরিল পাশে আরেক ভূলোক!
ভেঙেছে মাটির ঘর।
শুধু পথ চলি।
তারি সঞ্চয়ের আজ এনেছি অঞ্জলি।

(৪ঠা ভাদ্র, ১৩২৫)

অল্প কথায়, সংযত প্রকাশে, এ কবিতাটি অতুলনীয়। কথা কম, কিন্তু



জ্যোতির্ময়ী দেবী

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৬৬

এমন ঘনসন্নিবিষ্ট যে তার অন্তরালে যে বিরাট এক হিমশৈল নিমজ্জিত অবস্থায় আছে, তা এর উপরিতলের অংশটি দৃশ্য হওয়া মাত্র বোঝা যায়। মনের কোন্ অবস্থায় এ কথাগুলি বলা, তা একবার কল্পনা করলে এর সমস্ত বেদনার সুরটি পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

পিতৃপিতামহ গৃহের বিরাট গ্রন্থসংগ্রহের কোনো বই বোধ হয় পড়তে বাকি ছিল না। ইংরেজীও শিখলেন নিজের গরজে। শিল্পীমন এইভাবেই মনের ভিতরেও একটি মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। সমস্ত পাঠসাধনাই অন্তরের জরুরি তাগিদে। তাঁর শিল্পীসত্তা এইভাবেই নিজেকে নিজে পুষ্ট করেছিল। আগেই বলেছি শিল্পীমনের উন্মেষে স্কুলকলেজের নির্দিষ্ট পাঠ অপরিহার্য নয়। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এর বহু দৃষ্টান্ত আছে, এবং লেখিকাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু অন্য কোনো বাঙালী লেখিকা ভিন্নপ্রদেশে প্রবাস-জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হয়ে সেইপ্রদেশের কথা মাতৃভাষায় এমন সুন্দর করে বোধ হয় ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি কিপলিঙের সঙ্গে তুলনীয়। সবরকম গল্পই তিনি লিখেছেন, কিন্তু প্রত্যেকটিই তাঁর দেখা ও অভিজ্ঞতা থেকে। কল্পনা করে অভিজ্ঞতার বাইরের বিষয় নিয়ে তিনি কিছু লিখতে চেষ্টা করেন নি। অনেক প্রাচীন কাহিনীও পুনর্গঠন করেছেন বটে, কিন্তু তার সমস্ত আবেষ্টনটা নিজের চোখে দেখে এবং মনে অনুভব করে তবে। তাঁর শিল্পসাধনা প্রধানতঃ বাস্তব সীমানাতেই আবদ্ধ। সার্থকতাও তাঁর এইখানে।

ব্যঙ্গদৃষ্টিও তিনি লাভ করেছেন অদ্ভুত। সমাজের বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী আজও সক্রিয়।

সমাজসেবিকারূপে সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্না কন্যা শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত আমাকে লিখেছেন, "মার কথা অনেক লেখা যায়। তাঁর গল্প বলার শেষ এখনও হয় নাই। এত পড়াশুনা করিতে, ও এত অসুবিধা ও সকল রকম কষ্টের মধ্যেও লেখার চর্চা রাখিতে পারিয়াছেন এটা আশ্চর্য মনে হয়। আমরা যখন ছোট ছিলাম, নানারকম বই পড়িবার ও দেশ বেড়াই-বার যে সুযোগ পাইয়াছিলাম সে মায়েরই জন্য। তাছাড়া আরও দেখিয়াছি নিজের কথা না ভাবিয়া অন্যের জন্য নিজেকে ক্ষয় করিতে।···কঠিন পারি-পার্শ্বিকের মধ্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া সাহিত্যসাধনা করা সম্ভব হইয়াছে বোধ হয় এই জন্য যে আনন্দ পাইবার ঐ একটিমাত্রই অবলম্বন তাঁর নিজের হাতে ছিল।"···(চিঠি ২৬-১১-৬৬)

শ্রীমতী অশোকার প্রত্যেকটি কথা সত্য, এবং সে কথা আমি জ্যোতির্ময়ীর সংস্পর্শে এসে নিজেও অনুভব করেছি। একদিকে কঠোর কর্তব্যবোধ, অন্য দিকে স্নেহমমতায় হৃদয়খানি ভরা।

পড়াশোনার ব্যাপারে দেখেছি সমসাময়িক কোনো বই বা পত্রপত্রিকা তাঁর তালিকা থেকে বাদ পড়ে নি। ব্যাপকভাবে পড়েছেন এবং মনে রেখেছেন। তাই বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরেই আমি যুগান্তর সাময়িকীতে যে রচনাটি লিখেছিলাম, তা পড়ামাত্র বনবিহারী সম্পর্কে তাঁর ছোট্ট একটুখানি স্মৃতি আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, আমি তা আমার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত প্রবন্ধে (১৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত করেছি। বনবিহারীর লেখা তিনি প্রত্যেকটি মনোযোগের সঙ্গে বঙ্গবাণী প্রভৃতি কাগজে পড়েছেন এবং তা যত্ন করে সংগ্রহ করে রেখেছেন। এবং তাঁরই সংগ্রহ থেকে অধুনা অপঠিত এবং বিস্মৃত "সিরাজির পেয়ালা" নামক অবিস্মরণীয় উপ-উপন্যাসটি সাপ্তাহিক বসুমতীতে (১৪-৪-৬৬) পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়েছিল। বনবিহারীর দশচক্র, যোগভ্রষ্ট, সিরাজির পেয়ালা, প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর মনকে কি পরিমাণ নাড়া দিয়েছিল এবং তিনি ঐ সব কাহিনীর অন্তর্নিহিত বাণীটি কিভাবে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন তার আভাস আছে সেই উদ্ধৃত রচনাটিতে। আমাদের দেশের কোনো লেখিকা অন্যের লেখা সম্পর্কে এতখানি সশ্রদ্ধ মত প্রকাশ কোথাও করেছেন কি না আমার জানা নেই। আমি "অন্যের" অর্থে প্রকৃত শক্তিশালী অথচ অবজ্ঞাত লেখক সম্পর্কেই বলছি। অন্যের অনুকরণে প্রসিদ্ধ লেখককে প্রশংসার কথা বলছি না। অবশ্য এ কাজে লেখার মূল্য নিরূপণের সহজ ক্ষমতা এবং সে বিষয়ে মত প্রকাশের মতো সাহস থাকা চাই। এ সাহস আসে যখন নিজেরই প্রতি নিজের প্রকৃত শ্রদ্ধা জাগে। যখন নিজের একটি জীবনদর্শন রচিত হয়ে যায়।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর "সময় ও সুকৃতি" নামক নানা তীর্থ পর্যটনের কাহিনীগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে তাঁর এই পরিপক্ক মনের পরিচয়, তাঁর জীবনদর্শনের পরিচয়, তাঁর স্থিরবুদ্ধি এবং জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত মনের পবিচয়।

তাঁর রাজস্থানী জীবনচিত্রগুলির কথায় ফিরে যাই। বর্তমানকালে রাজ্যে রাজ্যে বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতি আদানপ্রদান, জাতীয় জীবনের একটি অঙ্গ হতে চলেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে জ্যোতির্ময়ী তাঁর অজ্ঞাতসারেই এ কাজ বহুদিন পূর্ব থেকে আরম্ভ করেছেন। তিনি রাজস্থানী সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালী পাঠককে ঐ রাজ্যের সঙ্গে পরিচিত

করাতে চেষ্টা করেন নি। তিনি রাজস্থানী জীবনকেই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর এ সব গল্পের মধ্যে রাজস্থানের বড় ঘর ছোট ঘর সব ঘরের কথাই চিত্রিত হয়েছে। এ যেন কোনো রাজস্থানী লেখিকা বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মতো আয়ত্ত করে রাজস্থানী জীবনচিত্র এঁকে গেছেন। এবং এ কথা অনেকখানি সত্য বৈকি। জ্যোতির্ময়ী রাজস্থানী মেয়েই তো!

এখন ওদেশের আসল কোনো লেখক বা লেখিকা যদি এই গল্পগুলি তাঁদের ভাষায় অনুবাদ করেন, তবে তিনিই এগুলির মূল রচয়িতা বা রচয়িত্রী-রূপে ভুল করে পরিচিত হয়ে যাবেন। কিন্তু ও রাজ্যে এমন কথাশিল্পী কেউ আছেন কি? জোতির্ময়ীর আরাবল্লীর অন্তরালে বই পড়ে রাজশেখর বসু লিখেছিলেন (২-১০-৫৮) "কয়েক বৎসর আগে কোনও মাসিক পত্রিকায় আপনার 'ওমদা বাঈ'এর কথা পড়ে মনে হয়েছিল, শক্তিমতী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছে। 'আরাবল্লীর অন্তরালে' বই-এ আপনার পূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। টমাস হার্ডির স্নিগ্ধ পল্লীচিত্র, আরব্য উপন্যাসের রহস্য, আর ক্ষুধিত পাষাণের বেদনা আপনি একত্র সমাবেশিত করেছেন।"…

বিহারী-বাঙালী, রাজপুত-বাঙালিনীর সাহিত্য পড়ে মুগ্ধ!

রাজস্থানের পক্ষ থেকে জ্যোতির্ময়ীকে পৃথকভাবে সম্মানিত করা উচিত। এমন সহানুভূতির সঙ্গে, এমন শিল্পীর দৃষ্টিতে, ওদেশের মানুষকে ওদেশের কেউ দেখেছেন কি না আমার জানা নেই।

"আরাবল্লীর আড়ালে"র আরম্ভে লেখিকার একটি নিবেদন আছে, ওদেশের যে সব মানুষ তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে তাদের কিছু পরিচয় তাতে আছে। তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় মনে করি। তিনি বলছেন (১৯৫৬)…

"ছোটবেলায় প্রায় ৪৫ বৎসর আগে রাজস্থানের একটি রাজ্যের অন্তঃপুরে আমাদের বাড়ির গৃহিণীদের আমন্ত্রণনিমন্ত্রণে যাতায়াত ছিল। মোগল হারেমের মতই সেই অন্তঃপুরের ব্যবস্থা ছিল। বাইরে প্রহরী ভিতরে প্রতিহারিণী দ্বারা রক্ষিত খোজাশাসিত সে অন্তঃপুরে।

"অসংখ্য সুন্দরী নারী নানা বিশেষণে, পাত্রী-পর্দায়েৎ-পাশোয়ান নামে অভিহিত তারা, রূপে অতুলনীয়, গানে নাচে বাজনায় অভিনয়ে সুপটু প্রায় সকলেই। মহারাণী ও রাণীদের তারা সখী, সঙ্গিনী, দাসী। বাপের বাড়ি থেকে যৌতুক স্বরূপ কিনে আনা, খুঁজে আনা মেয়ে তারা।

কখনো বা উপযাচক হয়ে দরিদ্র বাপ মাও দিয়ে গেছে সুন্দরী মেয়ে।— যদি কোনাদিন রাজনেত্রবর্তিনী হয়। নিজেও এসেছে কতজন ঐ আশায়] রাজপুতের মেয়ে প্রায়ই সুন্দরী হয়। রাজস্থানের অন্য বর্ণের মেয়েরাও কম সুন্দর নয়। ব্রাহ্মণ বৈশ্যদের (বামন বেনিয়া) মেয়েরাও রূপবতী।

"বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের 'রূপনগরী'দের রূপের কথা, মোগল অন্তঃপুরের রূপসীদের কথা যে কত সত্য তা রাজোয়াড়ার অন্তঃপুরে যাঁরা গেছেন তাঁরা দেখেছেন। রাজস্থানের হাটে মাঠে বাটেও উঁচু খোঁপা বা লম্বা বেণী ধারিণী গ্রাম্য ঘাগরা ও ওড়না (লুগড়ী)—কাঁচুলি পরিহিতা গ্রাম্য কন্যারাও কম সুশ্রী, সুন্দরী নয়।......সেকালে সেই অনতিপরিণত মনে এবং মনের চোখে তাদের দেখেছিলাম। কখনো নানা অভিনয়-মুখর উৎসব জলসায়, কখনো শোক বিয়োগের সভায়। কোনো সময় শুধুই গূঢ় উদ্দেশ্যময় রাজনীতির আলাপ আলোচনাময় সভায়। অবশ্য পুরুষহান। শুধু রাজা ও রাজপুত্র এবং তাঁর প্রেয়সীদের তনয় ছাড়া (লালজী সাহেবরা রাজার ছেলে কিন্তু রাজপুত্র নয়) সেখানে আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। একেবারে খোজাশাসিত অন্তঃপুর। রাণীদের মুখ ঢাকা। মহারাণী বাদে সকল রাণীই অবগুণ্ঠনবতী। সখীদের শুধু মাথায় ওড়না মুখ ঢাকা নয়।

"কালে ধর্মে এখন বহু রাজ্যেই পর্দা ছিঁড়ে গেছে। সখীরা পাত্রীরা আর আছে কি না জানি না। কিন্তু সকল রাজ্য এখনো নতুন রীতি নেয় নি, এও জানি। তাদের জীবনের সুখদুঃখের লীলা বোধ হয় এই একইভাবে এক পুরুষকে (রাজাকে) কেন্দ্র করেই চলেছে। যারা কোনোদিন পত্নীজননীর পূর্ণ সম্মান পাবে না। সন্তানের মা হলেও। এবং বেশির ভাগ যাদের শুধু ঐ একমাত্র আশা নিয়ে বেঁচে থেকে একদিন মৃত্যু হবে।"...

বাংলাদেশের গল্পও অনেক আছে। রাজযোটক (রঞ্জন পাবলিশিং) বইখানিতে যে সব ছোট গল্প আছে, তার রচনা নৈপুণ্য মনকে মুগ্ধ করে। হাসি অশ্রু মিলিয়ে লেখা। এক একটি কাহিনী মনকে ধাক্কা মেরে যায়। ছোট গল্প যেমনটি হওয়া উচিত এগুলি তাই। অবান্তর কথা নেই, অত্যন্ত সংযত সমাপ্তি। "মনের অগোচরে" আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই। এছাড়া তিনি মেয়েদের নানাদিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আগের যুগে অনেক লেখা লিখেছেন।

প্রচারবিমুখ শক্তিমতী নীরব সাহিত্যসেবিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী সাহিত্যের ইতিহাসলেখকদের কাছে অপরিচিত। চল্লিশ বছরের উপর লিখেছেন, এবং বাংলার সকল প্রধান সাময়িক পত্রে তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে। গ্রন্থরূপেও অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তবু ইতিহাসলেখকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছেন তিনি। এ বিষয়ে তিনি বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দলে।

কিন্তু জ্যোতির্ময়ী দেবীর মনের আভিজাত্য তাঁকে আত্মপ্রচারের হীনতায় নামতে দেয় নি। মনে হয় এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং কঠোরভাবে উদাসীন। তিনি মনের মধ্যে যে আলো লাভ করেছেন, বেদনাপথের পথিকরূপে জীবনভোর যে সাধনার পথে অক্লান্ত চরণে এগিয়ে চলেছেন, তার কাছে নিন্দাপ্রশংসার একই মূল্য। এবং তাই তো তিনি জোরের সঙ্গে আমাকে লিখতে পারলেন "সত্য কঠিন, তাকে ভালবাসতে পেরেছি" (রবীন্দ্রনাথ)। অসত্য প্রতিষ্ঠার বা খ্যাতির মোহ আমার নেই। ও বৃথা নাম আমি নেব না। (চিঠি, ১৯-৯-৬৬)।

এই মহত্তর সত্যে প্রতিষ্ঠিত মহীয়সী নারী জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় বৃদ্ধি প্রয়োজন।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

১৮৯৭

নীরদচন্দ্র চোধুরীকে আমি প্রায় ২৫ বৎসর দেখি নি। কিন্তু তাঁর নানা লেখার ভিতর দিয়ে তাঁকে আমি বেশি করে দেখি এখন। চিঠির ভিতর দিয়েও কিছু যোগসূত্র আছে। যখন প্রায় প্রতিদিন দেখা হত (১৯৩২-৪০) তখন তাঁর আচরণের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। ব্যক্তিগত ব্যবহারে কোনোদিন কোনো সময়ের জন্য তাঁকে অনাকর্ষক মনে হয় নি, বরং তাঁর সান্নিধ্য আমার দিক থেকে সব সময়েই ভাল লাগত। এবং নিকট দৃষ্টিতে তাঁর যে পরিচয় আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা এমনই বিস্ময়কর যে তা প্রকাশ করলে অতিবাদের মতো শোনাবে। আমার মনে হয় বাইরের লোক হিসাবে আমি তাঁকে যেভাবে বুঝতে পারি, অন্য কেউ ঠিক তেমন পারেন না, সেজন্য বহুজনেই তাঁকে ভুল বোঝেন, এবং তাঁর লিখনভঙ্গি এবং পাণ্ডিত্যের পরিধিও অনেকে সহ্য করতে পারেন না, মনে করেন ওটা দাম্ভিকতা। অথচ আমি জানি দাম্ভিকতা তাঁর নেই। ভুল বোঝার কারণ আরও একটুখানি বিস্তারিত বলি। তিনি সত্য কথা জোরের সঙ্গে বলেন, এবং অনেক সময় মূঢ়তার বিরুদ্ধে কলম ধরলে বেশ একটু আঘাত দিতেও চান পাঠককে। ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত, এবং সুযোগ পেলে ছাড়েন না। আঘাত রূঢ় হয় অনেক সময়।

বহু বিষয়ে মত প্রকাশের অধিকার নীরদবাবুর আছে, কারণ বহুবিষয় তাঁর জানা। জ্ঞানের নানা বিভাগে তাঁর অনায়াস বিচরণ। বর্তমান যুগে সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় যে পরস্পর সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন নয়, এটি সন্দেহাতীত রূপে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ জন্য যিনি জ্ঞানের এই চারটি দিক আয়ত্ত করেছেন, তিনি কোনো একটি বিশেষ সত্যকে বৃহত্তর পটভূমিতে দেখতে পান, তাই তাঁর চোখে সে সত্যের চেহারা স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র হবে। একটি রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গেলেও আরো দশটা সমজাতীয় ঘটনা মনে পড়ে যায়।

নীরদবাবুর দিক থেকে এই দৃষ্টি-পার্থক্য প্রচারের অধিকার আছে, কারণ এই একটি ব্যক্তি বহু বিষয় শুধু জেনেছেন তাই নয়, এই জ্ঞান তাঁর মনীষাকে অন্য স্তরে উন্নীত করেছে। ছাত্রজীবন থেকে তিনি স্বাধীন মত

গঠন ও প্রচার করে আসছেন। এবং ফলে ক্রমে তাঁর যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির উন্মেষ ঘটেছে তাতে তিনি যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থাকবারই চেষ্টা করেছেন, যদিও যান্ত্রিক নিরপেক্ষতা লাভ করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

নীরদবাবুর প্রখর পছন্দ অপছন্দ আছে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের দিকে ঝোঁক আছে, রুচির উগ্র স্বাতন্ত্র্য আছে, ক্রোধ আছে, প্যাশান আছে, হৃদয়াবেগ আছে, শৌখিনতা আছে, অতএব তিনি যন্ত্র নন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ যা আমি তাঁর সান্নিধ্যে এসে অনুভব করেছি, এবং তাঁর লিখিত বিবিধ গ্রন্থের ভিতর দিয়ে এবং নানা সাময়িক পত্রের ভিতর দিয়ে, সে হচ্ছে তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও আন্তরিকতা। তাঁর মধ্যে একজন জাত শিক্ষকের স্থায়ী বাস আছে, প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কাছে সেই শিক্ষকের কোনো ক্লান্তি নেই। আমি তাঁর কাছে অনেকবার অনেক জিজ্ঞাসা নিয়ে গিয়েছি, তিনি আন্তরিকভাবে সব ব্যাখ্যা করেছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবং সে কথা আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

নীরদবাবুর মতো বহুমুখী প্রতিভা বাঙালীর মধ্যে শুধু নয়, অন্যান্য দেশেও কটা আছে জানি না। একই সঙ্গে নানা বিদেশী ভাষায় পাণ্ডিত্য (বাংলা ভাষাতেও এবং একথা বলতে হল, অনেকের জানা নেই যে এতেও তাঁর সমান অধিকার), পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, সামরিক ইতিহাস ও বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের সকল তত্ত্ব, বিশ্ব-সাহিত্যের সকল তথ্য, বিশ্ব রাষ্ট্রনীতি, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভাষা বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, ইউরোপীয় ও ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা এবং শিল্প তত্ত্বে পাণ্ডিত্য, ও নানা যান্ত্রিক তথ্য তাঁর ভাল জানা আছে। সাহিত্যরসবোধ এবং সাহিত্যের মূল্য নিরূপণের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি। তিনিই ঐ বইয়ের প্রথম শ্রোতা, গুণগ্রাহী এবং প্রচারক। তারপর পথের পাঁচালি বিচিত্রায় প্রকাশিত হতে থাকে, এবং ১৯২৯ সনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ সব কথা বিভূতিবাবুর কাছ থেকে আমি নিজে শুনেছি।

কোনো একটি বিষয়ে, বিশেষজ্ঞের চোখে দেখা, আর যাঁর জ্ঞানের পটভূমি এত বিস্তৃত তাঁর চোখে দেখায়, স্বভাবতই কিছু পার্থক্য থাকবেই। যতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করলাম, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি পরস্পর সম্পর্ক-হীন মনে হলেও, শুধু শিক্ষিত মনের দিক থেকেই নয়, বস্তুগতভাবেও তারা

মুখ্য বা গৌণ যে ভাবেই হোক, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই জন্যই নীরদবাবুর দেখাকে তাঁর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে চেষ্টা না করলে অন্যের সঙ্গে সহজেই বিরোধ বেধে ওঠে। এ জন্য তাঁর সমালোচকের সংখ্যা বেশি। এ বিষয়ে নীরদবাবুও ভালই জানেন। তিনি এ বিষয়ে একখানা চিঠিতে (২-৮-৫৮) লিখেছিলেন "আমার সম্বন্ধে [স্মৃতিচিত্রণে] লেখা দেখিয়া আমার বন্ধুরা (যাঁহারা এখনও বাংলা পড়েন)—দেখাইয়াছেন। তাঁহারা এই বলিয়াই মহোৎসাহে আমাকে দেখাইতে আনেন যে, "একজন অন্তত নিন্দা না করিয়া আপনার প্রশংসা করিয়াছেন।"

অর্থাৎ নীরদবাবুকে আমার প্রশংসা তাঁদের কাছে একটি বিশেষ দুর্লভ সংবাদ, এই হিসাবে তাঁরা আমার লেখা তাঁকে দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন।

আমাকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন (২২-৬-৬৫) "আমার লেখার বিরুদ্ধে এখন যাহা বাহির হয় তাহা এখন আমি পড়াও ছাড়িয়া দিয়াছি।"

আমার কাছে, যেমন আগে বলেছি, নীরদবাবুর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ তাঁর আন্তরিকতা (এবং তার সঙ্গে যোগ করি, বন্ধুবাৎসল্য)। তিনি জীবনে কতগুলি নীতি স্থির করে নিয়েছেন এবং সেই নীতিগুলি থেকে যাতে ভ্রষ্ট না হন, তার জন্য তাঁর সময়ের সঙ্গে লড়াই চালাতে হয় অবিরাম। তিনি যে নীতিতে বিশ্বাস করেন, জীবনকে তিনি ঠিক সেই-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। এইখানে তিনি চরমপন্থী। এক ক্ষাণদেহ বাঙালী গ্র্যাজুয়েটের ভারতীয় চিন্তাজড়তা থেকে আশ্চর্য মুক্তিলাভ। এ শুধু আপন নীতিকে জীবনে প্রয়োগ করবেন পণ করেছেন বলেই সম্ভব হয়েছে। এর জন্য যে প্রচণ্ড মনোবল দরকার, যে নির্ভীকতা এবং পারি-পার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রাম দরকার, তা তাঁর মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রকট। এই সংগ্রামের ক্ষমতা আছে বলেই তিনি "আন্‌নোন ইণ্ডিয়ান" থেকে একজন "ভেরি মাচ্‌ নোন ইণ্ডিয়ান" হতে পেরেছেন। আমাদের এই 'কনটিনেণ্ট অভ সার্সি'তে বসেও তিনি সার্সির জাদুপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছেন শুধু সেই জন্যই। (The Continent of Circe দ্রষ্টব্য।)

নীরদবাবুর এবং আমার জন্ম বৎসর একই। অনেক বিষয়ে দুজনের মানস গঠনও এক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের এবং মনোবলের দিক থেকে দুজনের মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান। নীরদবাবুর অদম্য উৎসাহ এবং বন্ধুপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করে। যে-কোনো বিষয়ে তিনি অনেকখানি সময় কি করে দিতে পারেন ভেবে বিস্ময়বোধ হয়। তিনি আমার স্মৃতিচিত্রণ পড়ে



নীরদচন্দ্র চৌধুরী

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৪০

লিখেছিলেন (২২-৮-৫৮)—

…"The whole family read it with great enjoyment. My eldest son who has only heard of the life in Bengali society as it was lived in our young days, finds it a most informative and interesting documentation. I was most interested in seeing in what way your development and career have been similar to or different from mine, and I would certainly say that you have been more Bengali while I have broken out of that mould. Perhaps I no longer belong to contemporary India even, at least not to the dominant order. Apart from it I found your straightforwardness and sincerity very attractive"…

এই চিঠিতে আমাদের দুজনের মধ্যে যে পার্থক্য (বন্ধুত্বের নয়) গড়ে উঠেছে, তার কারণ কি, সে কথা আগে বলেছি। অর্থাৎ সাহস ও মনোবলের দিক থেকে পার্থক্য বেশি। এবং সে সাহস ও মনোবল তিনি লাভ করেছেন, কারণ প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করবার অস্ত্র তাঁর বহু।

দেশে বিদেশে তাঁকে বহু পত্রপত্রিকায় লিখতে হয়, গ্রন্থ রচনায় ডুবে থাকতে হয়, এর মধ্যেও কাজের বাইরে এত সময় পান কি করে সে বিষয়ে আমার কৌতূহল মিটিয়েছে তাঁর চিঠি। তিনি লিখেছেন (৩০-৪-৬৫)

"আপনি সময়ের কথা লিখেছেন। আমার সময়ের অভাব হওয়া দূরের কথা, অবস্থা উল্টা হইয়াছে। এত অবকাশ যে, সময় যেন কাটিতেই চায় না। মাঝে মাঝে bored বোধ করি। আমার রিক্রিয়েশন যথেষ্ট —গান, পড়াশুনা ইত্যাদি ছাড়া কুকুর আছে, বাগান আছে। সবেরই সেবা নিজ হাতে করি।"

আর একখানা চিঠিতে (২২-৬-৬৫)—

"…কি খাইতে পারি, কি খাইতে পারি না, এবং কি খাইলে শরীরের উন্নতি বোধ করি, তাহার বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা হইয়া গেল। তাহা ছাড়া ঘুমানো, পরিশ্রম ও রিক্রিয়েশনেরও একটা নিয়ম করিলাম। শুনিয়া সুখী হইবেন, ইহার ফলে ৬৮ বৎসর বয়সে যে শারীরিক এফিশেন্সি অনুভব করি, তাহা জীবনে কখনও অনুভব হয় নাই। এমন কি [ইহা] আজকালকার যুবকদেরও নাই। ছাতে একটি বাগান আছে। তাহাতে প্রায় ৩০০।৪০০ গাছ আছে। ৩০।৪০ বালতি জল ট্যাঙ্ক হইতে নিতে কষ্ট

বোধ করি না। তবে শারীরিক শ্রম কি করিতে পারি তাহার মাত্রা সম্পূর্ণ জানি, কখনও অতিরিক্ত করি না। আপনার পক্ষে একেবারে এই 'রেজিমেন' করা সম্ভব হইবে না। তবে ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার ধরন একটু পরিবর্তন করিবেন। আপনার জন্য আমি একটি প্রেসক্রিপশন দিতেছি”……

জীবন নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছি আগে, সেটি যে দেহসমেত নিয়ন্ত্রণ তার আভাস পাওয়া যাবে এই চিঠিতে। নীরদবাবুর সমস্তই exact হওয়া চাই। এই তাঁর সাফল্যের ভিত্তি। তাঁর সমস্ত শিক্ষা এবং পাণ্ডিত্য এর উপর দাঁড়িয়ে আছে।

আমি অ্যাটমিকের বাংলা যাঁরা আণবিক বা আণব করেন, তাঁদের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬-৫-৬৫)। এই সম্পর্কে নীরদবাবু আমাকে লিখছেন (৭-৬-৬৫) “আপনার আণবিক প্রবন্ধ পড়িলাম। Inexactitude আমাদের মজ্জাগত, বৈজ্ঞানিক হইলেও নিষ্কৃতি নাই।”…

আমার পূর্ব কথা, এই একটি উদ্ধৃতি সমর্থন করছে। অর্থাৎ নীরদবাবু সর্ববিষয়ে যথাযথ না হলে তাঁর ব্যক্তিত্বই যে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তাই চিন্তা-শৈথিল্যের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত জীবন অতি কঠিন সংগ্রাম। এখনও ইংরেজী সাপ্তাহিকে তাঁর প্রায় নিয়মিত লেখায় তাঁর স্বধর্ম প্রবলভাবেই প্রকট।

নীরদবাবুর নিন্দুকের সংখ্যা বেশি কেন, সে কথা আগে বলেছি। তিনি আরও নিন্দুকের সংখ্যা বাড়িয়েছেন তাঁর শেষ বইএর সাহায্যে। 'দি কন-টিনেণ্ট অভ সার্সি' ভীষণ আলোড়ন জাগিয়েছে।

দি কনটিনেণ্ট অভ সার্সি বই হিসাবে ছাপা হওয়ার আগে নীরদবাবু আমাকে তার একটি সূচিপত্র পাঠিয়েছিলেন। তা পড়ে, তারপর স্টেটস-ম্যানে প্রকাশিত সারাংশগুলি পড়ে এবং হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে সরোজ আচার্যের লেখা সমালোচনা পড়ে এ বই সম্পর্কে আমার মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে।

নীরদবাবু আমাকে চিঠিতে যা জানিয়েছিলেন তা এই—“আমার নূতন বইটি বড়। সুতরাং উহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব না। জুলাই (১৯৬৫) মাসের মধ্যে বাহির হইবে, তখন দেখিবেন। ইহাতে হিন্দু কালেকটিভ সাইকোলজি লইয়া আলোচনা করিয়াছি উহা সম্পূর্ণ নূতন। প্রাচ্যে বা

পাশ্চাত্যে কেহ এই সব কথা বলে নাই।…আমাদের গতানুগতিক তুচ্ছ ও মিথ্যা রোমান্সের জায়গায় আমি একটা বড় ট্র্যাজিক রোমান্স খাড়া করিয়াছি। আমি আমার পাশ্চাত্য বন্ধুদের বলি—এই বই পড়িয়া আপনারা প্রথমে হিন্দুদের শ্রদ্ধা করিতে শিখিবেন। হিন্দুর জাতীয় জীবন যে এত বড় ট্র্যাজিডি, আমারও আগে এই ধারণা ছিল না।" (৩০-৪-৬৫)

এই বইতে নীরদবাবু ভারতীয় চরিত্রকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তার অ্যানাটমি শুধু নয়, তার ফিজিওলজি, প্যাথোলজি, সবই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। যাই হোক, এ বিষয়ে আর বেশি বলা বোধ হয় উচিত হবে না, কারণ নীরদবাবুকে যাঁরা ভুল বোঝেন, তাঁদের সে ভ্রান্তি আমার কথায় যাবে না, আমি সে চেষ্টাও করব না।

১৯৩৭ সনে পাটনায় প্রভাতী সঙ্ঘের উদ্যোগে যে একটি অধিবেশন বসে তার সভাপতি হয়েছিলেন নীরদবাবু। কলকাতা থেকে নীরদবাবু, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যো: বিভূতি বন্দ্যো: সজনীকান্ত ও আমি (এবং ভাগলপুর থেকে বনফুল) সেখানে যাই। নীরদবাবু তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্তসার স্মৃতিচিত্রণে দেওয়া আছে। তাঁর সম্পর্কে ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) বেহার হেরালডে যা বলা হয়েছিল তার অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

"The first day's meeting began with the president Mr. Nirad C. Chaudhuri's address on the present state of culture in India. It need scarcely be said that Mr. Chaudhuri who is himself one of the most cultured men in India delivered a most illuminating address. It is a tribute to Mr. Chaudhuri's powers of expression and delivery that inspite of his subject being a difficult one, it was heard with rapt attention."…

প্রায় ত্রিশ বছর আগের সংবাদ এটি। সেদিন নীরদবাবুর নামের সঙ্গে সংবাদদাতা যে এপিথেট বা বিশেষণ প্রয়োগ করেছিলেন, আমি এই প্রবন্ধের গোড়াতে সেই বিশেষণই বিস্তার করেছি।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্পর্কে এত বলা যায়, যাতে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হয়ে পড়বার আশঙ্কা। সেজন্য আমি সংক্ষেপে মাত্র দু'একটি বিষয় বলব। তাঁর 'এ প্যাসেজ টু ইংল্যাণ্ড' (ম্যাকমিলান, ১৯৫৯) বইখানির সম্পর্কে আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করে, এত ভাল লেগেছে তাঁর এই ব্যক্তিগত অভি-

অজ্ঞতার কথাগুলি। কিন্তু তার আগে একটি মজার কাহিনী বিবৃত করা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনকালে কয়েক বছর প্রবাসী-মাসিকের লেখকরূপে গ্রন্থসমালোচনার ভারও পেতাম মাঝে মাঝে। ১৯৩৬ সনে ইউরোপ ভ্রমণ সংক্রান্ত একখানা বই আমি ঐ মাসিকে সমালোচনা করি। আমি সেই বই পড়তে গিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করি, কারণ সে রকম বই লিখতে ইউরোপ ভ্রমণের দরকার ছিল না। গ্রন্থকার আমার সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবাসী সম্পাদককে এক চিঠি লেখেন, তাতে বলা হয় দায়িত্বহীন সমালোচককে কেন ও বই দেওয়া হয়েছিল? রামানন্দবাবু আমাকে সেই চিঠিখানা পাঠিয়ে দেন। আমি নীরদবাবুকে সেই বইখানা দিয়ে ঐ চিঠিখানা দেখালাম।

নীরদবাবু বই পড়ে মহা উত্তেজিত। আগাগোড়া ভুল তথ্য এবং রুচিহীনতায় ভরা বইখানি নিয়ে তিনি বন্ধুদের দেখালেন এবং আমোদ উপভোগ করলেন প্রচুর। তারপর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণে এবং ইতিহাসে যত অজ্ঞতা ছিল সব তাঁর কথামতো তালিকাভুক্ত করে রামানন্দ-বাবুকে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর সব চুপচাপ।

কিন্তু নীরদবাবু চুপ করে রইলেন না। তিনি ঐ বই উপলক্ষে একটি রচনা তৈরি করলেন। সেটি শনিবারের চিঠি (বৈশাখ ১৩৪৪)-তে প্রসঙ্গ কথা শিরোনামায় ছাপা হল। তার ভূমিকাটি এই—

পশ্চিম প্রবাসের ফল

"একটি সত্য ঘটনার কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন ছোটকর্তা, শিক্ষিত, উগ্র রকমের স্বদেশী; তাঁহার নিকট একটি শিক্ষিত বেকার যুবক উমেদার হিসাবে উপস্থিত। যুবক বুদ্ধিমান এবং ছাত্র হিসাবে উচ্চসম্মানধারী হইলেও চুলে মুখে ও পোষাকে দেশী ছাপ দূর করিতে পারে নাই। সুতরাং কর্তা মহাশয় তাহার দিকে মুখ প্রায় না তুলিয়াই বলিলেন, "আপনার চাকরি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, আপনার চেয়ে ঢের কোয়ালিফায়েড লোক রয়েছে।" যুবক একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "আমার চেয়ে কোয়ালিফায়েড লোক নেই বলছি না, কিন্তু আপনি এখনও তো আমার কোয়ালিফিকেশন কি জিজ্ঞেস করেন নি?" কর্তার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া হুকুম করিলেন, "বলুন, আপনার কোয়ালিফিকেশন

কি, বলুন।" যুবক বলিল "আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ" ইত্যাদি। আর যায় কোথা! কর্তা মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "জানেন, এই পোস্টের জন্য ইউরোপীয়ান ডিগ্রীওয়ালা কজন ক্যাণ্ডিডেট আছেন?" যুবকের বোধ হয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। সে বলিয়া বসিল, "বাপ কিংবা শ্বশুরের পয়সা থাকলে আমার পক্ষেও কি ইউরোপীয়ান ডিগ্রী জোগাড় করা সম্ভব হত না?"—বলা বাহুল্য যুবকের চাকরি হয় নাই।

"ইউরোপীয়ান ডিগ্রীব প্রতি যে সমাজে এইরূপ অবিচল ভক্তি, সে সমাজে ইউরোপীয়ান ডিগ্রীর অভাবে ইউরোপে প্রবাস মাত্রও যে, শিক্ষাদাতা গুরু ও উপদেষ্টা বনিয়া যাইবার অধিকার দান করিবে তাহা বিচিত্র নয়, কারণ সমুদ্রপারঙ্গম হওয়ার দরুন নিজদিগকে সকল শাস্ত্র-পাবঙ্গম বলিয়া বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবিক। এই অধিকার সম্প্রতি অগণিত সাময়িকপত্রেব পৃষ্ঠায় অগণিত পিতা ও শ্বশুরের পয়সা সম্পন্ন ব্যক্তি জাহির করিতেছেন।...শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি "অনেকদিন থেকে 'ভারতবর্ষে' ভ্রমণবৃত্তান্ত যোগান দিয়ে আসছেন।" সংবাদপত্রসেবী মহলে একটা কথা প্রচলিত আছে—All is grist that comes to the mill. সুতরাং জ্ঞানপাপী সম্পাদকদের অনেক জিনিসকে ...স্থান দিতে হয়। কিন্তু বিপদ হয় সরলমতি লেখকদের লইয়া। তাঁরা সাময়িকপত্রে স্থান পাইয়া ভাবেন, মহাকালের দরবারে কায়েম হইবার মত কিছু করিয়া বসিয়াছেন।"...

এই হল নীরদবাবুর সেই লেখার ভূমিকা। আমি এ সম্পর্কে এতটা আলোচনা করছি এজন্য যে, ভবিষ্যতে নীরদবাবুকেও যে বিদেশে যেতে হবে, এবং মাত্র আট সপ্তাহ লণ্ডন প্যারিস ও রোমে বাস করে একখানা বই লিখতে হবে তা তখন তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল অবশ্যই। (তবে তিনি শ্বশুরের বা পিতার টাকায় ভ্রমণ করেন নি) এবং অল্পদিনের দেখায় ২২৯ পৃষ্ঠার যে বইখানি লিখেছেন (A Passage to England) তার প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এমন এক আশ্চর্য সুন্দর শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমান দর্শকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ আছে, তা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি উপভোগ্য-পাঠ্য। মোহিতলাল সম্পর্কে সাহিত্যচিন্তার এবং আদর্শের যে সীমা টেনেছিলাম, এখানে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত ইতিহাস—কোথাও কোনো সীমা নেই। এমন উদার দৃষ্টিতে, উদার উন্মুক্ত মনে এবং চোখে, কোনো নতুন দেশ, মানুষ, ও তার সমাজকে দেখা, উচ্চস্তরের শিক্ষাপ্রদ ঘটনা।

সমস্ত দেখা ও অভিজ্ঞতা, তাঁর মতো প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান লোকের পক্ষেই এমন অকপটে, এমন অতুলনীয় ভাষাভঙ্গিতে, প্রকাশ করা সম্ভব। তাঁর নিজের শিক্ষার যতগুলি স্তর আছে, তাঁর দৃষ্টিতে নতুন দেশের ইতিহাস ও ভূগোল ততগুলি স্তর একের পর এক পার হয়ে গভীরে বিস্তার লাভ করেছে। প্রতিটি দেখা যেন একটি উচ্চ রুচিবান দৃষ্টির আলো-স্নাত হয়ে তাঁর এই বইতে ঝলমল করে উঠেছে।

এ বই ছাপা হওয়ার আগে আমাকে যে চিঠি লেখেন (২-৮-৫৮) তাতে, ঐ যে ইউরোপ ভ্রমণের বই পড়ে তিনি একবার উত্তেজিত হয়েছিলেন, তার একুশ বছর পরেও সে কথা মনে পড়েছে। তিনি লিখছেন…"আমি সম্প্রতি আর একখানা বই [এ প্যাসেজ টু ইংল্যাণ্ড] লিখিয়াছি। লণ্ডনের ম্যাক-মিলানই বাহির করিতেছে। বোধ করি আগামী বৎসরের প্রথম দিকে। উহা আমার বিলাত দেখার বৃত্তান্ত। হয়ত বা একেবারে '—' ক্লাসের নাও হইতে পারে। আপনারা বিচার করিবেন।"…

নামটি উহ্য রাখলাম।

নীরদবাবু জীবনে অনেক পথ ঘুরে এসে তবে নিজেকে সম্পূর্ণ লাভ করেছেন। শনিবারের চিঠিরও তিনি সম্পাদক ছিলেন। মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন, এবং ইংরেজী ও বাংলায় অগণিত রচনা লিখেছেন। অনেকদিন পরে নতুন করে আবার বাংলা লেখা ধরেছেন দেখছি।

তাঁর আর একটি পরিচয় দিয়ে এ রচনা শেষ করছি। আমারই এক আলোচনার উত্তরে লেখা তাঁর চিঠি (৩০-৪-৬৫) থেকে উদ্ধৃত করছি—"আমি গত কুড়ি বৎসরে একটি নূতন বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছি। তাহাই আমাকে শক্তি দিতেছে। ইহার মূল কথা এই যে, বিশ্ব বা ইউনিভার্স'ই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি লইয়া আমার কাছে ভগবান। ভগবান বাহিরের সত্তা ন'ন, immanent in the cosmos. সুতরাং বিশ্ব যে শুধু স্বয়ংসৃষ্ট তাই নয়, স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংক্রিয়ও বটে। বিশ্বের শক্তিস্রোতের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনকে মিলাইয়া কাজ করাই সত্যকার সাধনা।"

কাজি নজরুল ইসলাম

১৮৯৯

মুখে হাসি লেগেই আছে, রঙ্গরহস্য শ্লেষ অফুরন্ত। একটা আত্মপ্রতিষ্ঠিত ভাবের দৃঢ়তা। নিজের মনের মধ্যে কোথাও হীনতাবোধ নেই। সংস্কার-মুক্ত মানবিক মন, মুক্ত মন, কোনো দিক দিয়েই সাম্প্রদায়িক হীনতার কোনো গোপন গলিঘুঁজি নেই—সমস্ত মনটা একটি প্রশস্ত মুক্তাঙ্গন, সেখানে সবাই স্বাগতম্, উঁচুনিচু ভেদ নেই।

হীনতাবোধের কথা বলেছি। এই হীনতাবোধের সঙ্গে যে মনের কোনো পরিচয় নেই, সে মন যে কি পরিমাণ উদার হতে পারে, তা একমাত্র নজরুল ইসলাম ছাড়া সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে আর তো কারো বিশেষ দেখা যায় নি। হীনতাবোধ আর ছিল না বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমি বড, আর কেউ কিছু না, অথবা আর সবাই খারাপ, আমি ভাল, এই বোধের মূলে রয়েছে হীনতাবোধের একটি কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্স থেকে নজরুল মুক্ত ছিলেন। নিজের উপর কি গভীর বিশ্বাস থাকলে এই হীনতাবোধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তা ধারণা করা শক্ত। তবে এর লক্ষণ হচ্ছে এই, যিনিই আত্মবিশ্বাসহীন, ঈর্ষাপরয়াণ এবং পাছে তাঁর দুর্বলতা কেউ ধরে ফেলে, সেই ভয়ে সর্বদা নিজেকে সবার সামনে বাড়িয়ে দেখাবার চেষ্টা করেন, বোঝা যাবে তিনিই মনে মনে হীনতাবোধের দ্বারা পীড়িত।

আমি নিজে নজরুলের সঙ্গে যে অল্পদিন মিশেছি, তাতে আমি কখনো তাঁর মুখে কারো নিন্দা শুনি নি, কারো প্রতি ঈর্ষার ভাব দেখি নি। নিজের শক্তি যেখানে অকৃত্রিম, সৃষ্টির কাজে যেখানে পরিপূর্ণতার বোধ আছে, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে যাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই, অন্যকে ঈর্ষা করবার তাঁর প্রয়োজন হয় না। অন্যের ঈর্ষাজাত বেদনা তিনি পেতে পারেন, কিন্তু ঈর্ষার প্রত্যাক্রমণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নজরুল যে বাণী প্রচারের জন্য এসেছিলেন, তা তাঁর জীবনের কোনো প্রতিকূলতাই রোধ করতে পারেনি, ব্যক্তিগত বহু দুঃখকষ্ট, বিরোধী পরিবেশ, অন্যায় আক্রমণ তাঁর কাছ থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে। তাঁর উদ্দেশ্য তিনি সিদ্ধ করে গেছেন, এবং আরও যা তাঁর মনে ছিল, এবং যা বাকি ছিল, এবং

যা আমাদের চোখে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, তা কোনো মানসিক প্রতিকূলতার জন্য নয়, দৈহিক প্রতিকূলতার জন্য।

সে সব প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আমি তাঁকে প্রথম দেখি ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে, কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত একটি মেসে। আমি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররূপে সেখানে কয়েক মাস বাস করেছিলাম। একদিন নলিনীকান্ত সরকার ও কাজি নজরুল ইসলাম সেখানে এসেছিলেন সাবিত্রী প্রসন্নের ঘরে। সে ঘরে কিরণ রায়ও বাস করত। কিরণ তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পরে সাবিত্রীপ্রসন্ন উপাসনার সম্পাদক হলে কিরণ তার সহকারী সম্পাদক হয়, এবং উপাসনা রূপান্তরিত হয়ে বঙ্গশ্রী হবার পরেও সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে সহকারী সম্পাদকরূপেই কাজ করতে থাকে, এবং পরে সম্পাদক হয়। বর্তমানে "প্রবাহ" সম্পাদক।

কিরণের দাদা (অধুনা মৃত) শম্ভু রায় ঐ মেসে মাঝে মাঝে এসে বাস করতেন। তিনি জমাদার শম্ভু রায়—নজরুলের সহগামী ছিলেন বাঙালী সৈন্যদলে। সে সূত্রে কিরণের সঙ্গেও নজরুলের আত্মীয়তা ছিল। জমাদার শম্ভু রায় পরে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন।

আমি আমার "স্মৃতিচিত্রণ" নামক স্মৃতিকথা মাসিক বসুমতীতে লিখতে আরম্ভ করি ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে (বাংলা ১৩৬৩ সালের পৌষ থেকে ১৮ কিস্তিতে শেষ হয়েছিল)। এই স্মৃতিকথায় আমি নজরুলকে প্রথম দেখার কথাও লিখেছি। এবং লিখেছি, তিনি সেদিন বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। এটি পরে জানতে পেরেছি ভুল। কারণ, ঐ কবিতা ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে লেখা হয়েছিল (ছাপা হয়েছিল ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে)।

এ ভুল হওয়া স্বাভাবিক, বহুদিন পরে লিখতে গেলে কোনো জিনিস স্পষ্ট মনে থাকে, কোনো জিনিস অস্পষ্ট হয়ে যায়, এবং অনেক জিনিস মন থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। নজরুলের মুখে বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি আমি পরে শুনেছি, সেজন্য সময়ের এদিক ওদিক হয়ে গেছে স্মৃতিতে।

তবু অন্তত আজও যে ঐ ভুলটি সংশোধন করবার সুযোগ পাওয়া গেল সেজন্য আমি খুশি। আমি এ বিষয়ে নলিনীকান্তকে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছিলাম, তার উত্তরে তিনি জানাচ্ছেন, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি-২-২৭-৬৬

পরম প্রীতিভাজনেষু,

নজরুলের "বিদ্রোহী"-র ইতিহাস চমকপ্রদ।



কাজি নজরুল ইসলাম

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৪০

"বিদ্রোহী"-র রচনাকাল ১৩২৮ সালের পৌষ মাসের প্রথমার্ধে। কিন্তু তথ্যান্বেষী দেখবেন—"বিদ্রোহী"-র প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা "মোসলেম ভারতে"। সুতরাং তিনি ভেবে বসবেন, তাহলে বিদ্রোহী ১৩২৮ সালের কার্তিক মাসের আগেকার রচনা। ব্যাপারটা এই যে, সে সময়ে "মোসলেম ভারত" নিয়মিত প্রতিমাসে বেরতো না। ঐ কার্তিক সংখ্যাটি বেরিয়েছিল পৌষের শেষের দিকে। আর মাঘ সংখ্যা "প্রবাসী"-তে অংশবিশেষ বর্জিত হয়ে "বিদ্রোহী" উদ্ধৃত হয়েছিল। কিন্তু বাংলা দেশের, বিশেষ করে কলকাতার, পাঠক-পাঠিকারা "বিদ্রোহী"-র প্রথম সাক্ষাৎ পেল "বিজলী"-তে। ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের "বিজলী"-তে "বিদ্রোহী"-র প্রথম প্রকাশ। শুনুন সে ইতিহাস। কবিতাটি নজরুল আমাকে দেবে বলেছিল "বিজলী"-র জন্য। কিন্তু আফজল (মোসলেম ভারতের পরিচালক) এক রকম জোর করেই নজরুলের কাছ থেকে "বিদ্রোহী"-র পাণ্ডুলিপি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই "মোসলেম ভারত" অফিসে। আফজল আমাকে দেখামাত্র বিজয়োল্লাসে মোসলেম ভারতের ছাপানো ফর্মাগুলি আমাকে দেখিয়ে বললে, "এই দ্যাখো, 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়ে গেছে।" ফর্মাগুলি হাতে নিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। যতগুলি প্রবন্ধ কবিতা ছাপা হয়েছে, সব কয়টির শিরোনামা লিখে নিলাম আফজলের অজ্ঞাতসারে।

নজরুলের কাছ থেকে "বিদ্রোহী"-র একটি কপি পূর্বেই সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। কথা ছিল—উদ্ধৃতি হিসেবে কবিতাটি 'বিজলী'-তে প্রকাশ করব। তাই করলাম, কিন্তু 'মোসলেম ভারত' বাজারে বেরোবার দু' তিন দিন পূর্বে ২২শে পৌষের 'বিজলী'-তে প্রকাশিতব্য মোসলেম ভারতের একটি সমালোচনা প্রকাশ করলাম কাগজের বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় শেষ কলমের শেষের দিকে, ১২ পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণ হলো "বিদ্রোহী"-র সমালোচনা প্রসঙ্গে। লিখলাম—"কবিতাটি এত সুন্দর হয়েছে যে, আমাদের স্থানাভাব হলেও তা 'বিজলীর'-র পাঠকপাঠিকাদের উপহার দেবার লোভ আমরা সংবরণ করতে পারলাম না—" ঐ ড্যাশটি টেনে পৃষ্ঠাটি পূর্ণ করে পরবর্তী ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কবিতাটি বেরিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, "মোসলেম ভারত" তখনও বেরোয় নি। এই হিসাবে বিদ্রোহীর প্রথম প্রকাশ ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের "বিজলী"-তে। আপনার সব হুকুম তালিম করলাম।

ইতি— আপনার নলিনী দা।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে নজরুলকে সেই প্রথম দেখা। তখন গায়ের মুখের রঙে যেন একটু আগুনে আভা ছিল, তাঁর রুক্ষ দেশে থাকার জের হিসাবেই হয় তো। আমার স্মৃতির মধ্যে ঐ রঙটা রয়ে গেছে, সে সময়ের বন্ধুরা আমার কথার সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। এই আগুনের আভা তাঁর পোষাকের প্রতিফলন কিনা মনে নেই, এবং মনে নেই তিনি সেদিন ঠিক কোন্ পোষাকে এসেছিলেন। অগ্নিবীণার কবির সম্পর্কে আমার সেদিনের এই ক্ষীণ স্মৃতি আজও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়।

তার পর কাজি নজরুলের সঙ্গে মাঝে মাঝে অনেকবার দেখা হয়েছে আমার, কিন্তু তা সাময়িক। ১৯২৭ সনে দীনেশরঞ্জন দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে—সম্ভবত গিরিজা মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায়। দীনেশরঞ্জন তখন কল্লোল সম্পাদক। তার কিছুদিন আগে থেকে নানা কাগজে লিখতে আরম্ভ করেছি। লেখা বন্ধুবান্ধবেরা চেয়ে নিয়েছেন, আমি সঙ্কোচবশত নিজে কোথাও পাঠাইনি কখনো। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে নজরুল নওরোজ নামে একখানি মাসিকের সম্পাদক ছিলেন। দীনেশরঞ্জন এবং তিনি দুজনেই আমার কাছ থেকে গিরিজা মুখুজ্জের মারফৎ ব্যঙ্গ রচনা চেয়ে পাঠান। আমি দুটি লেখাই গিরিজা মুখুজ্জের হাতে দিয়েছিলাম। একটি বড়, একটি ছোট। দীনেশরঞ্জন এবং নজরুল কোথাও একত্র বসে ছিলেন, সেই সময় দুটি গল্প সেখানে পৌঁছয়। বড়টি দীনেশরঞ্জন দখল করলেন, নজরুলের ইচ্ছা ছিল সেটি নিতে। কিন্তু তা আর হয়নি। নওরোজে ছোট লেখাটা বেরিয়েছিল। সেটা যে কি তা এখন আর আমার মনে নেই। নওরোজও আমার কাছে নেই।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে আমি হ্যারিসন রোডে থাকতে কবির একখানা ফোটোগ্রাফ তুলি। গোল টেবিলের একটি প্রান্তে গালে হাত রেখে চিন্তারত অবস্থার ছবি। সেখানা নানাস্থানে ছাপা হয়েছে, দেখেছি। (তারপর ১৯৩৯-৪১-এর মধ্যে মাথায় সিল্কের টুপি-পরা তাঁর যাবতীয় ছবি আমারই তোলা।)

হ্যারিসন রোডে মেগাফোন রেকর্ডিং-এর স্টুডিওতে কয়েকবার গিয়েছি তাঁর কাছে। কেন, অথবা কার সঙ্গে, তা আর মনে পড়ে না।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন বছর আমি শনিবারের চিঠির সম্পাদনা করি—এই সময়ের মধ্যে আমার নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপলক্ষ ঘটে নি। সে সময়টা আমার পক্ষে ছিল একটি

দুঃসময়। তখন নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করছি, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদটা তখন বড় হয়ে উঠেছিল।

নজরুলের প্রাথমিক কাব্যশক্তি যখন অনুভব করতে থাকি ১৯২০ থেকে, তখনও ঠিক বুঝতে পারি নি সে শক্তির মূল কি। সামগ্রিকভাবে না দেখলে মোটের উপর একটা ধারণা আমার হয় না। সেই সমগ্রের অংশগুলির মধ্যে আপাত-পরস্পরবিরোধিতা থাকলেও তাদের ভিতরে একটা ঐক্য লুকিয়ে থাকে, তা একটু যত্ন করলে সবাই দেখতে পায়। এর জন্য আমাকে অনেক-দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হতে দেখলাম। কিন্তু তবু ওর ভিতরে কি একটা শক্তি ছিল যা প্রচণ্ড, যা মনকে উতলা করে তোলে, অথচ যাকে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। তাই ঐ কবিতা আমার মনকে অধিকার করে থাকলেও তার সম্পর্কে আমার ধারণা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু নজরুলের অন্যান্য কবিতা যখন একটুখানি ব্যাপকভাবে পড়বার সুযোগ পেলাম, তখন বিদ্রোহীর তাৎপর্য আমার কাছে স্পষ্ট হতে লাগল। অবশেষে ১৯৫৮ কিংবা ঐ সময়ে রেডিওতে সে কথা বলবার সুযোগ পেলাম প্রথম। কাজি সব্যসাচীর আবৃত্তির সঙ্গে চলল আমার ব্যাখ্যা। আর তা শুধু বিদ্রোহীর ব্যাখ্যা নয়, তা নজরুলকেই ব্যাখ্যা। কাব্যের দৃষ্টান্তগুলি সব্যসাচী আবৃত্তি করেছিল, আমিও কিছু করেছিলাম। বেতার জগতে তখন তা ছাপা হয়েছিল, কপি আমার কাছে নেই।

বিদ্রোহী কবিতাটি আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো মনে হয়, ওতে বাড়াবাড়ি আছে মনে হয়। কিন্তু তা মুক্তধারার বাড়াবাড়ি। গর্জনে, ফেনায়, শীকর-উৎক্ষেপণে, এবং প্রচণ্ড গতির উল্লাসে যখন সে ছুটে চলে, তখন তা বাড়া-বাড়ি বৈ কি। শাস্ত্র মেনে সে বাঁধা পথে চলে না, তাই তা বাড়াবাড়ি। তাই তা এলোমেলো।

কিন্তু বহুকালের জীর্ণশিকলে বাঁধা অর্থহীন অভ্যাসের দাসদের মনের ভিতরে হাজির হয়ে তাদের যথার্থ শক্তি বিষয়ে সচেতন করতে হলে, তাদের প্রত্যেককে আগে একথা কল্পনা করার ক্ষমতাকে জাগিয়ে দিতে হবে যে, তার শির উন্নত, এবং সে বিশ্বসংসারের যে-কোনো জিনিসের সমধর্মী হতে পারে, কোথাও তার কোনো বাধা নেই। অভ্যাসের দাসদের সমস্ত মনটাকে এভাবে টেনে গড়িয়ে ওলটপালট করে দিতে পারলে তবে তার চিন্তার গোঁড়ামি দূর হবে, আত্মশক্তি জাগবে, এবং শির যার চির উন্নত, তখন তার

কিসের ভয়? তখন হঠাৎ সে বুঝতে পারবে—

"আমি সহসা আমারে চিনেছি
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !!"

সর্ববন্ধনমুক্ত এই 'আমি', অবশ্যই কবির নিজের কথা, কিন্তু সে কথা উচ্চারণ মাত্র তা সবার কথা হয়ে ওঠে। এই মন্ত্র প্রথমে না জপলে তার সকল জীর্ণ অভ্যাস প্রচণ্ডভাবে নাড়া খাবে কিসে? জীবনের কোনো একটি মুহূর্তে এমনি করেই সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ানো যায়। নজরুলের জীবনে, মাত্র কুড়ি একুশ বছরের এক যুবকের জীবনে, এই ঘটনা বাংলা দেশের স্মরণীয় ঘটনা। আধমরারাও এই ঘা খেয়ে সচকিত হয়ে বলে উঠেছে, কৈ এমন তো আগে শুনি নি, এমন অনাড়ম্বর সহজ সত্য কথা? যুদ্ধের এমন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আর কোনো কবির আবির্ভাব ঘটে নি এদেশে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের রূপ দেখা গেল নজরুলের বিদ্রোহ-বাণীতে। একটি আত্মা জগতের সমস্ত জিনিসের সঙ্গে একাত্মকতা অনুভব করতে করতে ছুটে চলেছে, তার কোথাও বাধা নেই, মুক্তির উদ্দাম আনন্দে সে আজ দিশাহারা। কিন্তু তবু এই মহাবিদ্রোহীর এই ছুটে চলায় কি কোনো দিন ক্লান্তি আসবে না? কিন্তু সে কবে?—

"মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন ভাষায় আর কোনো বাঙালী কবি চ্যালেঞ্জ জানান নি। সমাজের উৎপীড়নে এমন শপথ আর কারো মুখে তো শুনি নি। Must fight to the finish মন্ত্রে দীক্ষিত আর কোনো বাঙালী কবি শত্রুপক্ষকে এমন আহ্বান জানান নি।

রাজনীতির ক্ষেত্রকে আমি বাদ দিচ্ছি। দেশকে মুক্ত করার জন্য বহু যুবক প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা মহৎ। তাঁরা এ আলোচনার বাইরে। নজরুলও প্রাণ দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। আমি বিস্মিত যে এক অখ্যাত তরুণ

কবি এমন বাণী নিয়ে বাংলা দেশে আবির্ভূত হলেন। সমাজে তখন নির্বীর্য কাপুরুষের রাজত্ব, চোখকান দুটি ডানায় ঢেকে পরম পাকা প্রবীণেরা চিত্রার্পিতবৎ ঝিমোচ্ছেন। তার মধ্যে সকল আরাম ও শান্তিভাঙা কবির আবির্ভাব অনেকে যে খুব ভাল চোখে দেখেন নি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ সবুজের আহ্বানে সমস্ত যুবশক্তিকে এই ভাষায় ডেকেছিলেন—

"ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা।"...

এ ডাকে—আমার মনে হয়—কবি রূপে একমাত্র নবীন নজরুল সাড়া দিয়েছিলেন। একমাত্র তিনিই সমাজ, জাতি ও দেশের মঙ্গল কামনায় এই যৌবনের দীক্ষা নিতে পেরেছিলেন।

হরি ঘোষের স্ট্রীটে যখন নজরুল বাস করতেন (১৯৩৯-৪০-৪১) সেই সময় আমি মাঝে মাঝে গিয়েছি তাঁর কাছে। আগেই বলেছি তাঁর মনটি ছিল একটি প্রশস্ত মুক্তাঙ্গন। তাঁরই আমন্ত্রণে একদিন কিরণ রায়ের সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম গান শুনতে। হারমোনিয়াম নিয়ে সেদিন প্রায় দু ঘণ্টা তিনি আমাদের গান শোনালেন। গানের কণ্ঠ, অনেকেই বলতেন মাধুর্যের বিচারে কিছু খাটো। এই মাধুর্য বস্তুটি কি তা আমি ভাল বুঝি না, কিন্তু নজরুল যখন একের পর এক গাইলেন, তখন সে বিচার করবার সুযোগ পেলাম কৈ? তিনি তাঁর গাওয়ায় এমন প্রাণ ঢেলে দিতে পারতেন যে, তখন সেই প্রাণই শ্রোতার প্রাণের সঙ্গে সহজে এসে যুক্ত হত। সব আর্টেরই মূল কথা তাই। প্রাণধর্মে বলিষ্ঠ হলে অন্য বিচার তখন কিছু পরিমাণ অবান্তর হয়ে পড়ে। আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফর্মের যাদুতে আটকা পড়ি, প্রাণের সন্ধান রাখি না, সেজন্য চিত্র সমালোচনাতেও খুঁটিনাটির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করি, কিন্তু চিত্রের বাণী সোজা মর্মে পৌঁছচ্ছে কি না সে দিকে প্রায় লক্ষ্যই থাকে না। আর্টের উপকরণের খুঁটিনাটি আর্ট নয়, সব মিলিয়ে তার একটা সামগ্রিক রূপ থাকে—যার উপরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সেই সামগ্রিক রূপ অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তবে খুঁটিনাটি অর্থে যদি বিশুদ্ধ আঙ্গিক হয়, তবে তা সমগ্রকে ব্যাহত না করলে চোখে পড়াই উচিত নয়। ফর্ম তো থাকবেই, না থাকলে যা অবশিষ্ট থাকে তার নাম ভূত। ভূত আর্টের বিষয় নয়, যদিও আর্টে স্থান পেতে হলে ভূতেরও একটা চেহারা দরকার হয়।

নজরুলের কাব্যকেও ঐ গান গাওয়ারই সগোত্র বলা চলে। তা প্রাণ-

প্রাচুর্যে উচ্ছল। সে প্রাণ কাব্যের ফর্মকে অনেক সময় ভেদ করে বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রায় কোনো কাব্যই নিজের সৌন্দর্যে নিজেই মত্ত হয়ে, আবেশবিহ্বল হয়ে, ঝিমিয়ে নেই। তার মধ্যে আন্তরিকতাটাই সবচেয়ে বড়, আর বড় তার মধ্যকার বাণী। তাকে অগ্রাহ্য করবার কোনো উপায় নেই। তা পাঠকমনকে আবিষ্ট করে না, চঞ্চল করে তোলে। উদ্বোধিত করে, উদ্বেল করে।

আমি বিশেষ করে তাঁর স্বদেশ ও সমাজবিষয়ক কাব্য বা গানের কথা বলছি যার সাহায্যে তিনি আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন।

আমি নজরুলের কাব্য বিষয়ে, তাঁর বাণী বিষয়ে, এবং কবিরূপে বাংলা-দেশে তাঁর আবির্ভাব বিষয়ে, যেটুকু ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেছি সেইটুকুই বলছি। আশা করি যাঁরা নজরুলকাব্যের অথরিটি তাঁরা আমার কথা অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ ভাষায় নতুন রূপ দিয়েছেন। তিনি নতুন নতুন সুর ছন্দ ও গীতের স্রষ্টা। মাধুর্য অথবা বলিষ্ঠতা, সবই তাঁর সংযত ভাষায় প্রকাশ। তিনি চেষ্টা করলেও চাবুক হাতে দাঁড়াতে পারতেন না। তাঁর একটিমাত্র কবিতা—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান'—এরই মধ্যে আছে জাতীয় মূঢ়তার বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত শক্তির আক্রমণ। সোজা আক্রমণ তিনি আর খুব বেশি করেন নি, মনের গভীর বেদনা অন্য নানা ভাবে প্রকাশ করেছেন। ব্যঙ্গের আঘাতও হেনেছেন, কিন্তু নজরুলের হাতে কাঁটা চাবুক—

জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাল জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ?
জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।
মনু ঋষি অণু সমান
বিপুল বিশ্বে যে বিধির,
বুঝলি না সেই বিধির বিধি
মনুর পায়েই নোয়াস শির ?
ওরে মূর্খ ওরে জড়
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
তোরা—চিনলিনে তা, চিনির বলদ
সার হল তাই শাস্ত্র বওয়া।

এই গান যেদিন (১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে, আজ ১৯৬৬ থেকে ঠিক ৩৭ বছর আগে) প্রথম শুনি মুকুন্দ দাসের মুখে তাঁর যাত্রার আসরে, সেদিন এর অব্যবহিত ফল প্রত্যক্ষ করেছিলাম শ্রোতাদের মুখে। এমন আক্রমণের মুখে ভেবেছিলাম গোঁড়ার দল রুষ্ট হবেন। কিন্তু হন নি, গাল হজম করে-ছিলেন বসে বসে, ওঠবার ক্ষমতা ছিল না, এতগুলি সত্য কথার সামনে স্বভাবসিদ্ধ বেয়াড়া তর্ক অথবা অন্য কোনো প্রতিবাদ মাথা তুলতে পারে নি, আর শুধু তাই নয়, অভ্যাস যাই থাক, এ সত্যকে তাঁরা মনে মনে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। কি সাংঘাতিক আক্রমণ—কি নিষ্ঠুর ভাষা—কিন্তু যদি শুধুমাত্র তাই হত তা হলে হয় তো দ্বন্দ্ব বেধে উঠত। কিন্তু গানের কথার মধ্যে যে আন্তরিকতা আর বেদনা লুকিয়ে ছিল, তাকে অতিক্রম করে কোন্ লাঠি মাথা তুলবে? এইখানেই কবির জয়। মনে মনে কি সে দিন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে—

এখন দেখিস ভারত জোড়া
পড়ে আছিস বাসি মড়া
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু
জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া।

অথবা—

তোদের জাত-ভগীরথ এনেছে জল
জাত-বিজাতের জুতো ধোয়া।

বাইশ-তেইশ বছরের তরুণ বাঙালীর এই সামান্য কথায় সমস্ত প্রবীণ জাতির মাথা নিচু হয়েছে আপন অন্তরের দীনতা-অক্ষমতা স্মরণ করে, এ কি সামান্য কথা?

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৪৮-তম জন্মতিথিতে আমি যুগান্তর সাময়িকীতে (২৫-৫-৪৭) একটুখানি স্মৃতিকথা লিখেছিলাম। তা থেকে সামান্য কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি—

"১৯৩৯ সনের একটি সন্ধ্যা। ১নং গারস্টিন প্লেসের একটা ঘরে কবি নজরুল আর আমি বসে ছিলাম। কথা হচ্ছিল নানা বিষয়ে। হঠাৎ নজরুলের চোখ দুটি বুজে গেল—কথা বলা বন্ধ হল।

"সম্মুখে চায়ের বাটি। কিন্তু সে দিকে মন দেবার মতো অবস্থা তাঁর নেই। আমি অপেক্ষা করে রইলাম। জানতাম এ রকম ওঁর মাঝে মাঝে হয়। চিন্তা করতে করতে আত্মসমাহিত হয়ে পড়েন। ওঁর

কাছে শুনেছিলাম কতবার যে, উনি এখন যোগসাধনায় ব্যস্ত আছেন। তার জন্য অবশ্য বিশেষ সময় বাঁধা আছে। বলেছেন, তাঁর যোগসাধনার সময় তিনি কি করছেন তা তাঁর জ্ঞান থাকে না। বলেছেন, শুধু মনে হয় আমি আকারে অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছি। আমার মাথা ছাত ভেদ করে আকাশে উঠে গেছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এই সাধনা……একদিন প্রশ্ন করেছিলাম কথায় কথায়। তিনি বলেছিলেন মনের শক্তি বাড়ানোর জন্য।

"এক দিন [১৯৪১ সম্ভবতঃ] ওঁর হরি ঘোষের স্ট্রীটের বাড়িতে আমি আর আমার বন্ধু কিরণ রায় ওঁর গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম সাধারণ শ্রোতা হিসাবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় তাঁর কিছুমাত্র ক্লান্তি ছিল না। আমরা তিন ঘন্টা ছিলাম, তার মধ্যে অন্তত ছ খানি গান শোনালেন।…

"তিনি গাওয়া শেষ করেছেন। পাশে হারমোনিয়াম পড়ে আছে। সম্মুখে চায়ের বাটি, কিন্তু ধ্যানমগ্ন মুদিতচক্ষু কবির বাইরের কোনো জ্ঞান নেই। প্রায় মিনিট পাঁচেক এই রকম কাটল। তার পর চোখ খুলে আমার দিকে তাঁর সেই বিশাল দুটি চোখ মেলে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জানেন আমি ভিতরে ভিতরে কি অনুভব করছি? আমি অনুভব করছি, একটা বিরাট কর্তব্য আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সে হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মিলন। এ মিলন ঘটাতে আর কেউ পারবে না। ভগবান আমাকে দিয়ে এই কাজ করাবেন। প্রতিদিন প্রতি-মুহূর্তে ভিতর থেকে এই তাগিদ আসছে। আসছে সময়—দেখবেন আপনারা। এ কাজ আমাকে করতেই হবে। আমার মধ্যে কি বিরাট শক্তি জাগবে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

আমার এখন মনে হয় মগজের যে ব্যাধি পরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার কিছু কিছু আভাস এই সময় থেকেই দেখা দিচ্ছিল। সে কথাটা আমার বিশেষ করে মনে হচ্ছে তাঁর একটি কথা থেকে। তিনি বলেছিলেন 'ধ্যান করতে করতে আমি অনেক বেড়ে যাই আকারে।' আমি মনে ভেবেছিলাম, আত্ম-সম্মোহন ভিন্ন আর কিছু না। নিজেকে সম্মোহিত করা সম্ভব যে-কোনো ভাবে। কিন্তু জেরা করাতেও যখন তিনি বললেন, 'কল্পনা নয়, সত্যিই আমার মাথা ছাতে গিয়ে ঠেকে—এবং ছাত পার হয়ে যায়,' তখন এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি। এ ব্যাখ্যা এখন নিউরোলজিস্ট দিতে পারবেন।

চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রার কথা শুনে মনে যে আশা জেগেছিল তা ক্রমে বিলীন হতে লাগল। তার পর শেষ খবর পেলাম নিউরো-সার্জন শ্রী অশোককুমার বাগচীর কাছ থেকে। সে তখন ভিয়েনাতে উচ্চতর শিক্ষালাভ করছে—ব্রেন-সার্জারি বিষয়ে। সে ১৯৫৩ সনের ৩০শে নবেম্বর তারিখে হ্যারিংগের স্ট্রাসে ১৫।৫, ভিয়েনা-৯ থেকে আমাকে লিখল—

"...আগামী বুধবার (২-১২-৫৩) সস্ত্রীক কবি নজরুল ইসলাম আসছেন চিকিৎসার জন্য। আমাকেই সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে। লণ্ডন থেকে নজরুল সমিতির সম্পাদক তার করে জানিয়েছেন। আরোগ্যের কোনো আশাই নেই। আমি ও আমার 'বস' উভয়েই ওঁর সমস্ত এক্স-রে ইত্যাদি দেখেছি। ওঁর মস্তিষ্কটি শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে। ভিয়েনার নিউরোলজিস্ট ফ্রয়েড শিষ্য প্রোফেসর হফ একবার ওঁকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন, সেই জন্যই ভারতে ফেরবার পথে কবিকে ভিয়েনা ঘুরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আশা-করি কুশলে আছেন।......"

পরবর্তী চিঠি ১২-১২-৫৩ তারিখে লেখা ঐ ঠিকানা থেকেই। অশোক লিখছে—"আপনার ৫।১২।৫৩ তারিখের চিঠিটা পেয়েছি। কবি নজরুল এখানে এসেছেন। আরো অনেক প্রকার পরীক্ষা ওঁর উপরে করা হয়েছে। রোগ সারবার আশা নেই। আপনার কথামত একটি ছোট লেখা [নজরুল সম্পর্কে] পাঠালাম, হয়ত আপনার মনঃপূত হবে।"...

এর সঙ্গে ঐ একই তারিখে লেখা যে রচনাটি এলো, তার নাম "ভিয়েনায় নজরুল"। প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করি—(যুগান্তর সাময়িকী, ২৭-১২-৫৩)—

> "লণ্ডনে প্রায় ৬ মাস থাকবার পর গত ৭ই ডিসেম্বর কবিবর নজরুল ইসলাম এবং তদীয় পত্নী শ্রীমতী প্রমীলা নজরুল ভিয়েনায় এসেছেন। লণ্ডনের ডঃ রাসেল ব্রেন, ডঃ উইলিয়াম সারগ্যাণ্ট এবং ম্যাককিসক প্রমুখ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কবিকে একাধিকবার পরীক্ষা করেছেন। প্রবীণ চিকিৎসক ডঃ রাসেল্ ব্রেনের মতে কবির মস্তিষ্ক বিকৃতি দুরারোগ্য। রোগীর রোগ সম্বন্ধেও লণ্ডনের দুইদল বিশেষজ্ঞের মধ্যে প্রবল মতভেদ হয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে রোগী ইনভলুশনাল সাইকোসিস রোগে ভুগছেন, অপর দল কলকাতার বিশেষ-জ্ঞদের ডায়াগ্‌নোসিসকেই সমর্থন করেছেন। তবে উভয় দলের বিশেষ-

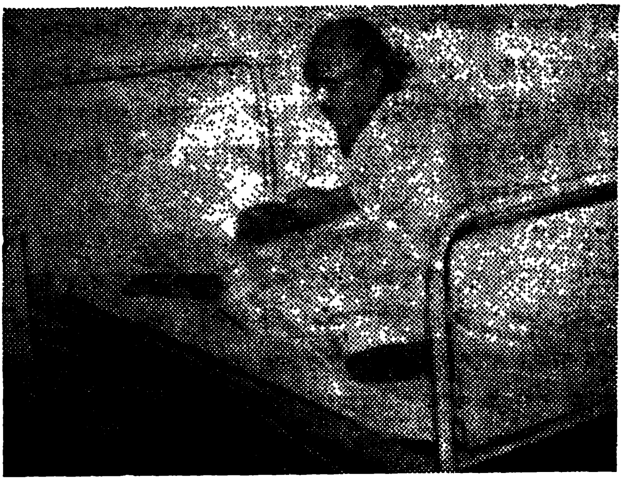
জ্জদের মতেই; প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যন্ত অপরিমিত ও অসম্পূর্ণ হয়েছে। ...এক্স-রে পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগ অর্থাৎ ফ্রন্টাল লোবদ্বয় সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে।" ...ইত্যাদি।

প্রবন্ধে ব্যাধির বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু এখন আর তা জেনে কিছু লাভ নেই আমাদের। এই অসুখের অধ্যায় এবং সমস্ত জীবন তার জের টেনে যাওয়া, কবির পুত্রদের পক্ষে যেমন বেদনার, সমস্ত বাঙালীর পক্ষে তেমনি বেদনার।

তিনি আমাকে বলেছিলেন তাঁর ক্রমে এ কথা মনে হচ্ছে তাঁর জীবনের ব্রত হবে সাম্প্রদায়িক মিলন ঘটানো। এ কথা তখনও বিশ্বাস হয়েছিল, আজও বিশ্বাস করি, তিনি যে আগুন নিয়ে প্রথম আবির্ভূ'ত হয়েছিলেন কবিরূপে, সংস্কারকরূপে, সে আগুনের তেজ শক্ত ধাতু গলানোর তেজ, তা ওয়েল্‌ডিং কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যিনি কবিরূপে প্রথম আবির্ভাবেই আকাশে মাথা তুলে সগর্বে বলতে পারেন "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!"—তাঁর ভিতরে কোন্ প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস তাঁর সমস্ত দেশ-প্রেমের প্রেরণা দিয়েছে তা যদি সমসাময়িক কাল না বুঝে থাকে তবে সে দুর্ভাগ্য কবির নয়। দেশের সকল নুয়ে-পড়া মাথাকে খাড়া করে ধরে রাখবার এ আহ্বান বিস্ময়ে অভিভূত করে। এ কখনো ধূমকেতুর নীরব আবির্ভাব নয়, এ জ্বলন্ত উল্কার সবেগ গতি। জ্বলতে জ্বলতে, নিজেকে নিঃশেষ করতে করতে, যদি সে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় এসে দেশের মাটিকে আঘাত করে, তবু সে আঘাত বৃথা যাবে না, যেমন করে হোক আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচাতে হবে।

নজরুল নানা উপলক্ষে নানা কবিতা ও গান লিখেছেন, তার মধ্যে ব্যক্তিগত অনেক উপলক্ষ আছে, ফরমায়েসী গান আছে কয়েক হাজার। ব্যক্তিগত জীবন নানাভাবেই তো 'কন্‌ডিশন্‌ড' হয়, শত রকম কারণের যোগাযোগে জীবনের ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং অধিকাংশ সময়েই তার উপর নিজের কোনো হাত থাকে না। যে নজরুল সমস্ত বাংলাদেশে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে নতুন শক্তি এবং নব চেতনা সঞ্চার করতে এসেছিলেন জীবনের প্রথম প্রভাতে কবিরূপে প্রথম জেগে উঠে, সেই নজরুলকে খাওয়া পবার কথা ভাবতে হয়েছে নিজেই। এতবড় প্রতিভাকে গ্রহণ করার জন্য দেশ তৈরী ছিল না। তাই তাঁকে নানাভাবে ছোট করে দেখে এবং দেখিয়ে,

ছোট মানুষেরা নিজেদের সগোত্র ভেবে তৃপ্ত হয়েছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আমাদের দেশের মতো অনগ্রসর দেশ বড় প্রতিভাকে সহজে সহ্য করতে পারে না। পরবর্তী যুগেও নজরুলকে খাটো করে দেখার চেষ্টা হয়েছে। শুনেছি ঢাকার বেতার কেন্দ্রে পাকিস্তানের শাসকদের নির্দেশে নজরুলের সাম্প্রদায়িক চেতনার ঊর্ধ্বে ওঠা ধর্মকে মেনে নেওয়ায় বাধা উপস্থিত হয়েছে! তাই তাকে ছাঁটাই করে, তাঁর গান থেকে ভারতীয় নিজস্ব প্রতীকধর্মী ভাষা বা উপমাগুলি বাদ দিয়ে তাকে যথাসম্ভব সাম্প্রদায়িক ভাষার গানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার বাঙালীরা অসহায়ভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।



ভিয়েনার হাসপাতালে নজরুল

ফোটো অশোক বাগচী (১৯৫৩)

নজরুলের মতো অসাধারণ প্রতিভাধর সংস্কারকের পক্ষে দুটি অন্নের জন্য যেমন কলের গানের দোকান খোলা (১৯৩৪) ভাগ্যের পরিহাস, তেমনি হিন্দু মুসলমান মিলনের এতবড় এক জীবনপণ যোদ্ধাকে তাঁর ধর্ম থেকেই চ্যুত করে, তাঁর ভিতর থেকেই 'মুসলমান' অংশটি বাছাই করে তাকে খাতির করা, এবং তাকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া, কবির পক্ষে ভাগ্যের মস্ত বড় একটা পরিহাস। খুবই সুখের বিষয় যে নজরুলের কাব্য থেকে বাঙালী হিন্দুরা কিন্তু তাঁর কাব্যের 'মুসলমান অংশ' বাদ দিয়ে 'হিন্দু অংশ' আলাদা করার চেষ্টা করে নি। এই একটি দিকে বাঙালী হিন্দুরা অনেকটা উদার বলা

যেতে পারে। যিনি লিখলেন—"কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!" যিনি বজ্রগম্ভীর সুরে গাইলেন—

"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া
জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী আজ দেখিব তোমার
মাতৃমুক্তি পণ!
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?'
ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোর মার।"

সেই নজরুল কতখানি 'হিন্দু' কবি, আর কতখানি 'মুসলমান' কবি, এ নিয়ে আশ্চর্য তর্ক। যে নজরুল হিন্দু মুসলমানরূপ বিভেদের দুই দিককে সংযোজিত করে শুধু মনুষ্যত্বের অথবা বাঙালীত্বের পরিচয়ে দুদিকের মিলন-সেতু রচনা করে বুক ফুলিয়ে কলোসাসের মতো দাঁড়ালেন তাঁকে নিয়ে এ কি তামাসা?

গোঁড়ামির দিক দিয়ে এ পক্ষও কিছুমাত্র প্রশংসার দাবি রাখে না, কিন্তু তবু হিন্দুরা সাহিত্যে সঙ্গীতে ভাস্কর্যে চিত্রশিল্পে গোঁড়ামি প্রায় সম্পূর্ণ পরিহার করেছে বলা যায়। এর কোনো বিভাগেই মুসলমানের হাত আছে বলে দূরে সরিয়ে রাখে না, বরং তাকে শ্রদ্ধা করে, স্বাগতম্ জানায়। এ সব কথা অবশ্য সবারই জানা। আমার বিশ্বাস পূর্ব বঙ্গের শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের সম্পর্কেও এ কথা খাটে। সাধারণ মানুষ অবশ্য দুদেশেই সমান ভালমানুষ।

এদিকের কথা যা বললাম, তা মন্দের ভাল অবশ্যই। কিন্তু সাধারণ হিন্দু-জীবনের আর একটি দিক আছে যেখানে কয়েক হাজার বছরের সংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। নজরুলকে স্মরণ করতে গিয়ে সে কথাগুলিও ভেবে দেখা দরকার।

মুসলমান সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে। গোঁড়াদের পক্ষে এ ভারতবর্ষ যে তাঁদেরও দেশ, এর প্রাচীন গৌরব যে তাঁদেরও নিজস্ব গৌরব, এ দেশের যাবতীয় প্রাচীন কীর্তি যে তাঁদেরও প্রাচীন কীর্তি, এ কথা ভাবায় বাধা উপস্থিত হয়। অথচ নজরুলের চিন্তাধারা কত সহজ। তাঁর "আমার কৈফিয়ৎ" নামক কবিতাটি তাঁর মনের সরলতা ও স্বীকৃতির এক আশ্চর্য

ছবি। প্রথমে একটুখানি "ক্ষণিকা" কাব্যের মেজাজে হাল্কা সুরে তাঁর বিরুদ্ধে যে যা বলেছে, সে সব নিয়ে ভারী সুন্দর রসিকতা করতে করতে এগিয়ে যখন বলেন—

"বন্ধু! তুমি তো দেখেছ আমায়
আমার মনের মন্দিরে,
হাড় কালি হল শাসাতে নারিনু
তবু পোড়ামন-বন্দীরে।
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল
মেরে মেরে তারে করিনু বিকল,
তবু কথা যদি শুনে সে পাগল
মানিল না রবি-গান্ধীরে!
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে
নিশার আঁধারে বন চিরে।"

আশ্চর্য বেদনাভরা স্বীকতি। তার পর বলছেন সমালোচকেরা বোঝে না যে, কবি চারণের বেশে গান গেয়ে দেশে দেশে ফিরছে। সে যে মিথ্যা দেশপ্রেমিক সেজে নিজের দিকটা গুছিয়ে নিতে পারল না। স্বরাজের বক্তৃতা শুনলেই সবাই ভাবে, সব দুঃখ ঘুচবে। তাই ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করে তাদের মুখের অন্ন কেড়ে এনে তাই দিয়ে চাঁদা দেয়। ক্রন্দনরত সন্তানদের মা বোঝাতে চেষ্টা করে, ভয় কি, স্বরাজ এলো বলে। তার পর কবির নিজের মিথ্যা ছলনা দূর হয়, তিনি নিজের কানেই নিজের কথা ধ্বনিত করে ওঠেন—

"ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
চায় দুটো ভাত একটু নুন,
বেলা বয়ে যায়, খায়নিক বাছা
কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়।
কেঁদে বলি ওগো ভগবান তুমি
আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে নাক তাহাদের গালে
যারা খায় এই শিশুর খুন?"

কবির সুরে আর রসিকতার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই—

"বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না
বড় বিষ জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি
তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে নাক
মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও,
বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।"

সব শেষে—

"প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-
লেখায় তাদের সর্বনাশ !"

যেটুকু বলেছি তার মধ্যে নজরুলের হৃদয় কার জন্য কেঁদেছে তা নিশ্চয় বলা হল। তেত্রিশ কোটির জন্য! সমগ্র দেশের জন্য। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এ রকম কল্পনা করাও তো কবিকে অস্বীকার করা। তাঁর এই কথাটি তাঁর সকল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পদ্মার এপার ওপার দুপারের সকল বাঙালীই আশা করি স্মরণ করবেন। ৯-৬-৬৬

সজনীকান্ত দাস

১৯০০-১৯৬২

সজনীকান্তকে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বলতেন, সজনী নিপাতনে সিদ্ধ। এই ব্যাকরণের ভাষাটি তিনি খুব প্রশংসাযোগ্যভাবেই সজনীকান্তের বিশেষণরূপে ব্যবহার করেছিলেন। নিপাতনে সিদ্ধ অর্থাৎ অন্যের নিপাতকার্যে সিদ্ধ। অবশ্য সজনীকান্তের এই পরিচয়ই সাধারণ পাঠকের জানা, এবং এর জন্য দায়ী সজনীকান্ত নিজেই। কারণ তিনি যে কবিও, একথাটা তিনি নিজেই প্রায় চেপে রেখেছেন। এর কারণ আমি যা অনুমান করি তা হচ্ছে, তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং আক্রমণের ভাষা এমনই উপভোগ্য ছিল এবং তার উপর পাঠকদের দাবিও এমন প্রবল ছিল যে, তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং নিপাতন ব্যাপারটিকে কর্তব্য হিসাবে নিতে গিয়ে এতেই অধিকাংশ সময় মেতে থেকেছেন। অথচ আক্রমণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আক্রান্তের সংস্কার সাধন, তা যতটা হোক না হোক, কৌতুক সৃষ্টিটা তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। এবং যে-ব্যঙ্গ উচ্চ সাহিত্য কখনো হবে না, সেই জাতীয় ব্যঙ্গ বেশি লিখেছেন পাঠকদের প্রতি দুর্বলতাবশত। অথচ যা তাঁর প্রাণের জিনিস, কাব্যসৃষ্টি, তা শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রায় নীরব সাধনার গণ্ডিতে আটকা পড়ে গেছে। তার আরো হয় তো কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেই কাব্যের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের এবং কাব্যের বিষয়বস্তুর বদল ঘটতে আরম্ভ করেছিল, যদিও কাব্য হিসাবে এই নবযুগের নতুন পরীক্ষা কতখানি সফল হয়েছে সেকথা সমালোচকেরা আলোচনা করবেন। কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছন্দে লিখে তার মধ্যে মাঝে মাঝে স্বেচ্ছায় ছন্দঃপতন ঘটানোও এই আঙ্গিকের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে এবং যেহেতু এলিয়ট বলেছিলেন—"in the poet's experience there was no reason why the smell of cooking bacon (or was it steak), the reading of Dante and the experience of falling in love should not coexist?" (ফ্রান্সিস স্কার্ফ, 'দি লিবারেশন অভ পোয়েট্রি'), সেই হেতু বাংলাদেশের অনেক আধুনিক কবিও কাব্যকে পূর্ব-সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি দিতে উঠে পড়ে লাগলেন। এবং কাব্যকে নতুন নতুন শব্দ ও ভাবের জটিলতার মধ্যে এনে 'মুক্তি' দিলেন।

সুতরাং এমন যুগে, ভাবের ইউনিটিযুক্ত কাব্য এবং কাব্যের আবেদন যা সরল এবং অব্যবহিতভাবে মর্মে গিয়ে পৌঁছয়, তা হল বাতিল। এলিয়ট বলেছেন, 'Genuine poetry can communicate before it is understood' কিন্তু একই সঙ্গে বুঝতে পারা এবং মর্মে গ্রহণ করতে পারাও যে কবিতা, এ কথাটাই বা অস্বীকার করা যাবে কি করে? কবিতার কথা সহজে বোঝা যায়, এটি কি কাব্যের ক্রটি? দুর্বোধ্যতার ম্যানারিজম কাব্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি? যাই হোক এর একটা চমক আছে এবং হয় তো ঝাঁজও আছে। এবং সেও কম কথা নয়।

কিন্তু আমাদের পূর্ব যুগের পাঠকদের হল কিছু অসুবিধা। আমরা নতুনকে স্বাগতম্ জানালাম, এবং এই নতুন কাব্যে, অর্থাৎ এই "পোয়েটিক শর্টহ্যাণ্ড"-এ বিস্ময় বোধও করলাম, কিন্তু ভালবাসলাম আমাদের যুগের কাব্যকেই, সমস্ত হৃদয় দিয়ে। তাই আধুনিক যুগ যাঁদের কবি বলে স্বীকার করে না, অথচ যাঁরা কবি, তাঁদেরই বা ভুলি কি করে? তা ছাড়া এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মাত্র বলব। সেটি একটি প্রশ্ন, যার উত্তর আজও পাই নি। সে হচ্ছে 'গান' যেমন সুরে-তালে গাওয়ার শর্তে গান, কাব্যও তেমনি ছন্দের মাত্রার দোলাযুক্ত হলেই তবে তা কাব্য—মিল থাক বা না থাক। গান যেমন সুর তাল বাদ দিলে আর গান থাকে না, গদ্য-গান নামক কোনো বস্তু হয় না, কিংবা এলোমেলো ছন্দে গান হয় না, বিশিষ্ট রীতি মান্য করে গাওয়ার শর্তেই গান হয়, কাব্যের বেলায় তার ব্যাক্তক্রম হল কি করে? গানের কোনো নবযুগেও কি সুর বাদ চলে যাবে? তালমাত্রা বাদ চলে যাবে?

কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক, মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। সজনীকান্তের কাব্য রচনার শক্তিতে কারো সন্দেহ করবার কারণ নেই, কিন্তু কাব্যকে জীবনে প্রধান করে তাইতে ডুবে থাকার মতো মনোভাব ও অবস্থা সজনীকান্তের ছিল না। গবেষণা কাজ ও অন্যান্য বাইরের নানা কাজে তিনি নিজেকে অতিমাত্রায় ছড়িয়ে ফেলেছিলেন। নিজের প্রতি দুর্বলতা একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল, সেজন্য নিজের ধর্ম বজায় রাখা সম্ভব হয় নি তাঁর। বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর কোনো রকম ঔদাসীন্য ছিল না এবং সব দিক থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবল ঝোঁক তাঁকে বার বার পথভ্রষ্ট করেছে। যেমন, আমি মনে করি "কংগ্রেস সাহিত্য" নামক এক অদ্ভুত প্রচারসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ দেওয়া উচিত হয় নি। এটি



সজনীকান্ত দাস

ফোটো পরিমল গোস্বামী ১৯৪০

সাহিত্য নয়। এক দলে যোগ দিয়ে অন্য দলকে আক্রমণ করা অবশ্য দিন-কতক বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যিকের একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সৃজনমূলক রচনাতেও এই দলাদলির কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে, সজনীকান্ত দলের উর্ধ্বে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ দেখা যাবে তাঁর 'মারীচ' নামক গল্পে। (১৩৬৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা শনিবারের চিঠি দ্রষ্টব্য)। মোহমুক্তি অনেকেরই ঘটেছিল অতঃপর।

নিপাতনে সিদ্ধ সজনীকান্ত, আসলে কাউকে সত্যই নিপাত করেন নি। ব্যঙ্গ-সাহিত্য রচনার পরিমাণ তাঁর খুব বেশি নয়। কিন্তু কৌতুক সাহিত্য অজস্র। এবং শনিবারের চিঠিতে যে সংবাদ-সাহিত্য রচনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অনেকখানিই সংবাদ এবং তারও বেশি কৌতুক। নিপাতনের জন্য আক্রমণও আছে, কিন্তু তার পরিমাণ সামান্য, কারণ ব্যক্তি-গত কোনো স্থায়ী বিদ্বেষ তাঁর ছিল না বিপক্ষের প্রতি। আসলে কোনো বিষয়ে মতিস্থির ছিল না, যাঁর নিপাতন মানসে কলম ধরেছেন, পরক্ষণেই তাঁর সঙ্গে গলায় গলায়। আর একটা ব্যাপার আমি খুব ভাল করেই জানি এবং তাতে বিস্ময় বোধ করেছি—তাঁকে যে যেভাবেই গাল দিক, তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকতে পারতেন। বিরুদ্ধ আক্রমণে কোনো রকম চঞ্চলতার লেশমাত্র দেখি নি তাঁর মধ্যে।

সংবাদ-সাহিত্যে কৌতুকটাই প্রধান। আমি একটি সংখ্যা থেকে (১৯৩৭, ফেব্রুয়ারি) দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

> সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা বর্তমানে কে পরিচালনা করিতেছেন জানি না, বর্তমান সংখ্যা 'দেশ' পড়িয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহার রীতিমত রসবোধ আছে। না থাকিলে, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত বসন্তের ঠিক পরেই উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত মৃতের মুণ্ডকঙ্কাল রক্ষা নামক সচিত্র প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট করিতে পারিতেন না। একটি নিঃসন্দেহে অপরটির পরিপূরক।...বিজয়বাবুর প্রবন্ধটি...আংশিক উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে—যথা..."আজ পল্লীর আকাশ ভরে উঠেছে বিচিত্র গানের ঝঙ্কারে। আনন্দে... টুনটুনির সঙ্গীতের আর বিরাম নেই। হায়! এখানে শুধু ট্রামের ঘর্ঘর, বাসের হুঙ্কার আর মানুষের কলরব। আজ বনের পথে পথে প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায়... ক্লান্তি আসে মনে, ভাল লাগে না টেবিল আর চেয়ার, সোফা আর পালঙ্ক, রেডিও আর গ্রামোফোন।"

"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই শহরের উপর নিতান্তই চটিয়াছেন দেখিতেছি, কিন্তু আমরা গরীবেরা কোন রকমে এখানে ছাপাখানার প্রুফ দেখিয়া দিন গুজরান করিতেছি, পল্লীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি আমাদের প্রাণে দাগা দেন কেন? কোকিলের মত আমের মুকুল খাইয়া, প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়াইলে আমাদের চলে কই? ভাগ্যিস তিনি রেডিও গ্রামোফোনের উপর দিয়াই গিয়াছেন—রোটারি, ডবল ক্রাউন মেসিনের উল্লেখ করিলে আমরা তো মারা যাইতাম!...ভবিষ্যতে বিজয়-বাবু যদি দয়া করিয়া এমন সকল কান্না-জাগানো প্রবন্ধ না লিখিয়া সেই অবসরে দুই চারি আনা খরচ করিয়া বেলঘরে অথবা মাঝেরহাটের টিকিট কাটিয়া কোকিলের অথবা টুনটুনির সঙ্গীত শুনিয়া আসেন তাহা হইলে আমরা এই শহরের ধূলিমলিন আবহাওয়ার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব।......"

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি—কবিতা মাসিকে প্রকাশিত এক কবিতায় কবি এই হতভাগ্য শহরকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

হে সহর হে ধূসর সহর
কালিঘাটের ব্রিজের উপরে
  কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি?

"ধূসর শহরের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকিলে বলিত—

শুনতে পাই বন্ধু,
কিন্তু কালীঘাট ব্রিজের ওপর নয়,
মাঝেরহাট ব্রিজের ওপর
লম্পটের গুষ্টির পদধ্বনি শুনতে পাই।"

এই জাতীয় টিপ্পনি, এ কি ব্যঙ্গ? ব্যঙ্গ বলতে যে কঠোর আক্রমণ বোঝায় এর মধ্যে তা নেই। যে পড়বে সেই কৌতুক অনুভব করবে এবং হাসবে। আমার নিজের বিশ্বাস পাতনে সিদ্ধের চেয়েও সজনীকান্ত মাতনে বেশি সিদ্ধ এবং এ জাতীয় সমালোচনায় মাঝে মাঝে সুরেশ সমাজপতির সুরটিও যেন কিছু বেজে ওঠে। কৌতুক-মত্ততার দৃষ্টান্ত।

একই সঙ্গে গবেষণার কাজ, সরস সাহিত্য রচনা এবং আত্মগতভাবে কাব্যের সেবা করা—লেখকরূপে সজনীকান্ত মোটামুটি এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেন। সরস সাহিত্য, যাকে স্যাটায়ার বলা যায় না, অথচ যা

শুদ্ধ হিউমারও নয়, সে রকম রচনা অনেক লিখেছেন সজনীকান্ত। তাঁর রচনার এই বিভাগের আর একটি উপবিভাগ আছে, সেটি, যাকে বলে দুষ্টুমি বুদ্ধি, তাই থেকে সেগুলি লেখা। এই দুষ্টুমি বুদ্ধিতে আক্রান্ত হলে সজনীকান্তের প্রতিভা খোলে ভাল। সংবাদসাহিত্যে এর অনেক প্রমাণ আছে। দুটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি এবং এর চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে 'মাইকেল-বধ' কাব্য উপলক্ষে লেখা অনুকৃতিগুলিতে। এতে ছন্দের এবং কবিদের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি ও মেজাজের সবখানি আত্মস্থ করার যে অনুপম দৃষ্টান্ত আছে, উইট-এর ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় এর জুড়ি নেই। মাইকেল-বধ কাব্য 'ভাব ও ছন্দ' নামক বইয়ের শেষাংশ এবং এর সমস্ত রচনাই ঐ দুষ্টুমি বুদ্ধিজাত।

কিন্তু এই রচনা সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে সজনীকান্তের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি বি-এসসি পাস, কলেজী শিক্ষার দিক থেকে। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কাব্যের প্রতি ঝোঁকবশত রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কাব্য খাতায় নকল করে নিয়ে পড়ে পড়ে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের অপেক্ষা সাহিত্যের দিকে ছিল তাঁর প্রাণের টান। বহু বিষয় পড়া থাকায় (কলেজী শিক্ষার বাইরে) নিজের ক্ষমতার প্রতি একটা শ্রদ্ধা জেগেছে। বিচারের ক্ষমতা জন্মেছে। কাব্য পাঠ করে এবং লিখে ছন্দের উপর দখল এসেছে। নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উন্মেষে এই জাতীয় স-নিষ্ঠ সাহিত্য অনুশীলন সাহায্য করেছে। তারপর ব্রজেন্দ্রনাথের সহযোগে যখন গবেষণা কাজে হাত দিলেন, তখন আরও অনেক বেশি ক্ষমতা নিজের আয়ত্তে এসে গেল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক এবং সৃজনের দিক—এই দু' দিকেরই বিষয়ে কথা বলবার অধিকার আরও বাড়ল।

কিন্তু ঐ যে কাব্যের প্রতি ঝোঁক এবং নানা ছন্দের পরীক্ষা করে হাত পাকানো, তার ফল যে শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যাপক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে এমন কল্পনা সজনীকান্তের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। এর প্রথম প্রেরণা যোগান শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং এর একটা পূর্ব ইতিহাস আছে যা মনোহর। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে এর আরম্ভ। তখন মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভের কয়েকটি লাইন আধুনিক ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছিল। তার পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'উদয়ন' নামক মাসিকে মাইকেলের ঐ কয়েক ছত্র চলতি ছন্দে রূপান্তরিত করে বলেছিলেন, এভাবে

লিখলে মাইকেল অবশ্যই অপাঠ্য হতেন না। বরং সহজপাঠ্য হতেন। ঠিক কি কথাগুলি বলেছিলেন, তা এখন আমার মনে নেই। এই রচনা পড়ে (১৯৩৪) মোহিতলাল মজুমদার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং তিনি কোনো বিষয়ে উত্তেজিত হলে সজনীকান্তের মনেও তার কিছু সঞ্চারিত করতেন। তাই ১৯২৯-এর রূপান্তর যা ছিল অন্য উদ্দেশ্যে, ১৯৩৪-এর রূপান্তর ঘটল রবীন্দ্রনাথের সেই ছত্রগুলিকে ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হল
বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে শেষে
গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই।
কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার
সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন্ বীরকে বরণ করে
পাঠিয়ে দিলেন রণে,
রঘুকুলের শত্রু যিনি,
রক্ষকুলের নিধি ?

রবীন্দ্রনাথের এই রূপান্তিরত ছত্র গুলিকে ব্যঙ্গ করে সজনীকান্ত লিখলেন—

লড়াই যখন ফতে হল
বীরবাহু বীর যখন
কেরামতি দেখিয়ে অনেক
তুলল পটল, আহা,
জোয়ান বয়স না ফুরতেই।
কও দুর্গ্গার বেটী,
গুড়ের মতন জবান তোমার,
সেপাই-মোড়ল ক'রে
কোন্ বীরকে করতে লড়াই
পাঠিয়ে দিল তখন

রঘুয়াদের সেই দুশমন,
মানুষ-খেকোর রাজা।

এ তো অনেক দিনের কথা। এ পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল তখনই। আরম্ভে যার উদ্দেশ্য ছিল ব্যঙ্গ, পনেরো-ষোল বছর পরে তার পরিণতি হয় এক বিশেষ মূল্যবান সাহিত্যে। এ সাহিত্যে, বাংলা দেশের একেবারে আদি যুগ থেকে আরম্ভ করে সর্বাধুনিক যুগ পর্যন্ত কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও ভাবের যে ক্রমোন্মেষ ঘটেছে, সজনীকান্ত নিজে সেই সব যুগের সমস্ত ভাষা, ভঙ্গি, আঙ্গিক এবং ছন্দ সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে মাইকেল-বধ কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বভাবরসিক এবং ছন্দোরসিক নলিনীকান্ত সরকারের সহযোগিতা পেয়েছেন, বাংলার চারটি বিভিন্ন আঙ্গিকের কাব্যে এবং সংস্কৃতের প্রধান ছন্দগুলির প্রকাশে। এই রচনাগুলির নাম হল মাইকেল-বধ কাব্য। কবি শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর নিজের একটি কবিতার ভঙ্গিতে মাইকেলের ঐ ছত্রগুলির রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছেন এর মধ্যে।

সজনীকান্তের এটি এক অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় এবং এই 'মাইকেল-বধ' কাব্য গ্রন্থখানি হয়ে উঠেছে বাংলা কাব্যসাহিত্যের দর্পণ স্বরূপ, এত অল্প পরিসরে আচম্বিত কৌতুকের আঘাতে জর্জরিত হতে হতে চর্যাপদ থেকে সমর সেন পর্যন্ত প্রায় শত বৎসরের মধ্যকার বিভিন্ন যুগ এবং যুগের কবি প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারা একটি আশাতীত ব্যাপার।

কয়েকটির দৃষ্টান্ত না দিলে ঠিক বোঝানো যাবে না। এর মধ্যে কয়েকটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি ও আর কয়েকটির আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আংশিক উদ্ধৃতিও সবগুলির নয়। সংস্কৃত ছন্দের রূপান্তর কয়েকটি নলিনীকান্ত সরকার সম্পর্কিত রচনায় ইতিপূর্বে দিয়েছি।

চর্যাপদ :

বিরবাহু বীরা জখন মঈলা
রাবণ-মণ্ডল সঅল ভাগীলা ॥
অমিতা-বঅনি দেই পুছমো তোরেঁ
পুণু দলবই করি আহব ঘোরেঁ ॥...

চণ্ডীদাস :

সই কি বা সে কঠিন পরিণাম
নিদারুণ রণমাঝে :

অকালে মরিল গো,
বীরবাহু গেল বীর ধাম ॥
না জানিয়ে কত মধু
ও বীণায় আছে গো
বীণাপাণি শুনাও মধুর।
সেনার নায়ক করি
ভেজিল কাহারে গো
রণথলে রাঘবারি শূর ॥...

বিদ্যাপতি :

ভারতি, বহুত মিনতি করি তোয়।
অমিয় বচন তুয়া
শুনইতে কাতর
দয়া জানি শুনাওবি মোয় ॥...

কৃত্তিবাস, রমাই পণ্ডিত, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি। তারপর ভবানীদাস আব্দুল সুকুর প্রভৃতি। এই শেষের কবিদের অনুকরণে (মাণিক, ময়নামতী গোপীচাঁদ ইত্যাদি :)

না যাইও না যাইও বীর
না যাইও লোকান্তর
কার লাগিয়ে বান্ধিলাম পুত্র
শীতল মন্দির ঘর ॥...

এ সবই আংশিক উদ্ধৃতি। এরপর আছে মীরা, দাদু, কবীর। তারপর কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। একটুখানি নমুনা দিই—

সম্মুখ সমরে পড়ে
বীরবাহু বীরবরে
হা কান্দ-কান্দনে সবে কান্দে।
দুঃখ কর অবধান
দুঃখ কর অবধান
রাবণ উঠিয়া বুক বান্ধে ॥...

এরপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম দাস, সৈয়েদ আলাওয়াল শাহ মরহুম, মানো-এল-দা-আসসুম্পসাউঁ, ভারতচন্দ্র (বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী) হরু ঠাকুর, রাম বসু, গোজলা গুঁই প্রভৃতি। তারপর রামনিধি গুপ্ত (টপ্পা)।

রামনিধি গুপ্ত :

তারে ভুলিব কেমনে।
অকালে মরিল বীরবাহু
সে কাল রণে ॥...

রামমোহন রায় :

মনে কর শেষের সে
দিন ভয়ঙ্কর
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু
বীরবাহু নিরুত্তর ॥...

এই জাতীয় উদ্ধৃতি শুধু একটুখানি সুর ধরিয়ে দেওয়া, এতে সমগ্রের সৌন্দর্য কিছুই প্রকাশ হল না। তবু স্থানাভাবে সবগুলিরও অংশ উদ্ধৃত করা অসম্ভব। আরও অল্প কয়েকটি মাত্র নমুনা দিচ্ছি। ভাটিয়াল সুরের একটি এইভাবে আরম্ভ :

ওগো বন্ধু আমার মন কেন
উদাসী হইতে চায়।
এগো ডাক শোনে না বীরবাহু গো
সাত সাগরে চইলা যায় ॥...

তারপর ঈশ্বর গুপ্ত :

কোথা রইলে মা,
ভিক্টোরিয়া মা গো মা
কাঁদে তোমার প্রজা খাস।।
তোমার ভারতকন্যার তলায় লঙ্কা
তার ঘটে কি সর্বনাশ।...

মধুসূদন দত্তের নিজস্ব ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দেরও অনুকরণ আছে এর পর। একটিতে আছে—দেখো মা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে, চটুল ছন্দের সাধ, ঘটাবে কি পরমাদ—বধিতে চাহিছে প্রাণ কাবা মেঘনাদ-বধ।"......

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেও বেশ জমেছে—

আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি
চেয়ে দেখ কাঁদে রাক্ষসমণ্ডলী—

বানর কটক শোনে কুতূহলী
বীরবাহু তবু ঘুমায়ে রয়।...

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'

"ছি ছি এত্তা জঞ্জাল
এত্তা বড় গুষ্টি এস্‌মে
এত্তা জঞ্জাল ;
একঠো একঠো মরতা তব্‌বি
কমতা নাহি পাল।
মর গিয়া বীরবাহু লেড়কা জোয়ান
জরু চোরি বাপ কিয়া থা,
বেটাকো যায় জান।
কহে ভারতী
কিসকো কিয়া দল্‌পতি
রাবণ রাজা বনা খাজা
একদম বেচাল
রাম লছমন জিতা রহ
উন্‌কা নাজেহাল।"

এই ছত্রগুলির সবটাই উদ্ধৃত করা গেল। এরপর দেবেন সেন। রবীন্দ্রনাথের 'মরণ', 'বলাকা' এবং 'তাজমহল'-এর ছন্দেও আছে। যতীন্দ্র বাগচী আছেন, অক্ষয় বড়াল আছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আছেন। সত্যেন দত্তের অনুকরণে আছে "লঙ্কা! লঙ্কা! সুন্দরী লঙ্কা! মিত্রের আশ্রয় শত্রুর শঙ্কা!......হলে রাম-অস্ত্রে বীরবাহু ঠাণ্ডা, বাগ্‌দেবী বল কোন্ রাক্ষসে পাণ্ডা—করতঃ রাক্ষস-রাজ স্বহস্তে, প্রেরি প্রারম্ভে অন্তিমে পন্তে —কিষ্কিন্ধ্যা দলে শব্দিত ডঙ্কা, লঙ্কা!"

তারপর মৈমনসিংহ গীতিকা—

অকালে মরিল বন্ধু মইরা হইল ভূত।
সুন্দর বীরবাহু বন্ধু রাবণ রাজার পুত॥
রাবণ রাজার নারী শুইনা
ধীরে ধীরে বলে।
আগে আমি যাইবাম মইরা
মুয়তেক না দেখিলে॥

তোমার পাপে সোয়ামী আমি
অইবাম দেশান্তরি।
বিশ খাইয়া মরবাম কিম্বা
গলায় দিবাম দড়ি॥…

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল, এবং 'এরা ওরা এবং আরও অনেকে।' এত আছে যে, সব নামের তালিকা দেওয়াও এখানে সম্ভব নয় এবং যে-টুকু নমুনা দিয়েছি, সে রকম সংক্ষিপ্ত নমুনা উদ্ধৃত করারও স্থানাভাব। চারটি বাংলা কবির ভঙ্গির রূপান্তর ও আঠারোটি সংস্কৃত ছন্দের রূপান্তর করে দিয়েছেন নলিনীকান্ত সরকার, সে কথা আগে বলেছি। এরপর নজরুল থেকে আধুনিক কবিদের সবাই আছেন।

এর কোনোটাই ঠিক অনুকৃতি নয়। বিভিন্ন কবির ছন্দ ভাষা ভঙ্গি এবং মেজাজ হজম করার ব্যাপার। সমান্তরাল নতুন রচনা। অল্প পরিসরে বাংলা কাব্য-জগতের এতগুলি ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় —এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাঝে মাঝে যে উদ্দাম কৌতুক এবং দুষ্টুমি বুদ্ধির পরিচয় আছে তা অনন্য-সাধারণ। আধুনিককালে এসে দু-এক স্থলে হুল ফোটানোও আছে, কিন্তু তাতে বিষ খুব বেশি নেই। আমার মনে হয় সজনীকান্ত কবিরূপে প্রকাশিত হওয়ার আগে যে-ভাবে পূর্ব কবিদের ভাব ও ভঙ্গি আত্মস্থ করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। গ্রহণ করে স্বাঙ্গীকরণের ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ।

গবেষণাজাত রচনা ও গ্রন্থ তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় বহন করছে। ব্রজেন্দ্রনাথের সহযোগে অথবা এককভাবে তিনি এই বিভাগে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার তালিকা অতি দীর্ঘ।

কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—ব্রজেন্দ্র-সজনীর যোগাযোগ না ঘটলে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে আরো অনেক তথ্যই হয়তো অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। সজনীকান্তের বিজ্ঞান শিক্ষা অবশেষে গবেষণার কাজে সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল।

এঁদের দুজনেই অকালমৃত্যু বরণ করেছেন, এবং হিসাব করলে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়,—এই দুই সহযাত্রীর আয়ুষ্কাল প্রায় সমান।

১-১২-৬৬

প্রসঙ্গত

পৃষ্ঠা ২১,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চন্দননগরে বোটের মধ্যে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে বলেছিলেন, "সিনেমা দেখা শেষ হল ?" ১৯৬৭ সনে শ্রীগণেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত পূজা সংখ্যা বেতার জগতে প্রকাশিত আমার "কৌতুকের আসর" নামক রচনায় এ ঘটনাটিরও উল্লেখ ছিল। বেতার জগতের এই রচনাটি পাঠান্তে সুধাকান্ত শান্তিনিকেতন থেকে ৭ই অক্টোবর (১৯৬৭) তারিখে আমাকে লেখেন, "আমাকে চন্দননগরে বোটে ঐটুকু মৃদু তিরস্কার করেই কবি ক্ষান্ত হননি। পরে বলেছিলেন, "শুনেছি চন্দননগরে ভাল ভাল পানীয় অনেক হোটেলে পাওয়া যায়, সেই সব জায়গায় গেলে বোটে ফেরার কথা মনেই থাকবে না তোর। আর যাই করিস ওদিকে যাসনে।"

পৃষ্ঠা ৫৩,

বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'প্রদীপ' ৫ম ভাগ (১৩০৮-৯) দ্বাদশ সংখ্যায় বিহারীলাল গোস্বামী লিখিত চিত্রসহ "যক্ষপত্নী" নামক যে সনেটটির উল্লেখ আছে, সেটি এই—

প্রভুশাপে ফিরে পতি বিরহে বিজনে
প্রাণসমা প্রিয়তমা চক্রবাকী প্রায়।
সুদীর্ঘ যামিনী দিবা কাটে বা কেমনে
ক্ষুণ্ণ মনে দিন গণে শূন্য অলকায়।
রুখু-কেশ-মেঘে আছে চাঁদ মুখ ঢাকি,
শিশির বিশীর্ণ কিবা বিবর্ণ নলিনী।
জানালায় জ্যোৎস্না হেরি মুদি' আসে আঁখি—
বারি-সিক্ত আধসুপ্ত স্থল-কমলিনী।
বিরহ সুতনুঅঙ্গ গৃহকোণে লীন,
পেতেছে হৃদয় খানি করিয়া বিস্তার—
লুপ্ত-অন্তরাল নদী নগেন্দ্র গহিন,
স্বপ্নে আলিঙ্গন, জাগি' অশ্রু উপহার।
এ কি দুঃখ যক্ষবালা অয়ি বিরহিনী,
জাগ্রত স্বপনে প্রিয়-উৎসঙ্গ-সঙ্গিনী!

পৃঃ ৬৮'

গীতাবিন্দু ১৯৬৮ সনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, প্রাপ্তিস্থান ইমপ্রেসিও ৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পৃঃ ৯০,

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ১৯৬৮ সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে মারা গিয়েছেন।

" " হারীতকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু ঘটেছে ১৯৬৬ সনের ২২শে জুলাই।

পৃঃ ১১৮,

'বনবিহারী মুখোপাধ্যায়' প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে, দেশ, সাহিত্য সংখ্যার (১৯৬৬) ও পরে সম্পূর্ণ অংশ সাপ্তাহিক বসুমতী (৮-৯-১৯৬৬)-তে ছাপা হয়। এ পুস্তকে পুনরায় কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হল।

পৃঃ ১২২,

বনবিহারী প্রসঙ্গে বনফুলের যে সনেটটির উল্লেখ আছে সেটি ৩১-৭-৬৫ তারিখের দেশ সাপ্তাহিকে ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি এই—

পাষাণ আঘাত হানি' অসি তীক্ষ্ণধার
চূর্ণ বিচূর্ণিত হল? কঙ্কর কণ্টক
জয়ী হল বিক্ষত করিয়া বার বার
বলিষ্ঠ পথিক-পদ? ধূর্ত ও বঞ্চক
সাধুরে লাঞ্ছিত করি বিজয় কেতন
আস্ফালন করিল আকাশে? অন্ধকার
গ্রাসিল কি রবি? না—না, নতি নিবেদন
করি পদে উচ্চ কণ্ঠে কহি বারম্বার—
নহ ব্যর্থ পরাজিত, হে বহ্নি কমল,
তমোহন্ত্রী হে প্রদীপ্ত মশাল বর্তিকা,
অগ্নি তব অনির্বাণ, চির সমুজ্জ্বল,
অনবদ্য অপরূপ, উর্ধ্বমুখী শিখা।
মহা প্রস্থানের পথে বিগত অর্জুন
অস্ত্রাগারে রেখে গেছ শরপূর্ণতূণ।

পৃঃ ১৪০,

'মোহিতলাল মজুমদার' রচনাটি 'নীরদচন্দ্র চৌধুরী'র সঙ্গে যুগ্মভাবে ছাপা হয়েছিল, এই পুস্তকে দুটি রচনাকে পৃথক করা হল।

পৃঃ ২৩৬,

'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' ও 'সজনীকান্ত দাস' যুগ্মভাবে ছাপা হয়েছিল এ পুস্তকে পৃথক করা হল।

পৃঃ ২৩৯;

সুপ্রসিদ্ধ গবেষক বন্ধুবর যোগেশচন্দ্র বাগলের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের সাময়িক দ্বন্দ্ব বিষয়ে যা লেখা হয়েছে, সে সম্পর্কে যোগেশবাবু শনিবারের চিঠি (বৈশাখ ১৩৭৫)-তে লিখছেন—…"ব্রজেন্দ্রবাবু প্রতি বৎসর জন্মদিনে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ লেখার ফিরিস্তি দিয়া একখানি পুস্তিকা ছাপাইতেন। আমি তাঁহার প্রমুখাৎ যাহা যাহা শুনি তাহা এবং ঐ পুস্তিকায় প্রদত্ত বিবরণাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া তাঁহার জীবন কথা একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করি এবং পরিমলবাবু উহা সাগ্রহে ছাপান। ইহাতে অসূয়া ঈর্ষার বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল না। প্রায় পনের বৎসর পরে এইটি আমি পুনরায় পড়ি, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও দিয়া পড়াই কিন্তু মনেই হয় না যে, ইহাতে ঐ রকম সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু আমার উপর খুবই খাপ্পা হইয়া উঠেন এবং কয়েক দিন যাবৎ একই টেবিলে কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পরে অবশ্য সজনীবাবুর মধ্যস্থতায়, গোল মিটিয়া যায়। ব্রজেন্দ্রবাবুকে বিজয়ার সম্ভাষণ জানাইতে গেলে তিনি বলিলেন, 'যোগেশবাবু, আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কোন দোষ নেই।' ইহাই হইল আসল ব্যাপার। পরিমলবাবু উক্ত কয়েক দিনের কথা শুনিয়া এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন।" লেখকের বক্তব্যঃ উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে যোগেশবাবুর মুখে যা শুনেছিলাম এবং যেটুকু মনে ছিল তাই সংক্ষেপে লিখেছি। গবেষণায় প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক ঘটনা। সজনীবাবুও এক সময় দুর্দান্তভাবে যোগেশ-বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এ সবই সাময়িক এবং দৌড় পাল্লার ব্যাপার। এবং দূর কাল থেকে কৌতুককর রূপেই তা উপভোগ্য। তথ্যনিষ্ঠ একাগ্রচিত্ত তদ্‌গতপ্রাণ গবেষক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর আপন কৃতিত্বের মধ্যেই আপন সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।

পৃঃ ২৭০

'নীরদচন্দ্র চৌধুরী' ও 'মোহিতলাল মজুমদার' একত্র ছাপা হয়েছিল, বলা হয়েছে। নিজ বিষয়ে রচনা পাঠান্তে নীরদচন্দ্রের একখানা চিঠি ১২-১-৬৭ তারিখে সাপ্তাহিক বসুমতীতে ছাপা হয়। তার অংশবিশেষ এই—

"…আমি মোহিতবাবু সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে চাই। পরিমলবাবু মোহিতবাবুর সহিত আমাকে একই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিলেও

আমাদের মধ্যে একটা বড় যোগসূত্রের উল্লেখ করেন নাই।...আমি মোহিতবাবুর ছাত্র, ও সাহিত্য সেবায় তাঁহার শিষ্য।

তিনি স্কুলে আমাকে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়াইতেন। এই দুই ভাষায় আমার হাতেখড়ি তাঁহার কাছে না হইলেও, ইহাদের সাহিত্যিক প্রয়োগ তিনিই আমাকে শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাই আমার ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিবেক বুদ্ধির মূলে। আর আমার সাহিত্যিক দীক্ষাও তাঁহার কাছেই সমাপ্ত হইয়াছিল। আমার পিতা আমাকে নয় বৎসর বয়সে মাইকেল ও দশ বৎসর বয়সে শেক্সপীয়র পড়াইয়াছিলেন। মোহিতবাবুর কাছে সেই পড়া আরও অগ্রসর হয়। তিনি নবম শ্রেণীতে (তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে) আমাদের কীটস-এর 'ওড টু এ নাইটিংগেল' পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার আবৃত্তি এখনও আমার কানে বাজে।

স্কুল ছাড়িবার এগার বৎসর পরে ১৯২৫ সনে আবার আমার তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন আমি মিলিটারি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কেরানী। অভ্যাসমত অফিস হইতে ফিরিবার পথে আনাতোল ফ্রান্সের একটি উপন্যাসের অত্যন্ত শোভন সাঙ্করণ হাতে ছিল। এইটি, আমার ফরাসী জ্ঞান, ও ছাপা সম্বন্ধে বাচালতা, দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তারপর প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়িতে আসিতেন ও সাহিত্যিক আলোচনা করিতেন। তাঁহার কবিতাও পড়িতেন এবং নূতন কবিতা শুনাইতেন।

এই সময়ে তিনি আমাকে কলিকাতার লেখক সমাজে টানিয়া লইয়া—প্রায় জোর করিয়া—লিখিতে প্রবৃত্ত করেন। আমার প্রথম ইংরেজি রচনা—ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে—তিনিই শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লইয়া গিয়া আমাকে দিয়া পড়ান। অশোকবাবুর মজা লাগিয়া থাকিবে। অন্ততপক্ষে লেখাটাতে চালবাজি ও ডেঁপোমি অনেক ছিল। কেম্ব্রিজ প্রত্যাগত অশোকবাবুর কাছে আমার অশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণের তীব্র সমালোচনা মোহিতবাবু ফিরিয়া আসিয়া করিয়াছিলেন। তবে অশোকবাবু স্বাভাবিক উদারতা দেখাইয়া পিতার কাছে বলিয়া লেখাটি ১৯২৫ সনের নভেম্বর মাসের 'মডার্ন রিভিউ'-তে প্রকাশ করাইয়াছিলেন। এই আমার সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতরণ।

ইহার কিছুদিন আগে হইতেই মোহিতবাবু আমাকে সজনীবাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং মোহিতবাবুর জন্যই আমি 'শনিবারের চিঠি'-তে ভিড়ি। তিনিই তখন 'শনিবারের চিঠি'র প্রাণ ছিলেন।

ইহার বহু বৎসর পরে আমি দিল্লী আসি। তাহাতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমার আত্মজীবনী প্রকাশিত হইবার অল্প পূর্বে তাঁহার কাছে একখানা চিঠি লিখি। ইহার উত্তরে তিনি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। উহার প্রথম ছত্র ছিল ইংরেজিতে—"You have written not a day too soon!" তাঁহার জীবনের মর্মান্তিক কষ্ট ও নিষ্ঠুর সংগ্রামের পরিচয় ইহাতে এবং পরের চিঠিতে পাই। এটা ১৯৫১ সনের কথা। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অল্পদিন আগে লেখা একখানা চিঠি আরও কষ্টকর। ইহা পড়িয়া আমার হার্ডির সৃষ্ট "মেয়ার অভ ক্যাস্টারব্রিজ"-এর কথা মনে পড়িয়াছিল।

লেখক হিসাবে মোহিতবাবুর কাছে আমার ঋণ পরিশোধ করিবার মত নয়। তাঁহার শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত আমার পরজীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। যে সাহিত্যপ্রীতি আমার জীবনে উচ্ছলিত সুখ আনিয়া দিয়াছে, তাহার মূলে আমার পিতামাতা ভিন্ন আছেন মোহিতবাবু।

আমরা লেখকরা যাঁহাদের কোলে মানুষ হইয়াছি, হাঁটিতে শিখিয়া তাঁহাদের কথা ভুলিয়া যাই।......

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

মোহিতবাবুর জীবনের একটা অংশ নতুন করে জানা যাবে তাঁর কৃতী ও কৃতজ্ঞ ছাত্রের এই চিঠিখানিতে। এতে নীরদবাবুর চরিত্রেরও একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে সুন্দরভাবে। এর পর নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আরো একটি দিক, যা আমার সামান্য অভিজ্ঞতার সীমায় ছিল, তা সাপ্তাহিক বসুমতী ২৩-২-৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী বেলা ভট্টাচার্যের একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠিতে আরো গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। এই চিঠি আমার রচনাটি পাঠান্তে লেখা, বলা বাহুল্য। চিঠিখানা আংশিকভাবে এখানে তুলে দিচ্ছি—

"......নীরদবাবুকে আমরা যেমনভাবে চিনেছি, উনিও ঠিক তেমনি ভাবেই ওঁকে উপলব্ধি করেছেন। ওঁর লেখার প্রতিটি ছত্রে যেন আমাদেরই অন্তরের কথা ব্যক্ত হয়েছে। লেখাটা আমার খুব ভাল লাগল এই জন্যে যে এত সহজ সরলভাবে কোনো বাঙালী লেখক নীরদবাবু সম্বন্ধে, অর্থাৎ তাঁর পাণ্ডিত্যই নয়, "ব্যক্তি নীরদবাবু"কে উপলব্ধি কোরে আর কোনো লেখা বোধ হয় লেখেননি। পরিমলবাবুর এই লেখার প্রতিটি লাইন যেন আমার মনের কথা। ......একটা মানুষকে যখন

দেখি সামান্য একটা বিড়াল ছানার প্রাণের জন্যও কি ব্যাকুলতা, তখনও বিস্ময় জাগে, আবার সেই মানুষকেই যখন দেখি সামান্যতম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহের মত লড়াই করতে তখনও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।...

শ্রীবেলা ভট্টাচার্য

পৃঃ ২৭০

বলা হয়েছে নীরদবাবুর সঙ্গে ২৫ বছর দেখা হয়নি। কিন্তু পরে দেখা হয়েছে। গত ১০-১-৬৮ তারিখে নীরদবাবু আমাকে কিছু না জানিয়ে সস্ত্রীক আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে বিস্মিত করেছিলেন। 'কনটিনেন্ট অভ সারসি' তার আগেই আমার সম্পূর্ণ পড়া হয়ে গেছে।